পকেটমার

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :
দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

স্নেহাস্পদ

দুলালচন্দ্র অধিকারী

এবং

নিউ বেঙ্গল প্রেসের

ওঁর সহকর্মীদিগের প্রতি

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই—

রক্ত রাঙা ভোর

খুন রাঙা রাত্রি

অধস্তন পৃথিবী

একটি অদ্ভুত মামলা

একটি নারী হত্যা

একটি নির্মম হত্যা

লেখকের তরুণ বয়সে সরজমিনে তদন্তকৃত কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে ঘটা একটি পকেটমারী মামলা সম্পর্কিত সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এই লেখাটি ওঁর ক্রাইম উপন্যাস সিরিজের সপ্তম ক্রাইম উপন্যাস।

তাই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৫ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই মামলাটিতে আসামী করিমের ছয় মাস মেয়াদ হইয়াছিল।

পকেটমার

কলকাতা শহরের হ্যারিসন রোডের মোড়। লোকের ভীড়ে পথ চলা যায় না। কৃত রকম জাতের লোক কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পথ চলছে। চলার যেন তাদের আর বিরাম নেই। রাজপথের ধারে ধারে ছোট বড়ো ফলের দোকান। একটা দোকানের সামনে কয়েকটা ছোকরা দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। পরনে ছিল তাদের রঙিন ফতুয়া, লাল গেঞ্জি ও লুঙ্গি। কানে তাদের একটা করে বিড়ি গোঁজা। সব জাতের লোকই তাদের মধ্যে আছে। তাদের বেশভূষা বা ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের জাতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে তারা যে কোন শ্রেণীর. জীব তা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

দলের মধ্যে থেকে একটা গাঁট্টা-গোট্টা লোক বেরিয়ে এলো। বোধহয় সে তাদের সর্দার-টর্দার হবে। অন্ততঃ তার চেহারা দেখলে তাই মনে হয়। হঠাৎ সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'এই শালা লালু! ঠিক্‌সে ফেল্। এখানে একটা লোকও পড়লো না।'

উত্তরে লালু বেশ একটু লজ্জিত হয়ে তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'আরে সে ঠিক মানুষ আসে তবে ত! এখনে ভালো কোনও একটা শিকারই লেই। আচ্ছা, একটু সবুর তো করিয়ে দেখ্।'

ফলের দোকান থেকে নির্বিচারে একটা করে আম তুলে নিয়ে খেতে খেতে লালু খোসাগুলো ছাড়াচ্ছিল। আর ছাড়ান খোসাগুলো সে তাগসই মাফিক ঠিক ফুটপাতের উপর ফেলে দিচ্ছিল। হঠাৎ সেখানে এলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। বয়সে প্রৌঢ় তাঁকে বলা যায়। ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ হাতে করে তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ একটা খোসার উপর তাঁর পা পড়ায় সড়সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন—হাত দুই-তিন দূরে। মাথাটা সজোরে ফুটপাতের উপরে ঠুকে গেল। সেখানে আচমকা একটা আওয়াজ হল 'দড়াম'।

ভদ্রলোকটি নির্বিকার চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও ব্যাগটি তিনি

ছাড়লেন না। সজোরে ব্যাগটি আঁকড়ে ধরে তিনি উঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর উঠে পড়বার আগেই সেই ফলওয়ালার দোকানের সামনের সব কয়টি ছোকরাই ছুটে এসে ভদ্রলোকটিকে ধরে ফেললে। তার পর ভদ্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ন দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কেউ দেয় ভদ্রলোকটির কাঁধ ঝেড়ে। কেউ সোহাগ করে তাঁর জামাটা টেনে দেয়। তাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকটির পকেটটা একটু নেড়ে দিতে দিতে বলে উঠল 'দেখেন ত বাবু! আউর একটু হলে ত হাপনি লেংড়া বনে গেছলেন। হাপনার মশয় সে খুব চোট লাগেনি ত?'

রাস্তার এই পরোপকারী বন্ধুদের সন্নিধান ভদ্রলোকটি গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। ভদ্রলোকটি কলকাতার পুরানো বাসিন্দা। তাই ওই লোকগুলিকে চিনতে তাঁর বাকি ছিল না। তিনি ব্যাগটি আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন, 'বড়ী মজাসে তো আমের খোসা ফেলতা। জানতা নাই যে ইসমে চোট লাগতা হ্যায়। হামসে তুম লোক চালাকি মাৎ করো।'

ভদ্রলোকটির অলক্ষ্যে তার পকেট পরীক্ষার কার্য ইতিমধ্যেই তারা ভালোরূপেই সমাধা করেছিল। তাই তাঁর এই বিদ্রূপ বাণীর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্য থেকে একজন বেশ একটু বিরক্তির স্বরে বলে উঠল, 'হাপনি ত মশায় খুব ভদ্দর লোক আছেন। ব্যাগে ত আছে আপনার দুইখান কাপড়, পকেটে ত আপনার একটা পয়সাও লেই।'

এই লোকগুলোর প্রকৃতি যে কিরূপ সাংঘাতিক তা কলকাতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এই ভদ্রলোকের অজানা ছিল না। তাই এদের এইসব কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেন। ছোকরার দল আবার সেই ফলের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হল্লা করতে সুরু করে দিলে। তাদের মধ্য থেকে একজন লোক শিস দিতে দিতে বলে উঠল, 'বেটা হুঁসিয়ার আছে। এবে কিন্তু ঠিকসে দেখিস।'

তবে তার চেয়েও অভিজ্ঞ ব্যক্তি একজন এদের দলে সেদিন উপস্থিত ছিল। মুখটা বিকৃত করে এগিয়ে এসে মুরুব্বিয়ানি চালে সে বলে উঠল, 'তো শালার চোখই লেই, শালা সব মাটি করে দিলি। মাদু সর্দার তোকে ভাই এতো শেখালে—'

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলা বলা হচ্ছিল তার কপালটা বোধহয় সেদিন ভাল ছিল। তাই তাকে দলের লোকদের কাছে আর বেশী কথা সেদিন শুনতে হল না! তাদের সেই হল্লা থামিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে থেকে অপর আর একজন লোক বলে উঠল, 'এবার পালা শালারা, পালা। ওদের সেই পুরি দল এইসে গেছে।'

কথাটা শুনে সকলেরই মন পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেও তাদের সময় মত পালান আর হল না। অপর দল তাদের ঠিক সামনে এসে হাজির হয়ে পড়েছিল। আগন্তুকদের ভিতর থেকে একজন খুব লম্বাটে ধরনের লোক বেরিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোকের গলাটা বাঁ হাত দিয়ে টেনে ধরে বললে, 'তুই শালা তোর নিজের একলা ছেড়ে হেনে এয়েছিস? যা শালা তোর সেই মির্জাপুরের মোড়ে। কেয়া রে! সরম লগতা নেহি তুকো?'

লোকটা বোধহয় প্রথম দলের নেতা হবে। সে সহজেই অপমানটা হজম করে নিল। অপর দলের এলাকায় সে লুকিয়ে কাজ করতে এসেছিল। সে একটু আমতা আমতা করে কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাকে বলল, 'মাইরি মামু আম খাচ্ছিলুম। শুন্ মাইরি—'

মামু কিন্তু তার কোন কথাই শুনল না। এদের এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে সে এইদিন বদ্ধপরিকর। সে সজোরে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ভাগ শালা। শালা কাম্ করতে আইয়েছিস। আবার তোরা মিথ্যেভি বোল্বি।'

অপর দলের দলপতি মারধর খেয়ে আর সেখানে দাঁড়াল না। তাদের দলীয় নীতির বিরুদ্ধে সে পরের এলাকায় এসে অন্যায়ই করেছে। সাকরেদদের সামনে এইভাবে অপমানিত হলেও সেই অপমান সে বেমালুম হজম করতে বাধ্য। তাই গুমরতে গুমরতে সে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয়ঃ মনে করলে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো এরাও ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে সকল সময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। এইজন্যে দলবল নিয়ে নিজেদের এলাকার দিকে চলে যেতে যেতে সে তাকে শাসিয়ে বলে গেল, 'আচ্ছা! শালা দাঁড়া। বড়বাজারের নরিন বাবু আইয়েছে। হামি সে তাকে খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।'

অপর দলের নেতা মামু তাদের আইনগত অধিকারের মধ্যে ছিল। তাদের দলীয় আইন অনুসারে অপর দলকে এইসব অপরাধের জন্য শাস্তি

দেবার অধিকার তার আছে। তাই উত্তরে সে আরও রোয়াব দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'শালা তুহর জান ত হামি আগে লিবে।'

কলকাতা শহরে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। রাস্তার ওপরে এইরকম একটা দুর্বোধ্য কলহের সৃষ্টি হওয়ায় অনেক লোকই সেখানে জড় হয়েছিল। কয়েকজন সিঁদেল চোর এই সময় সেই পথ দিয়ে হাওড়া যাচ্ছিল। পকেটমারদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। কোন পক্ষই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তবে এই দলের সঙ্গে তাদের আলাপ ছিল। কারণ গেঁড়াতলার চণ্ডুর আড্ডায় তাদের প্রায়ই দেখা হত। পকেটমারা সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও পকেটমারদের ওপর তাদের সহজীবী হিসেবে সহানুভূতি ছিল প্রচুর। তাই তারা মধ্যস্থ হয়ে তাদের এই কলহ মিটিয়ে, ভিড়ের লোকদের হাঠিয়ে দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

এর পর নতুন দলের কাজ নির্বিরোধে সুরু হল। দলের লোক স্ব স্ব স্থানে শিকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এই নতুন দলের নেতা করিম ফুটপাতের ধারে একটা গ্যাসপোস্টের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু ছেদিলালের সঙ্গে গল্প করছিল। হঠাৎ করিম মুখ ঘুরিয়ে ভিড়ের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'চুপ কর শালা চুপ।'

পাশের একজন পথিকের পকেট থেকে বেমালুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিয়ে নিয়ে ছেদি উত্তর করল, 'কেন্ রে?' করিম ছেদির কাঁধটার উপর একটা গাঁট্টা কষিয়ে দিয়ে বললে, 'শিকার।'

পথের ভিড় ঠেলে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে হ্যারিসন রোড দিয়ে এসে চিৎপুরের দিকে মোড় ফিরছিলেন। লোকটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিয়ে ছেদিলাল বলল, 'পকেটে সে মাল আছে মনে হয়। আগে তো পোরখ করে দেখ।'

ছেদির কথার উত্তর না দিয়ে করিম জোরে জোরে পা ফেলে ভদ্রলোকটির কাছে এসে পড়ল। তারপর তার গা ঘেঁষে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে তার পকেটে একটা আঙ্গুলের টোকা মেরে আবার পিছিয়ে পড়ল।

করিমকে পিছিয়ে পড়তে দেখে, ছেদিলাল ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি মাল ত, না সব বাজে কাগজ?' করিম উচ্ছ্বসিত হয়ে নিম্নস্বরে বলে উঠল, 'সব লোট মাইরি। তুই জলদি ওদের ডাক।'

ফুটপাথের অপর পারে জন-দুই লম্বাচুল বাঙ্গালী, কয়েকজন ঘাড়-ছাঁটা দেশোয়ালী ও জন চার-পাঁচ লুঙ্গিপরা মুসলমান দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের দিকে একটা ইশারা করে ছেদিলাল ছুটে ভদ্রলোকটির পাশ ঘেঁষে অনেক দূর এগিয়ে গেল। আর করিম ঠিক তার পিছন পিছন কি মতলবে চলতে সুরু করে দিল তা সেই জানে।

এতবড় একটা ষড়যন্ত্র ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে হয়ে গেলেও তিনি তা মোটেই জানতে পারলেন না। নিশ্চিন্ত মনে অবসাদ ক্লান্ত দেহটি টেনে টেনে তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ ওপার থেকে কাগজে মোড়া কি একটা তাঁর মাথার ওপর এসে পড়ল। তরল পদার্থটি গোবর কি বিষ্ঠা তা ঠিক বোঝা গেল না! তবে তা তাঁর গাল বেয়ে নেমে এসে জামার অনেকখানি নষ্ট করে দিল। ভদ্রলোকটি চমকে উঠে ওপর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'দেখত, দেখত, যত বেল্লিক সব।'

কানে বিড়ি গোঁজা কয়েকটি মুসলমান ছোকরা ভদ্রলোকটির পিছন পিছন আসছিল। এইবার হঠাৎ তারা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকটির অবস্থা লক্ষ্য করে দয়াপরবশ হয়ে বলে উঠল, 'এ কেয়া তাজ্জব। ছো ছো ছো! এ কোন কিয়ারে!' সামনের দোকান থেকে একজন আধা ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'হাপনাকে ত বড় মুস্কিলে ফেলিয়েছে। পানি লিবেন ত আসেন ইখানে।'

বড়বাজার সিঁদুরিপটীর মোড়ের মতন জায়গায় এইরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। তবুও দেখতে দেখতে সেখানে বেশ বড় রকমের একটা ভিড় জমে গেল। কোথা থেকে আবার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এক বালতি জল এনে তাঁর জামাকাপড় কতক কতক ধুয়ে দিয়ে বলল—'বাবু, হাপনি মাথা একটু নীচু করেন, সে একটু জল দিয়ে সাফা করে দি। হাপনি ভদ্দরলোক আছেন মশয়।'

ভদ্রলোকটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'নে নে বাবা, সবটা ঢেলে দে, যত সব।' এই দলের নেতা করিম ভদ্রলোকটির পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। জল ঢালতে ঢালতে সেই শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটির দিকে চেয়ে চোখ টিপে কি একটা ইশারা করল ও তারপরে ভদ্রলোকের দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে বলে উঠল, হাপনি আউর একটু নীচু হোবেন। হামি সে বেশ করে—

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করলেন। নীচু হবা মাত্র করিম ছুটে এসে একটা রেজার ব্লেড বার করে ভদ্রলোকটির বুক-পকেটের তলার খানিকটা বেমালুম কেটে দিল ও তারপর আঙুলের ফাঁকে ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে দুটো মাত্র আঙ্গুলের সাহায্যে নোটের বাণ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এধারে কিন্তু সেখানে ভদ্রলোকের গায়ে পায়ে জল ঢালার পালা সমানেই চলতে লাগল। মাথাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ভদ্রলোক কোঁচার খুঁট দিয়ে চুলগুলো মুছে ফেলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কাটা পকেটের দিকে নজর পড়ায় তিনি চমকে উঠলেন! মুখ দিয়ে তাঁর একটিমাত্রও কথা বার হল না। অস্ফুট আর্তনাদে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

যে লোকটা এতক্ষণ তাঁর মাথায় জল ঢালছিল, সে এইবার একটু ব্যস্তভাব দেখিয়ে বলে উঠল, 'আরে, হল কি মশাই! আউর জল ঢালবে নাকি? আপনি ওমন করছেন কেন?' ভদ্রলোকটি চীৎকার করে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে, ভাই! হামরা সর্বনাশ হো গিয়া। দশ হাজার রুপেয়া চলা গিয়া। আরে পুলিস বোলাও, পুলিস বোলাও।'

একজন বাঙালী এইবার এগিয়ে এসে বললেন, 'কি, পকেট মেরেছে বুঝি। তা ত মশাই মারবেই। এ রকম জায়গায় রাখে?'

সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন লোক হৃতসর্বস্ব ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকেও একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলে মনে হল। তিনি বেশ বিশেষজ্ঞের মতোই ভিড়ের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেলেন, 'ও মশাই ওর লিজের টাকা লয়। ও লিজের টাকা হলে ও রকম জায়গায় রাখে? পুলিস শুনলে এ রকম কেস লেবেই না।' ঠিক এই সময় ভিড়ের ভিতর আত্মগোপন করে অপর একজন লোক বলে উঠল, 'আর পুলিস ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন। বাড়ি যান মশয় বাড়ি যান।'

শেষ কথা বলে গেল একজন মাড়োয়ারী। সাধারণভাবে তাঁকে একজন দল নিরপেক্ষ লোক বলেই মনে হবে। ভিড়ের ভিতর থেকে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে ভাঙা বাঙলায় তিনি উপদেশ দিলেন, 'হাপনি মশায় বোকা লোক আছেন। এ কলকত্তা শহর। বোড় বোড় কারবার হেনে হয়। হেনে বোকা লোকের থাকা কামই লয়। বুঝলেন মশয়! এখানে থাকলে আউর ভি মুশকিল হবে। আপনি মশাই এখনি বাড়ি চলে যান।'

এইবার সেখানে উপস্থিত হলেন একজন বাঙালী ছোকরা। বোধ হয় সে শহরের কোন কলেজের পড়ুয়া হবে। বই হাতে করে সে সেই পথ দিয়ে আসছিল। ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মশাই? এতো ভিড় কেন এখানে?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন এইবার অতর্কিতে বেরিয়ে এসে ছোকরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, 'আরে মশাই, ও কিছু নয়। সরে পড়েন মশায়! সরে পড়েন। এখানে বেশী গণ্ডগোল করবেন না।'

দেখতে দেখতে সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলল। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে ঠিক ভাবে দাঁড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলো এক একজন এক এক দিকে সরে পড়ল। তাদের কাউকে আর সেখানে দেখা গেল না।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে দেহটা ফুটপাতের ওপর এলিয়ে দিয়েছিলেন। স্নায়ুশক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। উঠবার শক্তি তাঁর আর ছিল না। কিন্তু এবার তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে সেখানে আর একটি লোকও উপস্থিত নেই।

মোড়ের মাথায় একজন হিন্দুস্থানী নাপিত তার সাজসরঞ্জামের ওপর বসে নির্বাকভাবে এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। রোজই এই ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের সাক্ষাৎ তার দৈনন্দিন জীবনে ঘটে, কিন্তু ভয়ে সে এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে না। আজ ভদ্রলোকটির অবস্থা দেখে সহানুভূতিতে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সে ভদ্রলোকটিকে কোনরকমে ধরে উঠিয়ে বলল, 'থানামে যাইয়ে বাবু।'

টাকার অসহনীয় শোকে ভদ্রলোকের বাক্যস্ফুরণ হল না। শুধু ঠোঁট দুটো তাঁর একবার মাত্র নড়ে উঠল। সারা জীবনের শেষ সম্বল এমন ভাবে চলে যাবে তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। তাঁর এই মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে নাপিত লোকটি সহানুভূতির স্বরে তাঁকে বলল, 'আপ পাকড়্নে নেহি শেখা?'

ভদ্রলোকটি আকুলতার সঙ্গে উত্তর করলেন, 'আমি কি দেখেছি কে নিয়েছে? ওরা ত আমার মাথাতে জল ঢালছিল—'

নাপিত লোকটিকে এই অঞ্চলেই দুঃখ ধান্দা করে রুজী রোজগার করতে হয়। আর পাঁচজনের মত জানের পরোয়া করে তাকেও পথ চলতে হয়।

তাই ভদ্রলোকের এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোককে নাপিত বলল, 'ওই শালা লোক ত সবকোই চোর-থে। উ ত অভি ভাগ গিয়া, লেকেন, পাছু যো লোক দরদ দেখলাতা থা না? উন লোককোই আপকা পাকাড়না ঠিক থে। সবই ত একই দলকো আদমী।'

ভদ্রলোকটি আর দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ল—'ওরে বাপ। ওঃ! আমার সর্বনাশ হল।'

ভদ্রলোকটির অবস্থা দেখে নাপিতটির সত্যই দয়ার উদ্রেক হয়েছিল। সে সভয়ে একবার চারদিক দেখে নিলে পকেটমাররা কেউ নিকটে আছে কি না। তারপর ভদ্রলোকটিকে টানতে টানতে থানার দুয়ার পর্যন্ত পৌছে দিয়ে নিজে সরে পড়ল।

দুই

বড়বাজারের থানা ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় থানা। এমনি কত পকেটমার ও তালাভাঙার খবর যে প্রতিদিন সেখানে পৌছায় তার ইয়ত্তা নেই। তবে সেদিন থানাটা একটু ঠাণ্ডা ছিল, কাজ-কর্ম অপেক্ষাকৃত কম। অফিসাররা কেউ কাজে কেউ বা অকাজে বেরিয়ে গেছে। দরজার পাহারাওয়ালাটা সেই সুযোগে তার দেহটা দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে দিয়ে গোঁফটায় একটু চাড়া দিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ এই সময় সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবুকে অফিস ঘরে ঢুকতে দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা সেলাম ঠুকে তাঁকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক হ্যায় হুজুর। বিলকুল সব ঠিক।'

সেদিন থানায় কাজকর্ম বেশী না থাকায় অপর অফিসারদের একটু সুবিধা হলেও প্রণবের ভাগ্যে সেদিন সেই সুবিধাটুকুর আস্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। একটা পুরানো মামলা নিয়ে তাকে সমস্ত দিনটাই ছুটাছুটি করতে হয়েছিল। সে খুব পরিশ্রান্ত হয়েই এই দিন থানায় ঢুকছিল। তাই পাহারাওয়ালার দেওয়া খবরটা সে হাসিমুখেই গ্রহণ করল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রামের আশায় অফিস ঘর থেকে সে বেরিয়ে কোয়াটারসের দিকে পা বাড়াল।

অফিসঘর থেকে প্রণব চলে গেলে পাহারাওয়ালাটি আবার তার সেই পূর্বের স্বাচ্ছন্দ্য ভাবটি ফিরিয়ে এনে আর একবার তার গোঁফটি ঠিক করে নিতে যাচ্ছিল। এমন সময় হৃত-পকেট ভদ্রলোকটি পাহারাওয়ালার গা ঘেঁষে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'বড়বাবু, বড়বাবু কোথা? ইনসপেক্টার বাবু?'

কোণের একটা টেবিলে বসে একজন বাঙালীবাবু লিখছিলেন। বোধ হয় নিম্নতম কোন কর্মচারী তিনি হবেন। ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে তাঁকে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ফরিয়াদি বলেই তাঁর মনে হল। তাই কলমের গতিবেগ কিছুটা থামিয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কেস আপনার?'

ভদ্রলোকটি উত্তরে শুধু বলে উঠলেন, 'চুরি বাবা, পকেটমার—'

এই কয়টি কথা ছাড়া আর কোন কথা ভদ্রলোকটির মুখ দিয়ে বার হল না। তিনি প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে থানাবাড়ির মেঝের ওপর শুয়ে পড়লেন।

এ রকম অবস্থায় কোন লোককে দেখলে মানুষ মাত্রেরই সহানুভূতির উদ্রেক হয়, পুলিসেরও। দরজার পাহারাওয়ালাটি সহানুভূতির স্বরে ভদ্রলোকটিকে বলল, 'হাপনি ত বড় মুশকিলে পড়িয়েছেন। আচ্ছা হামি উপরে খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।'

পাহারাওয়ালার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোকটি শুধু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'তাই দেও বাপ, শীগগির দেও।'

সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু সেদিন সত্যই একটু বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর মনের অবস্থাও তার ভাল ছিল না। স্খলিত পদে সবেমাত্র সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। এমন সময় পিছন দিক থেকে খটখট জুতার একটা শব্দ এল। প্রণব পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যে দরজার সিপাই কি একটা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

প্রণব এইজন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর এইবার সে স্নানাহার করবে। স্খলিত পদে সামনে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে সে সিপাইকে জিজ্ঞেস করলে, 'ফিন কেয়া হায়? তুম্ হিঁয়া আগয়া?'

উত্তরে সিপাই তাকে জানালো 'একঠো কেস আ গিয়া হুজুর।'

সিপাইয়ের কথা শুনে প্রণব একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। বিশ্রামের লালসায় তার সারা দেহটা তখন ভরপুর। এখনি একটা কেস এসে পড়বে তা সে কল্পনাও করে নি। একটু চুপ করে থেকে দেহটাকে সোজা করে নিয়ে প্রণব সিপাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'আউর কোই অফিসার থানামে নেহি হ্যায়?'

প্রণবের অবস্থা দেখে সিপাইয়ের বেশ একটু সহানুভূতি এসেছিল। মুখে তার একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠল। ২৮ বৎসর তার চাকুরি হয়েছে। বয়স তার এখন ৫০-এর কাছাকাছি। হতে পারে প্রণব তার অফিসার। কিন্তু সে তার ছেলেরই বয়সী। প্রণবের এই ক্লান্ত অবস্থা দেখে তার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল। তার উপর সে জানত যে প্রণবের সেদিন খাওয়ার সময়ও হয়ে ওঠে নি। প্রত্যুত্তরে খুব দুঃখের সঙ্গেই সে প্রণববাবুকে বললে, 'সব নিকাল গিয়া হুজুর। এক আপই হ্যায়। আজ আপকো বহুত তকলিফ হোতা হুজুর।'

এখন থানায় একমাত্র সেই উপস্থিত আছে। অগত্যা তাকেই নেমে এসে মামলাটির তদন্ত করতে হবে। থানায় আগত কোনও ফরিয়াদীকে কোনক্রমে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তক্ষুনি তার বিবৃতি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সে বাধ্য। তাই উত্তরে প্রণব গম্ভীরভাবে সিপাইকে বললে, 'ঠিক হ্যায়, চলো। হাম যাতা হ্যায়।'

দ্বিরুক্তি না করে প্রণব আবার অফিসঘরে নেমে এল। ভদ্রলোকটি তখনও মাটির ওপর পড়ে আছড়াচ্ছিলেন।

ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে প্রণব সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আপনি অমন করছেন কেন? উঠে আসুন, সব খুলে না বললে—'

প্রণবের কথায় ভদ্রলোকটি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ! তুমি বাবা ইনস্‌পেক্টর? হ্যাঁ বাবা, জিনিস ফিরে পাব ত?'

প্রণব বুঝেছিল যে ভদ্রলোক শোকে ও দুঃখে তাঁর স্বাভাবিক সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন, তাই সে সাবধানে তাঁকে একখানি চেয়ারে বসিয়ে শান্ত করবার জন্যে বলল, 'ব্যস্ত হবেন না আপনি। চেষ্টা ত আমরা করব। ফিরে পাওয়া অসম্ভব কি? কি হয়েছে বলুন দিকি?'

প্রণবের কথায় ভদ্রলোকটি আকুল হয়ে বলে উঠলেন, 'টাকা ফিরে না

পেলে ধনেপ্রাণে মারা যাব বাবা। সারা জীবন খেটে এই টাকাটা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিলাম। বেনারস ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে গিয়ে এই সর্বনাশ। দোসরা তারিখে—'

প্রণব ভদ্রলোকের এই কথা কয়টি শেষ হবার আগেই বলে উঠল, 'ওঃ, তাহলে বুঝেছি। ওই বেনারস ব্যাঙ্কের কাউণ্টার থেকেই ওরা আপনাকে ফলো করেছে। কাল থেকে ওখানে ওয়াচ রাখতে হবে।'

শোকাতুর ভদ্রলোকটি প্রণবের কথা কিছু কানে না তুলে বলে উঠলেন, 'তা তুমি রেখো বাবা। কিন্তু আমার টাকার কি হবে? দোসরা তারিখে আমার মেয়ের বিয়ে। আমার যে জাত মান সব গেল।'

ভদ্রলোকটির সারা জীবনের সঞ্চিত শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কে জমা ছিল। মেয়ের বিয়ের জন্য তা তিনি তুলে আনছিলেন। তারপর রাজপথের মধ্যে এই বিপদ। প্রণব ভদ্রলোকটির মনের অবস্থা সহজেই বুঝে নিতে পারল। সে সহানুভূতির স্বরে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে বলে উঠল, 'ভাববেন না আপনি। ভগবানকে ডাকুন। আপনার মেয়ের বিয়ে—'

হৃতসর্বস্ব ভদ্রলোকটি এইবার কেঁদে ফেলে জবাব দিলেন, 'আর আমার মেয়ের বিয়ে। চামাররা টাকা না পেলে কি আর রাজী হবে! বাবা, তুমি আমাকে একটু দয়া কর। আমাকে তুমি একটু বিষ এনে দাও।'

ভদ্রলোকটি আর কথা বলতে পারলেন না। তিনি ততোক্ষণে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রণব তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনি জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

কোণের টেবিলটায় যে বাবুটি বসে একমনে এতক্ষণ লিখছিলেন, তিনি ভদ্রলোকের এই অবস্থা দেখে এইবার লাফিয়ে উঠে বলে উঠলেন, 'কি স্যার, ভির্মি নাকি? এম্বুলেন্সে ফোন করব?'

প্রত্যেক পুলিস অফিসারেরই একটু-আধটু ফার্স্ট এইড জানা থাকে। প্রণব ইশারায় বাবুটিকে বারণ করে দরজার সিপাইয়ের দিকে চেয়ে হুকুম করল, 'এই, চুপচাপ দেখতে কেয়া তুম? জলদি দো পয়সাকো বরফ লে আও।'

অনেকক্ষণ ধরে মাথায় বরফ ঘষার পর ভদ্রলোকটির আবার জ্ঞান ফিরে এল। তিনি এইবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন। তাঁকে একটু

সুস্থ মনে হল। প্রণব তাঁকে এইবার বলল, 'চলুন, স্পটটা একবার দেখে আসি।'

ভদ্রলোকটি জ্ঞান ফিরে পাবার পরও কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রণবের কথায় টাকার কথা তাঁর নতুন করে মনে পড়ে গেল। টাকার চেয়ে মেয়ের বিয়ের ভাবনাই ছিল তাঁর বেশী। তিনি আকুল হয়ে প্রণবকে উদ্দেশ করে আর একবার বলে উঠলেন, 'ও বাবা! আমার মেয়ের বিয়ে যে আর হবে না, বাবা। সব যে ঠিক হয়ে গেছে বাবা।'

ভদ্রলোকটিকে নিয়ে প্রণব ক্রমেই বিব্রত হয়ে পড়ছিল। শেষে তাঁকে শান্ত করবার আর উপায় না খুঁজে পেয়ে প্রণব একটু ইতস্ততঃ করে অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে এক নিশ্বাসে বলে উঠল, 'শুনুন, আপনি ত আমাদের স্ব-ঘর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যদি আপনার টাকা ফিরিয়ে আনতে না পারি, ত আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। বুঝলেন? এখন আপনি একটু শান্ত হয়ে চলুন তো আমার সঙ্গে।'

এরকম একটা কথা প্রণবের কাছে শুনবেন তা ভদ্রলোকটি আশা করেন নি। তিনি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। প্রথমে তাঁর মনে হল এটা বুঝি ঠাট্টা। কিন্তু প্রণবের সেই দরদ-মাখা মুখখানার দিকে চেয়ে তাঁর সন্দেহ রইল না। তিনি আবার একবার কেঁদে ফেলে বলে উঠলেন, 'তাহলে তাই হোক বাবা। আমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের আর দরকার নেই। আমার পুলিসের দারোগাই ভাল। পুলিসেরও দয়া আছে, কিন্তু তার চামার বাপের নেই। হাঁ বাবা, ঠাট্টা করছ না ত?'

ভদ্রলোকটির কথার ভাবে প্রণবের অভ্যস্ত অন্তরেও একটা অনুভূতি এনে দিল। তার চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল ঠিকরে বাইরে এসে পড়ল। এতোক্ষণে এই আগন্তুক ভদ্রলোক প্রণবের যেন এক আপনার লোক হয়ে উঠেছেন। অতি কষ্টে মনের সেই ভাব সংবরণ করে প্রণব ভদ্রলোককে বলল, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। যেরকম করেই হোক আপনার এই কেস আমি ডিটেক্ট করব। একটু শান্ত হয়ে যা যা আমি জিজ্ঞেস করছি, তার আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দিন—খুব মাথা ঠাণ্ডা করে। মোডাস অপারেণ্ডাই দেখে এটা কোন দলের কাজ তা আমাকে এক্ষুণি ঠিক করে নিতে হবে। এক এক দলের মোডাস অপারেণ্ডাই এক এক রকম হয় কি না।'

ভদ্রলোকটি এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনাটি

প্রণবকে খুলে বলে গেলেন। নাপিতের কথাটাও তিনি বলতে ভুলবেন না। সব কথা শুনে প্রণব কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে ভেবে নিয়ে তাঁকে বলল, 'হুঁ। বুঝেছি।'

ভদ্রলোকটির এতোক্ষণে প্রণবের ওপর একটা অকৃত্রিম মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই ভদ্রলোকটি আরও কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে প্রণব স্থির ধীর কণ্ঠে হেঁকে উঠল, 'দরওয়াজা! জমাদার রামসিংকো বোলাও।'

কিছুক্ষণ পরেই জমাদার রামসিং তার ছোট্ট খেঁটে লাঠিটা হাতে করে সেখানে এসে হাজির হল। তারপর গোঁফ-জোড়াটা একটু চুমরে নিয়ে একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'জি হুজুর।'

জমাদার রামসিং ছিল এই অঞ্চলের একজন বিচক্ষণ জমাদার। প্রণব তার দিকে একটু চেয়ে দেখে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে ভেবে নিল। তারপর চিন্তিতভাবে একটা নোটবুকের পাতা উলটোতে উলটোতে জমাদারকে বলল, 'দেখ, হ্যারিসন রোডকো মোড়মে একঠো নাও বৈঠতা। উসকো জলদি বোলায়কে লে আও।'

জমাদার চলে গেলে প্রণব টেবিলের উপর থেকে একখানা বই বার করে ভদ্রলোকটির সামনে খুলে ধরল। বইখানার পাতায় পাতায় অনেকগুলি করে কয়েদীদের ছবি ছিল। প্রণব এই সব কয়েদীর ছবিগুলোর প্রতি ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এর সব ক'টাই পকেটমারদের ফটো। দেখুন তো এদের কাউকে কাউকে চিনতে পারেন কি না! এদের মধ্যে কি কেউ ছিল?'

ভদ্রলোকটি বাঁশবনে ডোমকানার মত ভাব নিয়ে অনেকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে ছবিগুলো দেখলেন। সবগুলি যেন তাঁর কাছে এক রকমেরই বলে মনে হতে লাগল। সেই গোঁফ, গোল ও লম্বাটে বিশ্রী মুখ, বীভৎস চেহারা। কতকগুলো পাপের প্রতিমূর্তি যেন পাতাগুলি ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফুটে উঠছে। ভদ্রলোকটি কোন হদিস পেলেন না। তিনি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'না বাবা, না। এদের কাউকেই চিনতে পারলাম না। আমি কি ছাই তাও ভাল করে তাদের দেখছি।'

প্রণব নিবিষ্ট মনে ছবিগুলি দেখাচ্ছিল আর ভদ্রলোকটি একাগ্র মনে তাই দেখছিলেন। এমন সময় পাশ থেকে জুতোর খট করে একটা শব্দ

হল। শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইতেই প্রণব দেখতে পেলে জমাদার রামসিং দু-দুটো হিন্দুস্থানী লোককে ধরে এনে তার সামনে হাজির করেছে।

রামসিং একজন অভিজ্ঞ জমাদার হলেও সে এই দিন ঠিকে একটা ভুল করে ফেলেছিল। সে নাপিতকে সেখানে না পেয়ে পথ থেকে দু'জন পুরনো চোরকে থানায় ধরে এনেছে। প্রণব জমাদারের দিকে মুখ তুলে চাইতেই সে একটা সেলাম ঠুকে বলে উঠল, 'নাও ত হুঁয়া নাহি মিলে হুজুর। লেকেন দো পুরানো চোর মোড়মে ঘুমথা থে। ইসকো নাম কিষণিয়া হ্যায়, আউর ইসকো নাম মদনিয়া। দোনকো বেলিয়াঘাটা সে হামরা হাতমে সাজ হুয়া থা। হামরা বিচার মে ইন্‌লোকই এহি কাম কিয়া হোগা।'

আসামীদ্বয়ের বেশভূষা দেখেই প্রণব বুঝেছিল যে এরা পকেটমার হতে পারে না। এরা অপরাধী হলেও অন্য কোনও শ্রেণীর অপরাধী হবে। তাই প্রণব সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে জমাদার রামসিংকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইন্‌লোক কিয়া, কেয়া বোলতা?'

জমাদার রামসিং বিশেষজ্ঞের মত উত্তর করলো, 'জরুর, ইন্‌লোক কিয়া হ্যায়। আউর কোন্ করেগা?'

জমাদারের কথায় রুদ্ধ আক্রোশে প্রণব হুঙ্কার দিয়ে এই দু'জন পুরনো চোরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল,—'এই! ইস্ কাম কোন্ কিয়া হ্যায়? ঠিকসে তুমলোক বোলো।'

মদনিয়া ও কিষণিয়া যে পাকা চোর তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে পকেটমারার ব্যাপারে যে তাদের খোঁজ পড়তে পারে, তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তালা ভেঙ্গে চুরি করা তাদের কাজ, পকেট-টকেট তারা কখনও মারে নি। তারা এ' ব্যাপারে বেশ একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। মদনিয়া ছিল একটু শান্তপ্রকৃতির লোক। সে একটু ভীতুও বটে, তবে তা পুলিসের সামনে। সে সহজ শান্তভাবে বেশ একটু বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করল, 'আপনারা মালিক আছেন হুজুর। আপনারা বিচার করিয়ে দেখুন, হামাদের কি এই কাম আছে?'

জমাদার রামসিং ছিল বহুদিনের পুরনো জমাদার। এর অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা স্থাপন ভিন্ন প্রণবের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। তাই এদের অবিশ্বাস করে প্রণব এদের দুজনকেই ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'কমসে কম, বিশ দফেকো দাগী হ্যায়। তোমারা সরম লাগতা নেই? ফিন তুম লোক ঝুটা ভি বোলতা?'

পুরানো পাপী কিষণিয়া চিরকালই বেপরোয়া। পুলিসের হাতে এই ব্যাপারে নাজেহাল হওয়া তার পক্ষে ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। উপরন্তু তারা তালা-ভাঙ্গারূপ অপরাধের তুলনায় পকেটমারকে ছোট বা হেয় কাজ বলে মনে করে। তাদের এই ভাবে থানার মধ্যে ধরে এনে পুলিসে যেটুকু অবিচার বা ভুল করেছিল তা তাকে তত খোঁচা দিল না, যত দিল পুলিসের এই নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় ও অহেতুক সন্দেহ। জেল সে অনেকবার খেটেছে। ভয়-ডর তার একেবারেই ছিল না। ক্রোধ ও বিরক্তির যুগপৎ একটা সমাবেশে তার মুখের পেশীগুলো সংকুচিত হয়ে উঠল। এর পর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রুদ্ধ আবেগে সে বলে উঠল, 'হাপনি তো মশায় বেশ মানুষ চেনেন। হামাদের কি ঐ কাম? হামরা চাবির কাম করি, গামছা মারি।'

চাবি বা গামছার সঠিক অর্থ প্রণব বুঝে উঠতে পারে নি। সে এইবার জমাদার রামসিংকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া বোলতে হ্যায় এই আদমি?'

জমাদার রামসিং ছিল এই থানার পুরানো জমাদার। গামছা মারা, চাবির কাম প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ সে ভালোরকম বোঝে। প্রণবকে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবার জন্য জমাদার রামসিং উত্তর করল, 'হুজুর, চাবি কো কাম তালা তোড়ানেকো বোলতা। আউর গামছা কো মতলব সিঁদ কাটি। দেখিয়ে না স্যার, তল্লাসী করনেসে উসকো পাশ একটো যন্তর-উন্তর মিল যানে ভি সেকথা।'

জমাদারের কথায় ব্যস্ত হয়ে প্রণব বলে উঠল, 'হ্যাঁ! এইসেঁন! দেখো দেখো, জলদী তল্লাসী লেও।'

তল্লাসীতে কিষণিয়ার কোমরে বাঁধা একটা থলির ভেতর থেকে একটা সিঁদকাটি, আর একখানা বড় ছুরি বেরিয়ে পড়ল। এতোক্ষণ থানার কেউই বোধ হয় এদের সম্বন্ধে এতোখানি আশা করে নি। এদের কাছ থেকে এই সব বামাল বেরুতে দেখে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। প্রণব বিস্ফারিত নেত্রে আপন মনে বলে উঠল, 'ওরে বাপ্, ইন্‌লোক তো পাকা সেয়ানা। হাকিম্‌কো হুকুম মোতাবেক্ থানামে হাজিরভি দিতে নেহি। মজাসে চুরি করতে রহি, আউর ঘুমতে ফিরতি ভি—বাঃ বাঃ! আচ্ছা ইন লোক্‌কো বন্ধ করো। ইন লোককো বিরুদ্ধমে হাম কেস লিখ দেতা। পাছু যো কুছ হোয় দেখা জায়গা। আঃ! নাহি পাকড়ানেসে ত আজই একটা কাম্ কর চুকা থে।'

তালাতোড়্ মদনিয়া ছিল একজন ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। অকারণে ঝামেলা বাড়ানো সে পছন্দ করে না। তাই উত্তরে মদনিয়া চুপ করেই রইল। কিন্তু কিষণিয়া এই প্রকৃতির লোক ছিল না। সে রেগে উঠে ভীষণভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হামি লোক পম্নলাসে জানিয়েছি। ঘর-দুয়ার হামি লোক্‌কে নেহি, হামিলোগ দাগী ভি আছি। বন্ধ করো। ১০৯ ধারা মে ভেজিয়ে দেও। তেরি—'

কিষণিয়ার এই সব আজেবাজে কথা শুনবার মত পর্যাপ্ত সময় এই দিনে প্রণবের ছিল না। তাই তার এই সব অবান্তর কথা শেষ হবার আগেই প্রণব থানার সিপাইকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'যাও, জলদি ইনকো লে যাও। কেস লিখা হো চুকা। উন দোনো' কো আভি বন্ধ করো।'

অতি কষ্টে দু-জন সিপাই মদনিয়া ও কিষণিয়াকে থানায় ফাটকে বন্ধ করে দিল। কিষণিয়াও মদনিয়ার সঙ্গে হাজতে বন্ধ হল বটে, কিন্তু এতে তার মুখ বন্ধ হল না। লক্-আপ থেকে মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে বলে উঠছিল, 'তেরি নানিকো ভেড়ী। ঘুসড়ীওয়ালী। তেরি—'

মদনিয়া ও কিষণিয়াকে যে এই মামলার ব্যাপারে আদপেই প্রয়োজন নেই তা এতক্ষণে প্রণব ভালোরূপেই বুঝতে পেরেছিল। তাই আপাততঃ তাদের হাজত ঘরে বন্ধ করে রেখে প্রণব হৃতপকেট ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'এইবার চলুন, স্পটটা দেখে আসি। যদি কেউ কিছু সন্ধান-টন্ধান দিতে পারে।'

প্রণবের কথায় ভদ্রলোকটির খুব বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। টাকা ফিরে পাওয়ার আশা তিনি একবারও করেন নি। তিনি ইতিমধ্যেই এই চুরির তদন্তের সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিয়েছিলেন। তাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এইবার তিনি প্রণবকে বললেন, 'চলো, বাবা। তাই চলো।'

প্রণব ধীরে ধীরে ভদ্রলোকটি ও জমাদার রামসিং-এর সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে হাজির হল। আশেপাশে শুধু বিবিধ আকারের ও প্রকারের দোকান। দোকানিরা এতক্ষণ ধরে পুলিসের আগমনের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু এদের ঘটনাস্থলে দেখা মাত্র সকলেই অন্যমনা হয়ে নিজের নিজের কাজে মন দিল। ভাবটা যেন এই দিনের এই চুরির ব্যাপারে তাদের কেউই কিছু জানে না।

প্রণবের ধারণা হল যে এইখানকার দোকানদাররা কেউ কেউ ঘটনাটি

দেখে থাকতে পারে। তার মনে হল মামলা সম্বন্ধে এদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। প্রণব প্রথমে একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপ কুচ দেখিয়েছে?'

দোকানদার ছিল একজন মাড়োয়ারী। সে তোতাপাখীর মত বলে উঠল, 'নেহি উস্‌বখৎ হামি নেই থে।'

দোকানিটি যে মিথ্যে বলল তা তার কথার ভাব ও ভঙ্গি থেকেই বোঝা গেল। কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে পসিটীভ্ বা 'হাঁ' সাক্ষীর মত নেগেটীভ্ বা 'না' সাক্ষীরও বিবৃতি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। তাই সত্য মিথ্যা যাই সে বলুক, তার নামটা ত টুকে নিতে হবে। অগত্যা নাচার হয়ে প্রণব এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপকো নাম তো বলিয়ে?'

মাড়োয়ারী নির্বিকার চিত্তে উত্তর করল, 'হুকুমচাঁদ গম্ভীরচাঁদ কানোড়িয়া স্বরূপচাঁদ।'

এদের নাম বলার রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রণবের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। এই ব্যাপারে আদালত থেকে সমন জারি করানোর পর কয়েক বার সে বিপদেও পড়েছে। প্রণব উপরের সাইনবোর্ডটার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে তাকে বলল, 'ও ত আপকো ফার্মকো নাম। আপকো নাম হাম পুছা।'

একটুমাত্রও দমে না গিয়ে দোকানদার উত্তর করল, 'হামরা নাম কেয়া হোগা! হাম কুছ নেহি জান্তা!'

প্রণব তাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করল, কিন্তু মাড়োয়ারী কিছুতেই নাম বলতে চায় না। প্রণবের ইচ্ছা হল তার টুঁটিটা চেপে ধরে, কিন্তু সে এখন একজন পাবলিক সারভেণ্ট। তাই এতো সহজে রাগ করলে তার চলে না। সহ্য করা তার একটা ডিউটির মধ্যে। তাই তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডাই চলছিল। এমন সময় ভাড়ার তাগাদায় বাড়িওয়ালার দারোয়ান মীর সাহেব সেখানে হাজির হল। মীর সাহেব একজন পেনসনভোগী পুলিসের জমাদার। পুলিসের সুবিধে অসুবিধে সে ভাল করেই বুঝত। মীর সাহেব মাড়োয়ারীকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'উসমে কেয়া হ্যায়? নাম বোল দেও। বেগার নামসে কেইসে বয়ান লিখেগা।'

মীর সাহেবের মধ্যস্থতায় অনেক চেষ্টার পর মাড়োয়ারী উত্তর করল, 'হামরা নাম, সুখোন সরোয়গী। লেকেন হাম কোর্টমে নেহি জায়গা। ইস্‌বাড়ে হাম জানতা ভী নাহি কুছ।'

এইটুকুতেই প্রণব যেন ধন্য হয়ে গেল। মাড়োয়ারীর নামটা টুকে নিয়ে প্রণব এবার এক বাঙালী মনোহারীর দোকানে এসে হাজির হল। তারপর দোকানদারকে উদ্দেশ করে প্রণব জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মশাই কিছু দেখেছেন?'

বাঙালী দোকানদারটি এক নিঃশেষে প্রায় মুখস্থর মত বলে গেলেন, 'আজ্ঞে আমি খেতে গেছলাম সে-সময়। আমি এই চুরি-টুরির ব্যাপার কিচ্ছু জানি না।'

প্রণব এইরকম একটি উত্তরের জন্যে প্রস্তুতই ছিল। তাই সে এতে একটুমাত্রও বিব্রত বোধ না করে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ! তাহলে আপনার নাম?'

বাঙালী দোকানদারটি এইবার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে বাপ। আমি কোর্টে যেতে পারব না। কারবারী লোক আমি। আমি তো বলেছি স্যার। আমি কিছু জানি না।'

প্রণব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, ঐ কথাই তো লিখে নিচ্ছি! আপনি নামটা বলুন না।'

কিন্তু ভদ্রলোকটি মাড়োয়ারীর মতো নাম বলতে নারাজ। পুলিসের খাতায় নাম তুলে দেওয়ার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে হয়তো তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। কিছুতেই তিনি প্রণবকে তাঁর নাম জানাবেন না। এদিকে তাঁর নাম জানার জন্য প্রণবেরও জেদ বেড়ে গিয়েছে। অনেক ধস্তাধস্তির পর তিনি নিজের নাম বললেন, 'আমার নাম মহীন্দ্র গাঙ্গুলী। দেখবেন স্যার, শেষে কোর্টে ফোর্টে—'

এইভাবে এক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত চেষ্টার পর প্রণব ছ'টি নাম টুকে নিল। শুধু নামের জন্য আর পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। তাই প্রণব এই বিষয়ে আর চেষ্টা করল না। এই একটিমাত্র মামলা নিয়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না। থানার অন্যান্য মামলারও তদারকি বাকি রয়েছে। তাই সেদিনকার মত এই মামলার তদন্ত শেষ করে প্রণব ভদ্রলোকটিকে বলল, 'আজ আপনাকে আর দরকার হবে না। আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন।'

ভদ্রলোকটি ফুটপাথের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বলে উঠলেন, 'কোথায় যাব বাবা? কোন্ মুখ নিয়ে—'

ভদ্রলোককে এইভাবে এই জনাকীর্ণ রাজপথের ফুটপাথের ওপর থেবড়ে বসতে দেখে সেখানে স্বভাবতঃই একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। এই ভদ্রলোককে

নিয়ে প্রণবের এখন হল এক মহা মুশকিল। এ অবস্থায় ভদ্রলোকটিকে একলা ফেলে থানায় ফিরে যাওয়াও যায় না। অগত্যা প্রণব তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়াই সমীচীন মনে করল।

প্রণব ও জমাদার রামসিং কোন রকমে ভদ্রলোকটিকে ধরে ট্রামে উঠিয়ে নিল। এদের এই ভাবগতিক দেখে ট্রামের যাত্রীরা একবার মাত্র জিজ্ঞাসু নেত্রে এদের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর গ্যাঁট হয়ে যে যার সিটে বসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। এদিকে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়া মাত্র ট্রাম ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকটিকে নিয়ে তারা যখন তাঁর বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন বেলা পাঁচটা বেজে গেছে!

এই ভদ্রলোকটির নাম ছিল ধীরাজবাবু। মধ্যবিত্ত অথচ বনেদী শিক্ষিত পরিবারের সন্তান তিনি। দোতলা একটি পৈত্রিক বাড়িতে তাঁরা থাকেন। সংসারে তাঁরা মাত্র তিনটি প্রাণী। তিনি, তাঁর স্ত্রী আর তাঁদের একমাত্র আদরের দুলালি প্রগতি।

বাড়ির দোরে দু-একবার মৃদু ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোর খুলে গেল। বাড়ির সকলে এতক্ষণ ধীরাজবাবুর বাড়ি ফিরতে এতো দেরি হওয়ায় চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁর প্রত্যাগমনের জন্যে অধীর-আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ শোনা মাত্র ধীরাজবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ, এত দেরি করে! টাকা আনতে গেছ, আমরা তো ভেবেই মরি।'

গিন্নীর কথায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে ধীরাজবাবু বলে উঠলেন, 'ওগো, সব গেছে গো। ডাকাতে লুঠে নিয়েছে।'

ধীরাজবাবুর স্ত্রী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিস দেখে তাঁর আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। টাকার শোক পুরুষের চেয়ে বোধহয় মেয়েদের আরও বেশী লাগে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। মুখ দিয়ে তাঁর একটা শব্দ বেরুতে লাগল—উ উ উ—আঁ আঁ আঁ। তাঁর হাত-পা'র টান ও মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল ফিট হয়েছে। ধীরাজবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে প্রণবকে বললেন, 'তুমি একটু ধর ওঁকে। আমি চট করে বরফ নিয়ে আসি। চাকরটা আবার কোথায় গেল ছাই।' কথা ক'টা বলে ধীরাজবাবু একদৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রণব অনন্যোপায় হয়ে রোগীর বাম হাতটা ও মাথাটা চেপে ধরে সেইখানে

বসে পড়ল। রোগী জোর করে বারে বারে মাথাটা মাটির উপর ঠুকে দিতে চাইছে। এদিকে প্রণব যথাসাধ্য তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। এমন সময় কার যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া তার দেহের উপর এসে পড়ল। আর ঠিক সেই একই সময় খস্‌খস্ শাড়ির আওয়াজের সঙ্গে তার কানে এল একটা সকরুণ কণ্ঠস্বর, 'ওমা একি,—মা, কি হল.?'

ধীরাজবাবুর মেয়ে প্রগতি সেতার হাতে করে নীচে নামছিল। বাড়িতে পিতার আগমন সে জানতে পারে নি। হঠাৎ নীচে মা'র এই অবস্থা দেখে সে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে তার শখের সেতারটি সাবধানে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল! প্রণবকে সে প্রথমে দেখেও বোধহয় দেখতে পায় নি।

প্রণব তার মাকে ধরে রাখতে পারছে না দেখে সে ছুটে এসে মা'র ডান হাতটা চেপে ধরল। উত্তেজনার মাথায় সে প্রণবের পরিচয় নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে নি। সে এইবার দ্বিধাহীন চিত্তে প্রণবকে অনুরোধ করল, 'দেখুন, ওই জানালার ওপর একটা স্মেলিং সল্টের শিশি আছে। ওটা আপনি এখানে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন না।'

কী সুললিত ও সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠস্বর! প্রণব অনেকদিন এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর শোনে নি। এতক্ষণে সে অবাক্ হয়ে প্রগতির দিকে চেয়ে দেখল। এত সুন্দর রূপ সে কখনও দেখে নি। সহসা তাকে দেখলে মনে হয় যেন একটা জ্বলন্ত স্টোভ। কাঁচা সোনার মত মেয়েটির গায়ের রঙ। তার মাথায় কালো চুল থেকে মুক্তাস্বচ্ছ নখগুলো পর্যন্ত যেন বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রণবের মুখ দিয়ে অলক্ষ্যে বের হয়ে এল—'বাঃ!'

ধীরাজবাবু ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে এল। প্রণব ধীরাজবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তাঁদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। এই সময় আবার তার নজর পড়ল প্রগতির দিকে। দরজার পাশে তেমনি নির্বাক ও নিস্পন্দভাবে সে দাঁড়িয়েছিল। চোখাচোখি হতেই প্রণম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে হাঁক দিয়ে উঠল, 'জমাদার সাব! থোড়া ঠায়রো।'

জমাদার রামসিংও এতক্ষণ প্রগতির ঘরের ভিতরের দিকে চেয়ে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরকার যা কিছু ঘটনা সে শুরু হতেই লক্ষ্য করে এসেছে। এমন কি প্রগতির এই অপরূপ রূপলাবণ্যও তার চোখ

এড়ায় নি। এইবার সেও তাড়াতাড়ি মুখটা বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে উত্তর করল, 'জী, হুজুর।'

কোন রকমে টলতে টলতে কতকটা পথ চলে এসে প্রণব এক লাফে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল। ধীরাজবাবু প্রণবকে ট্রাম পর্যন্ত পৌছে দিতে এসেছিলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রণব হাসিমুখে তাঁকে বলল, 'আপনি কাল একবার থানায় আসবেন। অন্য একটা লাইনে এনকোয়ারী আরম্ভ করব।'

লোকজনের উঠা-নামার সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র ট্রাম ছেড়ে দিল। তাদের বাড়ির জানালার ধারে তখনও প্রগতি দাঁড়িয়ে আছে কি না তা আর চেষ্টা করেও দেখা যায় না। প্রগতিদের বাড়িটা থেকে ততক্ষণে ট্রাম অনেকটা দুর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। প্রণব ট্রামের সিটে চুপ করে বসে প্রগতির কথাই ভাবছিল। সত্যই সে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটেরই উপযুক্ত মেয়ে। অত সুন্দর একটা মেয়েকে কি পুলিসের দারোগার বিয়ে করা উচিত! কিন্তু তবুও তার মনে বড় লোভ হল। সে ভাবল তাই-বা সম্ভব না হবে কেন? শিক্ষায়-দীক্ষায়, বংশগরিমায় ঐ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সে কিসে হীন? মাত্র একটা গ্রহের বৈগুণ্যে সে আজ দারোগা। গ্রহের দোষে ম্যাজিস্ট্রেট সে না হয় হতে পারে নি। তা বলে—

'এই যে প্রণববাবু। আপনার কাছে যাচ্ছিলাম ভাই। তা কেমন আছেন?'

প্রণব চমকে উঠে দেখে পুলিস কোর্টের উকিল সুধীরবাবু তার পাশে এসে কখন বসে পড়েছে। তার চিন্তাধারা এই ভাবে ছিন্ন হওয়ায় প্রণব একটু বিরক্ত হয়ে উঠল। এই সময় তার আর কাউকেই যেন ভালো লাগছিল না। কিসের একটা অব্যক্ত সুরের রেশ তার সমস্ত মনটাকে যেন মশগুল করে রেখেছে। প্রণব মনের সত্যকার ভাব কোন রকমে গোপন করে উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে আপনি? এত রাত্রে কি ব্যাপার?'

প্রণবের স্বভাব-চরিত্র ও মতিগতি সম্বন্ধে পুলিস কোর্টের উকিলবাবুটি ভালোরূপই ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোর্টে প্র্যাকটিসের চেয়ে থানা-প্র্যাকটিসই তাঁর বেশী। প্রণবের কাছ থেকে যে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনো সম্ভাবনাই নেই সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্তই ছিলেন। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে উকিলবাবু প্রণবকে বললেন, 'দুটো চোর আপনারা ধরেছেন, না? মদনিয়া

আর কিষণিয়া যাদের নাম। আপনার থানারই তো কেস। তাদের জামিন-টামিন চাই তো। হুঁম্।'

এই ধরনের উকিলদের সম্বন্ধে প্রণবও কম ওয়াকিবহাল ছিল না। প্রণব সতর্ক দৃষ্টিতে উকিলবাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখে উত্তর করল, 'ওদের জামিন তো হবে না। একে চুরির কেস, তারপর সিঁদকাটি সুদ্ধু ওরা ধরা পড়েছে।'

প্রণবের কাছ থেকে এইরকম একটা উত্তরই উকিলবাবু আশা করেছিলেন। তাই প্রণবের শেষ কথাটা আর শেষ না করতে দিয়ে উকিলবাবু একটু সরে এসে প্রণবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে উঠলেন, 'জামিন হবে না তা তো জানিই, স্যার। তবে ফিটা আদায় করতে তো হবে। ওরা সব বোকা-সোকা লোক। বুঝলেন কিনা এই ধাপ্পা-টাপ্পা দিয়ে এরকম করে যে কয়দিন চলে। আমাদের প্র্যাকটিসের এখন যা অবস্থা সবই তো বুঝছেন।'

প্রণব উকিলবাবুর কথার কোনও উত্তর দিল না। উকিলবাবুর চোখের ওপর চোখ রেখে আপন মনে সে একটু হাসল মাত্র।

উকিলবাবুর পিছনের বেঞ্চে একটা মরকুটে হিন্দুস্থানী লোক বসেছিল। তার দিকে চেয়ে উকিলবাবু এইবার বলে উঠলেন, 'লে-আও ফি। জলদি লে-আও; তুমরা কাম কর দিয়া। রাতটো রয়নে দেও কাল ফজির মে তোমরা. আদমী লোঁককো জামিন-উমিন সব কুছ হো যায়গা।'

কথা কয়টা প্রণবের কানে গেল। সে এর তীব্র প্রতিবাদ করতেও যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে প্রতিবাদ করবার আর কোন সুযোগ না দিয়ে উকিলবাবু মক্কেলটির হাত ধরে তাকে একরকম টেনে উঠিয়ে দুজনে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

এইসব উকিলবাবুরা যে ধরনের মক্কেল নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা এত সহজে সম্ভব নয়। এর কারণ তারা পরস্পর পরস্পরকে চিরকাল সন্দেহের চোখেই দেখে এসেছে। এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত দিলে উকিলবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। তাই ট্রাম থেকে মক্কেলসমেত নেমে পড়ে উকিলবাবু ফুটপাথের ওপর থেকে প্রণবকে সম্বোধন করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,. 'তাহলে ওই কথা রইল। ঠিক করে ওতেই তাহলে করে দেবেন সেটা—'

কিন্তু কেন ও কি তিনি করে দেবেন, তা আর তিনি স্পষ্ট করে বললেন না। এর চেয়ে স্পষ্ট করে এই সব কথা সর্বসমক্ষে কাউকে বলাও

যায় না। সেইজন্য বোধহয় সেটা প্রণবের অজ্ঞাতে মক্কেলকে পথে বুঝিয়ে বলবার তাঁর ইচ্ছে রইল।

আর পাঁচজনের মত প্রণবও একজন অনেস্ট অফিসার ছিল। সে উকিল-বাবুর চালাকিটা সহজেই বুঝে নিয়েছিল। তবে ট্রাম অনেকটা দূর এগিয়ে আসায় তার আর প্রতিবাদ করা হল না। পরের দিন আদালতে গিয়ে দু' হাজার উকিলের মধ্যে থেকে তাঁকে খুঁজে বার করাও প্রণবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এই সব ব্যাপারে উকিলদের শায়েস্তা করাও সহজ কাজ নয়। প্রণব বিরক্তির সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার দিকে চেয়ে ভাবতে শুরু করে দিল।

তদন্ত করতে এসে ওরকম বিপদে প্রণব কোনদিন পড়ে নি। কিছুতেই সে প্রগতিকে মন থেকে দূর করতে পারছিল না। তার লোভ যেন ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। প্রণব ভালরকমেই বুঝেছিল যে টাকা না পেলে প্রগতি যতই সুন্দর হোক না কেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পিতাঠাকুর তাঁর পুত্রের জন্য বধূরূপে তাকে কখনই গ্রহণ করবে না। টাকার অভাবে ধীরাজবাবু তাঁর কন্যাকে প্রণবের হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হবেন। কিন্তু—কিন্তু সব টাকা যদি রিকভারী হয়ে যায়? তখন কি হাকিম ছেলে ছেড়ে ধীরাজবাবু তাঁর কন্যাকে প্রণবকে দেবেন? না, না, কক্ষণো তা তিনি দেবেন না। প্রণবের মুখ দিয়ে তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ল, 'দ্যুৎ। রিকভারী! কে চেষ্টা করছে?'

এমনি চিন্তার মধ্য দিয়ে কখন যে ট্রাম হ্যারিসন রোড-এর মোড় পার হয়ে গেছে তা প্রণবের খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ ক্যানিং স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এসে তার চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। জমাদার রামসিং সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামএ বসে তার বাবুর মতিগতি লক্ষ্য করছিল। প্রণবকে নামতে দেখে সেও নেমে পড়ল।

প্রণবের ধারণা হয়েছিল যে জমাদার রামসিং থানার কাছে ট্রামের ঠিক স্টপেজেই নেমে গিয়েছে। জমাদারকে সেখানে নামতে দেখে প্রণব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে উঠল, 'এতনা দূর হাম লোক আ-গিয়া হ্যায়, কাহে নেহি হামকো বোলায়া?'

পুলিসের একজন পুরানো জমাদার রামসিং। বাবুর মনোভাব বুঝতে তার আর বাকি ছিল না। প্রগতির সেই রূপলাবণ্য তারও চোখে পড়েছিল। তারপর ভিতরের ব্যাপার সে বরাবরই দূর থেকে লক্ষ্য করেছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে হাসি চেপে সে উত্তর করল, 'গোস্তাকি মাপ করিয়ে হুজুর। হামরাভি খেয়াল নেহি থে।'

তিন

প্রায় আধ-মাইলটাক জমির উপর প্রকাণ্ড একটা বস্তি-গ্রাম। শহরের বুকের ওপর যে এ-রকম একটা কদর্য জায়গা থাকতে পারে, তা সাধারণ লোকের ধারণার বাইরে। বস্তিটার বুক চিরে এলোমেলোভাবে অনেকগুলো অপবিসর পথ এ-ধার ও-ধার চলে গিয়েছে। পথের দু-পাশে সারি সারি খোলার ঘর। দরজায় দরজায় চামসে-ধরা চটের পর্দা। বাড়ির দোঁয়াটে জল ও ফেনে বস্তির পথগুলো জায়গায় জায়গায় পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। তাই পথের ওপর জায়গায় জায়গায় ইট পেতে পথগুলো লোক চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

করিম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পথের এই দুর্গম অংশটুকুর সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ইটগুলোর ওপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলে এসে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এ-ধার ও-ধার একবার ভাল করে দেখে নিয়ে দরজার চটটা চট করে সরিয়ে সেখানকার বাইরের দিককার একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘরের মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপরে বসে আমিনা বিবি তামাক খাচ্ছিল। করিমকে এত সকালে ফিরে আসতে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল। সে জানত যে তাকে তার সারাদিনের কাজ ও অকাজের পর দলের নিয়মানুসারে তাদের সর্দারের আড্ডায় একবার করে হাজিরা দিতে হয়। তার দেয় টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ও প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে তবে সে ফেরে। আড্ডার অফিস থেকে রাত এগারটার আগে কোন দিনই সে ফিরতে পারে নি। সে বিস্মিত হয়ে হুঁকোর নলটা তাড়াতাড়ি মাদুরের ওপর নামিয়ে রেখে বলে উঠল, 'এখনি আইলি কেমনে রে? তু সে আফিস যাওত নি?'

ঘরের দেওয়ালে একটা সিনেমা প্লাকার্ড আঠা দিয়ে আঁটা ছিল। আর তার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল বিখ্যাত বাঙালী নটী চামেলিরানীর একখানি ছবি। চামেলিরানীর সেই ছেঁড়া ছবিখানির দিকে একবার সতৃষ্ণভাবে চেয়ে নিয়ে করিম উত্তর করল, 'চুপ—শা—উন্‌লোক্‌কে হামি রূপেয়া নেহি দিবে। হামি সে হাপনি লিয়ে লিবে। হামি আজ হাপনি খাটিয়ে কাম করিয়েছি, বুঝোল?'

আমিনা করিমের বিয়ে-করা স্ত্রী নয়। তাদের এই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে খুব বেশী দিনের তাও নয়। তবে এই কয়দিনেই তাদের এই সম্পর্কটা বেশ পাকাপাকি হয়েই গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আমিনার দিক থেকে এটা বিশেষ ভাবে সত্য। এক কথায় আমিনা তাকে ভালবেসে ফেলেছিল।

করিমের কথায় আমিনা বেশ একটু ভয় পেয়ে গেল। কি এক অজানা আশঙ্কায় সে শিউরে উঠল। এই বিশ্বাসঘাতকতার যে কি সাংঘাতিক পরিণাম, আমিনার তা ভাল করেই জানা ছিল। তাই সে প্রতিবাদ করে বলল, 'সে উমন্ করিস না। এ বড় খারাপী কাম আছে। ইস্‌মে বেইমানিকো বাত আতি।'

করিম আমিনার এই কথার কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় ছেদী কোথা থেকে একটা তাড়ির ভাঁড় হাতে করে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ দরজার পর্দাটা সরে যাওয়ায় করিম ভয় পেয়ে গেল। সে এক লাফে ঘরের পিছনের পাঁচিলের শেষ সীমা পর্যন্ত ছুটে এসে বলে উঠল, 'কোন শা—রে! কোন তু?'

কাম ফতে করার পর ছেদী করিমের পিছন পিছন অনেকটা দূর ছুটে এসেও শেষ পর্যন্ত সে তার বন্ধুর নাগাল পায় নি। এখানে ওখানে বৃথা খোঁজাখুঁজি করে তাকে না পেয়ে শেষে সে একটা বেআইনী তাড়ির দোকানে ঢুকেছিল। সেখানেও করিমকে সে খুঁজে না পেয়ে পরিশেষে করিমের বাড়িতে এসে পৌঁচেছে। ছেদি টলতে টলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাড়ির ভাঁড়টা থপাস করে মেঝের উপর বসিয়ে দিয়ে উত্তর করল, 'আরে কেও করিম! তু শালা পালিয়ে হেনে এয়েছিস? লে লে, খাইয়ে লে। দশ বাজে সে হাজিরি আছে। আড্ডায় সে লোট জমা দিতে হবে না?'

বন্ধু ছেদির এই হক উপদেশ এইদিন আর করিমের মনঃপূত হল না। সম্পূর্ণ. ভিন্নরূপ এক দুর্দমনীয় নেশায় আজ তাকে পেয়ে বসেছে। এই

অদ্ভুত নেশার কবল থেকে আজ আর তার পরিত্রাণ নেই। করিম ছেদির কথার কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ছুটে এসে তাড়ির ভাঁড়টা বাইরের উঠোনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে উঠল, 'তো শালার লজর তো সে বড়ো খারাপ আছে। হামরা কি আজ ওই খাব, এ্যাঁ। সে বিলিতি মাল কিনব। চামেলি বিবিকো বাড়ি ভি যাব। খোদা দিইয়েছে, শালে।'

চামেলি বিবির নাম শুনে ছেদি খুশি হয়ে উঠলেও আমিনা তা সহ্য করতে পারল না। হাজার হোক আর পাঁচজন মেয়ের মত সেও একজন মেয়ে। সকলের মত তারও শরীর রক্তমাংস দিয়ে গড়া। ক্রোধ, হিংসা ও ভালবাসা তাদের মতো সেও হারায় নি। দেওয়ালের গা থেকে চামেলিরানীর ছেঁড়া ছবিটা সে টান দিয়ে উঠিয়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'যা না তু লোক চামেলি বিবির বাড়ি। হেনে আইলি কেন্?'

করিম আমিনাকে ভয় না করলেও সমীহ করত। মিছামিছি একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে সে নারাজ ছিল। আর পাঁচজন পুরুষের মতো এই একটা জায়গায় এসে তাকেও কিছুটা কাবু হয়ে পড়তে হয়। এ ব্যাপারে সৎ ও অসৎ নারী মাত্রই বোধ হয় বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে, তাই এই সময় চোর, গুণ্ডা, ডাকাতরাও তাদের সম্মুখীন হতে ভয় পেয়ে যায়। করিম আমিনাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর করল, 'আরে সে ঠাট্টা বুঝতও না। তুহকে ছাড়িয়ে হামি সে আসমানে ভি যাবে না।'

এদের এই চালাকি বুঝতে আমিনার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। এর চেয় বেশী এদের কাছে কিছু আশাও সে করতে পারে নি। তা' ছাড়া আমিনা বিবি ছিল একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে জানত যে এ সব ব্যাপারে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করা তার সাজে না। তাই একটিমাত্র শব্দ শুধু তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল, 'বদমাস।'

আমিনার অভ্যস্ত মন একটু যেন নরম হয়ে এসেছে। এই সুযোগে সরে পড়াই তাদের সমীচীন মনে হল। করিম ও ছেদি অপরাধীর মত আমিনার দিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর আর কোন কথা না বলে হাত ধরাধরি করে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শুরুতে আমিনা বিবির করিম ও ছেদির উভয়ের সঙ্গেই ছিল সমান ভাব। শেষে আমিনা বিবির মন করিমের দিকে ঢলে পড়ে। সে হয়ে উঠে তার সাময়িক স্ত্রী। ছেদির সঙ্গে তার একটা পাতান সম্পর্ক শুধু থেকে যায়। এই সম্পর্কটা ছেদি খুব সম্মানের সঙ্গে বজায় রেখেছিল। সে আমিনাকে ফুলদান বলে ডাকত। আর ভাবি-সাহেবারই মত সম্মান দেখাত।

ছেদি রাস্তার উপর থেকে আমিনাকে সম্বোধন করে বলল, 'আরে শালাকে হামি ফিন হেনে লিয়ে আসবে। ঘাবড়াস না! বুঝোল? তুহকে ছোড়ে ও থাকতে পারবে না। ই সব দু'ঘণ্টাকো মামুলি বাত আছে। তু ভাবি, ইসমে দুঃখ্ না করিস।'

করিম কোনও দিনই আশা করে নি যে আমিনা তার কাছে সতী হয়ে থাকবে। আমিনাও করিম যে সদা-সর্বদাই তার কাছে সৎ হয়ে থাকবে তা কখনও কল্পনা করে নি। কিন্তু তবুও তারা পরস্পর পরস্পরকে ভল-বাসত। আর সেই ভালবাসা জগতের সৎ ও সতীদের ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

করিম তাদের ডেরা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামা মাত্র ক্ষণিকের জন্য আমিনার মধ্যে একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে সে সহজেই তার মনের এই কদর্য ইচ্ছা দমন করতে পেরেছিল। বিরস বদনে নীরস নয়নে আমিনা করিমদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর সে দরজার চটটা ভাল করে ফেলে দিতে দিতে অভিমানের সুরে উত্তর করল, 'আচ্ছা, হামিও যে মাস্টারবাবুর বাড়ি যাওত। ফুর্তি সে হামিও—'

একজন বাঙালী মাস্টার বস্তির শেষের দিকে একটা কোঠাবাড়ির একতলায় একটা ঘরে থাকত। করিম একদিন দুপুরবেলা এই মাস্টারের ঘর থেকে আমিনাকে বার হতে দেখে ভয়ানক ক্ষেপে যায়। তাড়ির ঝোঁকে দুই-এক ঘা প্রহারও সে তাকে করে। কিন্তু শেষে তাদের এই কলহ ছেদির মধ্যস্থতায় মিটে গেছল।

পৃথিবীর অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত করিমের মধ্যেও দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ছিল। তার মধ্যেকার একটা ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহেই আমিনাকে ভালবাসে। আমিনার এই শেষ কথাটা তীরের মত ছুটে গিয়ে করিমের কানের মধ্যে একেবারে বিঁধে গেল। আমিনার কথায় করিম দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় উঁচু করে রাস্তা থেকেই

বলে উঠল, 'ফিরিয়ে আসিয়ে সে মাস্টার ফাস্টার হামার মিলবে তো হামি জানসে মারিয়ে দেবে। হাঁ, এমন মারবে যে সে মরিয়ে যাবে।'

আমিনার মত মেয়ের পক্ষে এত সব ভয় করলে চলে না। চোর ডাকাতদের নিয়ে সে ঘর করে। তাই এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও সে জানে। আমিনা করিমের কথাটা একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না, বাড়ির ভিতর দিকে চলে যেতে যেতে সে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'এক বাজে সে পয়লা নাহি আওত ত হামি দরজা নাহি খুলবে! সে পয়লাসে হামি কিন্তু বলিয়ে দিচ্ছি, হাঁ।'

কথা কয়টা বলে আমিনা পর্দার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর করিম ও ছেদি গলা জড়াজড়ি করে বস্তির সেই অপরিসর পথ দিয়ে চলতে শুরু করে দিল। বস্তির ওপারেই ছিল মেছুয়াবাজার স্ট্রীট। চলতে চলতে তারা সেই মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে এসে পড়ল। কিন্তু রাস্তার ওপর পা দিয়েই করিম হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে ছেদিকে একটা ঠেলা দিয়ে বস্তির অপর একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ও সেই সঙ্গে সে নিজেও তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, 'পুলিস।'

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে একজন জমাদার কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে নিয়ে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বোধহয় তারা তাদের চিনত। তাই এদের এই সতর্কতা ও আত্মগোপনের চেষ্টা। পুলিস ক'জন অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভয়-ভাবনাও দূর হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা আবার পথ চলতে লাগল। পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে করিম বলল, 'এবে চল সে বাঙালী বিবির বাড়ি। যেত টেকা লাগে হামি দিবে। কুছু পরোয়া হামি করবে না।'

বাঙালী বিবিদের মধ্যে চামেলিরানীকেই করিম বেশী পছন্দ করত। অনেকবার শহরের কয়েকটা টকি সিনেমায়, চার আনার সীটে বসে তাকে সে দেখেছে। হাতে অতগুলো টাকা পেয়ে তাকেই করিমের প্রথম দেখতে ইচ্ছে হল। বস্তুতঃপক্ষে সে ছিল তার জীবনের এক স্বপ্ন। তাই অনেক কষ্টে তার ছবিখানি সংগ্রহ করে ঘরের দেওয়ালে সে সেঁটে রেখেছিল। করিমের মত ছেদিরও যে তাকে দেখতে ইচ্ছে না হত তা নয়। কিন্তু চুরির টাকা যথা নিয়মে দলে জমা না দিয়ে ওভাবে খরচ করতে তার সাহসে কুলোচ্ছিল না। ন্যায় অন্যায়ের কথা বাদ দিলে ছেদি জানের পরোয়া করে।

তাই করিমের এই প্রস্তাবের কথা শুনে সে একটু ভেবেচিন্তে উত্তর করল, 'তোকে ওরা জানসে মারিয়ে দেবে। সে টেকা নিয়ে ত ভাগিয়ে আসলি! ওরা হামলা করলে তু শালা কি সামাল দিতে পারবি?'

করিম তখন একেবারে বেপরোয়া। ভয় ডর ও লজ্জাকে চির বিদেয় দিয়েই সে এ কাজে নেমেছে। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই সে উত্তর করল, 'আরে দুর! মরিয়ে ত একরোজ সবকই যাবে। ইসমে ডর কি আছে? আজ ত দারু পিও, ফুর্তি কোরো। মারিয়ে ত সে কাল ফেলবে।'

করিমের এই কথাটার মধ্যে একটা নির্মম সত্য ছিল। ছেদির কানেও ওটা মন্দ লাগল না। দেখতে দেখতে তাদের মনের সকল সন্দেহ কর্পূরের মত উড়ে গেল। কিন্তু এতো সত্বেও মুশকিল বাধল এক জায়গায়। দশ হাজার টাকা তাদের কাছে আছে বটে, কিন্তু তা আছে দশখানি হাজার টাকার নোটের মধ্যে আত্মগোপন করে। যে টাকার জন্যে এত গণ্ডগোল সেই টাকাই এখন তাদের মুশকিলে ফেললে। হাজার টাকার নোট নিজেরা ভাঙাতে যাওয়া মানে ধরা পড়া। এতটা নির্বোধ তারা ছিল না। এ সব কাজের হদিস দলের সর্দাররাই শুধু জানে। এ বিষয়ে দলের অন্যান্য লোকের মত করিম ও ছেদি এখনও মাথা ঘামায় নি। এই ব্যাপারে দলের আর সকলের মত তারাও তাদের সর্দারদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এই গোলমেলে নূতন পরিস্থিতিতে ছেদিরাম ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অনুশোচনায় তার মন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একবার তার মনে হল করিমকে ফেলে পালিয়ে গিয়ে দলের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বহুকালের সুখ-দুঃখের বন্ধুকে ফেলে সে পালিয়েই বা যায় কি করে? যাকে সে আমিনাকে দিয়েছে তাকে সে নিজেকেও দিতে পারে। ছেদি আরও একটু ভেবে দেখল। তারপর সে করিমকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'এ বড় ঝঞ্ঝাটি কাম আছে। ওসব থাক মাইরি! আজ ত ভাই চল। টেকাটা দলে জমা দিই গে। ভাগের সে একশ' টেকা ত লিয়ে আসি।'

করিম এতো সহজে দমবার পাত্র ছিল না। সে ছিল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পকেটমার। এই কাজে দক্ষতা হিসেবে সে ইতিমধ্যেই দলের নিকট থেকে 'সেয়না' উপাধি পেয়েছে। এখন সে নিজেদের জন্য একটা পৃথক দল তৈরি করে সর্দার হবারও স্পর্ধা রাখে। তবে এই বামাল পাচারের ব্যাপারে তার একটু তালিমের দরকার, এই যা। ছেদির এই ভীরুতায় সে বিরক্ত হয়ে বলে

উঠল, 'হামি সে বিলাইতি মাল কিনবে। চামেলি বিবিকো কুঠি যাবে। সে একশ' টেকায় হোবে? তু শালা বুড়বাক আছিস।'

একটু ভেবে নিয়ে ছেদি উত্তর করল, 'সে টেকা তোড়াবী কেইসে রে?'

করিমের বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল ছেদির চেয়ে বহুগুণ চৌকস। খামকা বিপদ আপদে অতীতে বহুবার সে এদের নেতৃত্ব নিতে পেরেছে। একটু ভেবে সে এই সব মুশকিলের একটা আসানও করে ফেললে। এ বিষয়ে ছেদিকে আশ্বস্ত করে করিম হেসে বলল, 'চল ত সে খালুছাবের কাছে। সে ঠিক একটা মতলব বাতলে দেবে। হামাদের দলের উপর তার গোঁসা ভি আছে।'

ছেদি আর কোন উত্তর না দিয়ে অন্ধের মত করিমকে অনুসরণ করে চলল। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে ছেদি লাফিয়ে বলে উঠল, 'ওই শালা হাফিজ, ওই সে আসতেছে।'

দূরে পথের উপর লোকের ভিড়ের মধ্যে তাদের দলের হাফিজকে দেখা গেল। বেশ বুঝা গেল যে এই সময় সে এদেরই খোঁজে বেরিয়েছে। খোদ সর্দার যে তাকে এদেরই খোঁজে পাঠিয়েছে তাতে আর এদের সন্দেহ ছিল না। হাফিজকে দেখা মাত্র করিম সামনের একটা মুসলমান হোটেলে ঢুকে পড়ল ও ছেদি ছুটে গিয়ে হোটেলের পাশের গলিটার মধ্যে একটা পিছাব-খানার ভেতরে ঢুকে আত্মগোপন করল।

চার

'হোয়ের ঈ উইল গো। গুড মরনিঙ। আই এম্ এ মারচেণ্ট। হোয়াট ইউ ডু। আই লিভ ক্যালকাটা।'

মারকাস স্কোয়ারের ধারে একটা দোতলা মাঠকোঠার ঘরে বসে সেখ মোজেজ ওরফে খালুছাব ইংরেজী শিখছিল। একজন বাঙালী মাস্টার একখানি রাজভাষার সাহায্যে তাকে দরকারী কয়েকটা ইংরেজী শিখিয়ে চলেছে, সেখ মোজেজেরই নির্দেশমত মাস্টারজী এই সব তাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল।

শুধু ইংরাজী কথা শিখলেই হয় না। অর্থাৎ বুলি ও গৎ শেখারও দরকার। তা না হলে এতো করে ইংরাজী শিখেও তা কাজে না আসতে পারে। মোজেজের কাজকর্ম সব সাহেব ও সাহেবী লোকদের মধ্যেই নিবদ্ধ। পড়তে পড়তে সেখ মোজেজ মাস্টারজীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'দেখিয়ে মাস্টার-সাব! মতলবকো সাথ হামকো বুলিকো গৎ ভি ঠিক ঠিক শিখলায়ে দিজিয়ে।'

মাস্টারজী এখানে শুধু মাস্টারী করে না। পড়াশোনার ব্যাপারে তাকে তার এই ধনী ছাত্রের হুকুমও তামিল করতে হয়। এর কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটুকু সময়ও মোজেজ এই শেখাশেখির ব্যাপারে ব্যায় করতে নারাজ। মাসে মাসে মাস্টারবাবুর দু'শো করে টাকা পেলেই হল। এইজন্য এই বিষয়ে সে ছাত্রের কথামতই যে চলবে তাতে আর বিচিত্র কি? তবুও মাস্টার উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ছেদি ও করিম ঘরে ঢুকে পড়ে বলল, 'গোস্তাকি মাফ করিয়ে ছাব। বহুত জরুরী একটা কাম আছে।'

সেখ মোজেজ আসলে জাতিতে য়িহুদি, কিন্তু ধর্মে ছিল সে একজন মুসলমান। পকেটমার মহলে সে খালুছাব বলেই পরিচিত। চেহারাটা তার সাহেবদের মত টকটকে রাঙা। দিল্লী থেকে ক্যালকাটা তার জুরিসডিকসন। সাহেব সেজে স্যুট পরে, সে ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে ঘোরে ও সুবিধেমত সাহেবদেরই পকেট সাফ করে। কাজের সুবিধের জন্য তার কিছু ইংরেজী শেখার দরকার হয়েছিল। তাই বুড়ো বয়সে সে মাস্টার রেখে ইংরেজী শিখতে শুরু করে দিয়েছে।

করিমের দলের দলপতি মুন্সিলালের সঙ্গে এর ঘোরতর শত্রুতা। তাই শত্রুদলের করিম ও ছেদিকে দেখে সে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এদের দেখে সে যে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে নি তা নয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মাঠকোঠার জানালা দিয়ে বাইরের ব্যাপার একটু দেখে নিলে, তারপর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, সাথে পুলিস ভি আছে নাকি? তু শালারা ফজিরমে হেনে এয়েছিস?'

মোজেজ যে মুন্সিলালের দলের করিমকে আদপেই বিশ্বাস করবে না তা করিমের ভাল করেই জানা ছিল। এইজন্য সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। তাই মোজেজের কথা শেষ হবার আগেই করিম বলে উঠল, 'খোদাকো

কসম। হামি ও শালার দল ছাড়িয়ে দিছি। হামাকে সে একটু ভালো মতলব উতলব দিতে হবে।'

শিক্ষার্থীদের নিরাশ করা মোজেজ অধর্ম মনে করে। তাই মোজেজ খুশি হয়েই উত্তর করল, 'আরে সে তো ভালো কথা আছে। লেকেন তো শালারা কাল আসবি। হামি তো এখোন একটু বাহির যাব।'

নিজেদের দলের কাছে ফিরে যাবারও তাদের আর মুখ নেই। এই সব ব্যাপারে সেখানে ক্ষমা নেই। এজন্য সেখানে আছে শুধু চরম শাস্তি। তাই অনুনয় বিনয় করে করিম খালুসাহেবের পথ আগলে বলল, 'খালুছাব! সে একটা কথা আছে। হাপনি একটু নীচে আসেন। হাপনার সাথে সে একটা জরুরী বাত আছে।'

ব্যাপার যে বিশেষ গোলমেলে তা মোজেজের বুঝতে বাকি থাকে নি। করিমের কথায় মোজেজ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে করিমের দিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু করিমের মুখে ও চোখে শত্রুতার কোনও চিহ্ন সে দেখতে পেল না। করিমের মতো একজন সেয়ানা লোককে পত্রপাঠ বিদায়ও দেওয়া যায় না। গুণীর মর্যাদা গুণীকে দিতেই হবে। তারপর একটু ভেবে মাস্টারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আচ্ছা, হাপনি এখোন যেতে পারেন। হামি এখোন একটু নীচে যাব।'

করিমের কথায় মোজেজ নীচে আসল বটে, কিন্তু করিমের কথাটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। দল ছেড়ে চলে আসা আর দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তার কাছে এক জিনিস ছিল না। তাদের নিজস্ব অপরাধশাস্ত্র-বহির্ভূত এই সব অন্যায় কাজ বরদাস্ত করবার সে পাত্রই ছিল না। সে করিমের উপর এইবার ক্ষেপে উঠে বলে উঠল, 'ভাগ শালা, বেইমান। বেইমানি করিয়েছিস, আবার হামার কাছে আইছিস। ভাগ—'

এই সব কথা শুনে খালুসাহেব যে চটে যাবে তা করিমের জানা ছিল। তাই সে এবার পাপের উপর পাপ বাড়িয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিল। বেগতিক দেখে করিম মোজেজের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'আরে হামি চলিয়ে এসে একলা এ কাম উম করিয়েছি না। এ কাম ত হামি দল ছাড়িয়ে সে করিয়েছি।'

কথাটা সে মিথ্যে বলল বটে, কিন্তু তা অবিশ্বাস্য ছিল না। এ-রকম দলাদলি, ছাড়াছাড়ি প্রায়ই হয়ে থাকে। এ-জন্য যে দু-একটা খুন-খারাপী

না হয় তাও নয়, কিন্তু তবুও এ সব হামেশা এদের মধ্যে হয়ে থাকে। তারপর সেদিন মোজেজের মেজাজটাও ছিল ভালো। অত বড় একটা হাত সাফাইয়ের একটা পুরস্কারও তো আছে।

নীচের সেই ঘরটার কোণের দিকে আলমারির পাশে একটা বড়ো কাঠের বাক্স ছিল। মোজেজ বাক্স খুলে তার লেডল বাড়ির স্যুটটা পরতে পরতে করিমকে বাহাদুরিই দিল। তারপর আপন মনে শিস দিতে দিতে তাকে আশ্বাস দিয়ে সে খুশমেজাজে বলে উঠল, 'আচ্ছা। তবে শালা চোল। টেকা সে তোর হামি এখনি তোড়িয়ে দিবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখ মোজেজ একজন পাকা সাহেবের মতই হয়ে উঠল। মাথায় তার ফেল্টক্যাপ, চোস্ত ইংরেজী স্যুট, মুখে পাইপ ও হাতে একগাছা হাতীর দাঁতের ছড়ি। মোজেজ ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে একটু হেলে দাঁড়িয়ে করিমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে আর একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর সে হেঁট হয়ে নিজেই নিজের আপাদ-মস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে খুশি মনে বলে উঠল, 'কিরে শালা। দেখিস কি?'

করিম মোজেজের এই রূপ পরিবর্তন অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করছিল। মোজেজ তাদের বিরোধী দলের সর্দার হলেও তার প্রতি করিমের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। ইতিপূর্বে মোজেজের কাজকর্মের হদিস লক্ষ্য করার তার কোনও সুযোগ হয় নি। মোজেজের পোশাক পরা শেষ হয়ে গেলে বিস্ফারিত নেত্রে করিম বলে উঠল, 'আপ ত সে বেশ সাহেব বেনে গেছে। একদম আংরেজ।'

মোজেজ চিরকালই কাজের লোক। বাজে কথা-বার্তায় সময় নষ্ট করার সে পাত্রই নয়। তাই মোজেজ করিমের এই সব আজেবাজে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'চোল চোল। হামাকে যে আজ আবার বোম্বাই যেতে হোবে।'

ত্বরিতপদে দুজনেই মোজেজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু গোল বাধাল কোমরের ঘুনসী-বাঁধা একটা নেংটা ছেলে। পাশের গলিতে সে খেলা করছিল। সে ছুটে এসে পিছন থেকে মোজেজকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'বাপজান! হামি যাবে। অ্যা-এ।'

'আরে আরে! এ ক্যা হ্যা। এ লছমনিয়া। কাঁহা তু? এ—'

মোজেজের হাঁক-ডাকে বাড়ির ভিতর থেকে একজন মোটা কালো হিন্দুস্থানী

স্ত্রীলোক ছুটে এল। মোজেজের সঙ্গে তার ঠিক কি সম্বন্ধ তা বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকটি মোজেজের নিজের স্ত্রী না হলেও, ছেলেটি তার নিজেরই ছিল। স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাপজান! ঐ বাপজান আছে। হামি তোর কুচ্ছু লই, বেইমান। আও ইধার।'

মোজেজ ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগল। মোজেজ একদিকে যেমন একজন চোর, অন্যদিকে সে একজন বাপও বটে। তাই তার নিজেরই রক্তমাংস দিয়ে গড়া এই ছেলেটির জন্য তার উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। তাকে আদর করতে করতে স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে সোহাগ করে মোজেজ বলে উঠল, 'এ শালা চোর হবে ত হামসে ভি বোড় চোর হবে, এ বহুত হুঁসিয়ার আছে। এ শালা বেদাগী চোর হবে। হে-হে-হে।'

লছমনিয়া মোজেজের বিয়ে-করা স্ত্রী না হলেও স্ত্রীরই মত। প্রায় ষোল বছর তারা একত্র আছে। ষোল বছর আগে দিল্লী থেকে মোজেজ তাকে ভাগিয়ে আনে। বাপ বেটা দুজনারই উপর তার দরদ ছিল সমান। সে তাড়াতাড়ি মোজেজের কোল থেকে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'নেহি, এ চোর নেহি হবে। যা তু আপনা কাম্‌মে যা।'

মধ্যবিত্ত পরিবারের বাপ-মার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তাদের ছেলে বড় হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। ঠিক তেমনি ভাবেই মোজেজের আশা ছিল যে, তার ছেলে আরও বড় চোর হবে। লছমনিয়া চোরের ঘরণী হলেও নিজে চোর নয়। তাই এ বিষয়ে সে তার আদমীর সঙ্গে কোনও দিনই একমত হতে পারে নি। তাই কোন রকমে ছেলে ও ছেলের মা'র কাছে বিদায় নিয়ে মোজেজ রাস্তায় নেমে পড়ল। ছেদি ও করিম চারদিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে তার অনুসরণ করতে লাগল।

এই সব চোর-গুণ্ডাদের মিত্রের চেয়ে শত্রুর সংখ্যাই বেশী। তাই পদে পদে তাদের বিপদ দেখা যায়। এই জন্য চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মারকাস স্কোয়ারের ধার দিয়ে, কলাবাগান বস্তির ভিতর দিয়ে সোজা পথে হ্যারিসন রোডের ট্রাম স্টপেজের কাছে এসে মোজেজ বলল, 'চোল সে ঝাব্বরমল বাবুর বাড়িতে। লে—ঐ ট্রাম আসে। উঠ—'

স্ব স্ব বেশভূষা অনুযায়ী তারা যানাদি ব্যবহার করে। তাই মোজেজ ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে আর ছেদি ও করিম সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ল। এতে

তাদের আত্মগোপনের সুবিধে আছে। এই জন্য এই নীতি তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাসের লেডিজ সিটের পিছনে একটা বেঞ্চের উপর একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক বসেছিল। মোজেজ সোজা গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। তারপর চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার ইংরাজীতে সে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্র-লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াটস্ দি টাইম প্লিজ।'

ভদ্রলোকটি পকেটে হাত দিয়ে বসেছিল। মোজেজের কথায় সে ঘড়িসুদ্ধ হাতটা তুলে ধরল। সুন্দর হাত সাফাই ছিল এই মোজেজের। সে অলক্ষিতে সাহেবের পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলে উঠল, 'ফোর থারটি! থ্যাঙ্ক ইউ!'

দেখতে দেখতে ট্রামখানা স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে এসে হাজির হল। মোজেজ এইবার ঘাড় চুলকাবার আছিলায় পিছন দিকে হাত নেড়ে কি একটা ইশারা করল। তারপর সে আর দেরি না করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেদি ও করিম তার ইশারা পেয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে মোজেজের গায়ে গা ঘেঁষে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এই সুযোগে করিমের হাতটা নিজের পকেটে ঠেকিয়ে দিয়ে মোজেজ বলে উঠল, 'দেখ, একটা কাম করিয়ে নিয়েছি।'

করিমও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোন দিনই পেছপাও ছিল না! সময় ও সুযোগের সদব্যবহার করতে সেও জানে। ইতিমধ্যে সেও একটা হাতসাফাইয়ের কাজ সেরে নিয়েছে। উত্তরে করিম মোজেজকে রুমালে বাঁধা একটা দশ টাকার নোট দেখিয়ে বলে উঠল, 'হামিও একটা কাম করিয়েছি। তবে সে বেশী নয়। একটা বাঙালী বাবুর পকেটে ছিল। সব শালা ভিখারী আছে। সে পকেটে কুছু রাখে না—যেত সোব্ ভিক্-মাঙনেওয়ালা! কেয়া বোলে, হায়, হায়!'

মোজেজ নিজে একজন গুণী লোক ছিল। তাই গুণের মর্যাদা সে বোঝে। করিমের কথায় মোজেজ খুশি হয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা বলবার আগেই ছেদি বিজ্ঞের মত বলে উঠল, 'লোকের আর সে পয়সাই লেই। স্বাধীন ব্যবসা ছাড়িয়ে দিতে সে দিল মাঙে না। নেহি ত হামিলোক এতদিন একটা নকরি-উকরি করিয়ে লিতাম।'

এইভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে গালগল্পে সময় নষ্ট করা মোজেজ মোটে

পছন্দ করছিল না। আজ সারাদিন ধরে তাকে অনেক কাজকর্ম সেরে নিতে হবে। নিতান্তই কাজের লোক সে। সময়ের দাম বোঝে। সে ধমক দিয়ে ছেদি ও করিমকে বলল, 'নকরি কিয়ারে! নকরি করবে সে ভদ্দরলোক। হামি লোক সব সেয়ানা আছে। হামিলোক নকরি করবে?'

মোজেজের মত ছেদি ও করিমও ছিল পাকা ব্যবসায়ী। শ্রমের মর্যাদা আর পাঁচজনের মত তারাও স্বীকার করে। তাদের মনের কথা ভাষায় তারা নিশ্চয়ই ব্যক্ত করে নি। তাই কৈফিয়ৎ স্বরূপ ছেদি ও করিম উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের কোন কথা আর বলতে না দিয়ে মোজেজ অগ্রসরমান একদল লোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খাঁটি হিন্দীতে বলে উঠল, 'বুড়বাক্ মাফিক হিঁয়া মৎ খাড়া রহ। আও, হামারা সাথ আও।'

এবার সকলে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে স্ট্র্যাণ্ড রোডে একটি বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর প্রকাণ্ড ওই বাড়িটি একটা চারতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ঝাব্বরমল মাড়োয়ারী। তিনতলায় চারটি মাত্র ঘর নিয়ে সপরিবারে তিনি থাকেন। দোতলার একটি ঘরে তাঁর গদি-অফিস। বাড়ির বাকি ঘর কয়টি নানানজাতীয় ভাড়াটিয়াতে ভর্তি। দোতলায় গদি-ঘরের সামনে বারান্দার উপর সঙ্গীনধারী পাহারা। আশেপাশে জমাদার ও দারোয়ানেরা তাদের সুদৃশ্য বিরাট বপুগুলি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

গদি-ঘরে খোদ ঝাব্বরমলবাবু পাশের ক্যাশঘরের টাকা ঝন ঝন আওয়াজ শুনতে শুনতে কাজকর্ম দেখছিলেন। পাশে চার-চারটে টেলিফোন পর পর সাজান রয়েছে। হঠাৎ একটার রিসিভার তুলে নিয়ে ঝাব্বরমলবাবু বলে উঠলেন, 'হ্যালো, লছমীবাবু? দেখিয়ে, আজ হামারা গদিমে ষাইট হাজার রূপেয়া মজুত হায়। আপ লে যানে শেক্‌তা। আউর রূপেয়া কাল ব্যাঙ্কসে মাঙায় দেগা। সমজে ভাই—'

কথা শেষ করে ঝাব্বরমলবাবু টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ম্যানেজার বিট্‌ঠলবাবুকে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মোজেজ করিম ও ছেদিকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, 'রাম রাম! ছেলাম বাবু সাব্।'

ঝাব্বরমলবাবুর সঙ্গে মোজেজের অনেক দিনের পরিচয়। বহুকাল থেকেই

সে মোজেজের এই মহাজনের কাজ করছিল। শুধু একা এই মোজেজকে এই বিষয়ে দোষ দিলে চলবে কেন? তার মতো আরও অনেকেই ঝাব্বরমলবাবুর খাতক ছিল। মোজেজকে দেখে বেশ খুশি হয়েই ঝাব্বরমলবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, সাহেব? বহুৎ দিন বাদে হাপনি আসছে, হাঁ, পান সিগারেট মাঙায়? কুছু হিঙ্গা করেন?'

বাজে গালগল্পে সময় নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় এইদিন মোজেজের হাতে ছিল না। ইতিমধ্যেই বোম্বাইগামী একটি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট তার কেনা হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ টিকিটের দামটাও তো তার পথে উঠানো চাই। এদিকে কথায় কথা ক্রমান্বয়েই বেড়ে যায়। তাই ঝাব্বরমলবাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে, মোজেজ পেণ্টুলেন সমেত, পা দুমড়ে ঝাব্বরমলবাবুর কাছ ঘেঁষে গদির উপর বসে পড়ল। তারপর সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কথা কইতে শুরু করে দিলে। ঝাব্বরমল বাবুও মোজেজের কথার উত্তর দিতে লাগলেন চুপে চুপে। কিছুক্ষণ এইভাবে কথাবার্তার পর, অদূরে দণ্ডায়মান ছেদি ও করিমের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে ঝাব্বরমলবাবু বললেন, 'উলোক কোন আছে? সব বিশ্বাসী ত? সে দেখবেন মুশকিল উশকিল—'

মোজেজের মতো একজন পুরানো সর্দারকে পাকা কারবারী ঝাব্বরমল-বাবুর অবিশ্বাস করার কোনও কারণ ছিল না। এরা বিশ্বাসী লোক না হলে এদের নিয়ে এঁর কাছে সে আনতই বা কেন? এইরূপ ভুলের মাশুল তাদের উভয়কে সমভাবেই দিতে হতে পারে। এই জন্য ঝাব্বরমলবাবুকে আশ্বস্ত করে মোজেজ হেসে উত্তর করল, 'সব সেয়ানা আছে সাব। হামিলোকের বাদ ত উন লোক মালিক হোবে। হামিলোক আর কেত দিন বাঁচবে বোলেন? ইন্‌লোককোভি একটু দেখবেন।'

ঝাব্বরমলবাবু আড়চোখে ছেদি ও করিমকে আর একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'লেকেন একহাজারমে হাম দেড়শ রূপেয়াকো যাস্তি নেহি দিবে।' উত্তরে মোজেজ শান্তভাবে বলল, 'ঠিক হ্যায়। নম্বরি নোটকা আস্তে যো দস্তির আছে উহিই দিবেন।'

করিম দ্বিরুক্তি না করে পকেট থেকে দু'খানি হাজার টাকার নম্বরি নোট বার করে মোজেজের হাতে দিল। ঝাব্বরমলবাবু মোজেজের হাত থেকে নোট দুখানি নিয়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নোট দুটি পরীক্ষা করে দেখলেন সেগুলি জাল কি না। তারপর পাশের ক্যাশবাক্স থেকে গুণে গুণে খুচরা ও নোটে

তিনশো টাকা মোজেজের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ফিন হাপনি আসবেন। যেনো ভুলিয়ে যাবেন না।'

কিন্তু এইখানেই এদের কাজকর্মের শেষ পূর্ণচ্ছেদ হতে পারে না। পারস্পরিক হিস্যার হিসাব-নিকাশ এইখানেই নিরাপদে সেরে নিতে পারলে ভালো হয়। এই বিষয়ের শেষ কথা মোজেজেরই আর্জিমাফিক হতে বাধ্য। মোজেজ সেই তিনশো টাকা থেকে নিজের পারিশ্রমিক স্বরূপ একশো টাকা কেটে নিয়ে বাকী দুশো টাকা করিমের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে উঠল, 'লে শালা। সে ঠিক আছে ত?' তারপর সে বেরিয়ে আসতে আসতে ঝাব্বরমলবাবুর কথার উত্তর করল, 'খোদা দিবে ত জরুর আসবে। হামি সে নেহি ভুলবে। আচ্ছা, রাম রাম।'

বেশীক্ষণ এই সব লোকদের গদি ঘরে ধরে রাখার জন্য যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। কে কখন এখানে এসে পড়ে তা কেই-বা বলতে পারে। যত শীঘ্র এদের এখান হতে বিদেয় করা যায় ততই মঙ্গল। তাই উত্তরে খুশী হয়ে ঝাব্বরমল মাড়োয়ারী বলল, 'আচ্ছা ভাই, সেলাম।'

সেদিন তিনজনেরই কিছু কিছু লাভ হয়েছিল। তিনজনেই বেশ খুশিমনে ঝাব্বরমলবাবুর বাড়ি থেকে বার হয়ে এল। তারপর শিস দিতে দিতে কিছু পথ অতিক্রম করে ফুটপাতের ধার ধরে একটা ট্রাম স্টপেজের কাছে এসে তারা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সেদিন কি একটা কারণে ট্রামগুলো দূরের রাস্তায় আটকা পড়েছিল। অনেকক্ষণ সময় চলে গেল, ট্রাম আর আসে না। সময় আর তাদের কাটে না। হাতও তাদের নিশপিশ করছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেলে যে একজন বাঙালী ছোকরা ফিনফিনে পাতলা একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে পথ চলছে। ছোকরাটির বাঁ দিককার পকেটে রুমালে কি কতগুলো কাগজ বাঁধা। হাত নাড়তে নাড়তে অস্ফুটস্বরে কি একটা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ছোকরাটি নিজের চালেই চলেছে। এদিক ওদিক কোন দিকেই তার দৃষ্টি নেই। এত বড় বুড়বাক কাউকে ছেদি পূর্বে কখনও দেখে নি। তাকে দেখে ছেদির যতটা লোভ হল তার চেয়ে ঢের বেশী হল তার রাগ। এরকম একটা হ্যালা-খ্যাপা লোক কলকাতার বুকের উপর তাদের সামনে ঘুরে বেড়াবে, আর তারা তা সহ্য করবে? এরকম নীতিবিগর্হিত

কাজ তারা কখনই বরদাস্ত করতে পারে না। ছেদি চট করে ছোকরাটির পকেট থেকে রুমালটা টেনে বার করে নিল।

ছেদি ছোকরাটিকে যতটা অসাবধান মনে করেছিল, ততটা অসাবধান সে ছিল না। ছেদি ঠিকে ভুলই করেছিল। আসলে ছোকরাটি ছিল এই শহরেরই এক বনেদী পরিবারের ছেলে। চোর-গুণ্ডা অধ্যুষিত একটা বস্তির পাশে আশৈশব সে মানুষ হয়েছে। এদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সে ভাল করেই অবহিত ছিল। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই ছেদির হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর চোর।'

ছেদি এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে জোরে একটা ঝটকা মেরে ছেলেটির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর ফুটপাথের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

চোর নিরীহ হলে তাকে ধরে পেটাবার লোকের অভাব কলকাতা শহরে কোনও দিনই হয় নি। ইতিমধ্যে অনেক লোকই সেখানে জড়ো হয়ে পড়েছিল। ছোকরাটির সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছেদির পিছনে পিছনে তাড়া করে ছুটে চলল। চোরকে বিনা দ্বিধায় ঠেঙাবার জন্য এদের হাত যেন নিশপিশ করে উঠছে। একবার এই চোরকে নির্বিবাদে ধরতে পারলে হাতের সুখটা ভোগ করা যেতে পারত। তাই পথচারীদের সকলের মুখে সেই একই কথা, 'চোর চোর।'

করিম ও মোজেজ এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু নিমেষেই তারা তাদের কর্তব্য স্থির করে নিল। তারাও জনতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছেদির পিছন পিছন ছুটতে লাগল ও সকলের সমবেত চিৎকার ডুবিয়ে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'চোর চোর।'

করিমের ছোটার ক্ষমতা ছিল খুব বেশী। প্রতিদিন সকালে মার্কাস স্কোয়ারে সে ছোটা অভ্যাস করত। হঠাৎ সে দেখল জনতার কয়েকজন লোক ছেদিকে ধরে ফেলেছে। সে প্রাণপণে ছুটে এসে সেই লোকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের কাছ থেকে ছেদিকে ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে বেদম প্রহার করতে করতে সামনের দিকে ঠেলে দিল। তারপর পিছনের লোক কয়জনের ওপর সে এলিয়ে পড়ল এমন ভাব দেখিয়ে, যেন টাল সামলাতে না পেরে পিছলে তাদের ওপর পড়ে গেছে।

ছেদি এই সুযোগে পরিত্রাহি ভাবে আবার ছুটতে লাগল।

কিন্তু এইদিন তার কপাল ছিল বিশেষ মন্দ। কয়েকজন সাইক্লিস্ট সেই পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিল। তারা তাদের সাইকেল জোরে চালিয়ে এসে ছেদিকে আবার ধরে ফেলল। তাদের মধ্যে জন দুই আবার কাছাকাছি কোন বিট থেকে পুলিস ডেকে আনবার জন্য ছুটল। ছেদি এই দুর্ভেদ্য বেড়াজালের মধ্যে আটকে পড়ে বুঝল যে, এবার আর তার নিস্তার নেই।

ছেদি ও করিমের চেয়ে এই সেখ মোজেজের বুদ্ধি ছিল বহু গুণে সরেস। নিমেষের মধ্যে সে আপন কর্তব্য ঠিক করে নিতে পেরেছিল। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে ছুটে এল সেখ মোজেজ। সে এসেই বাম হাত দিয়ে ছেদির গলাটা টিপে ধরে ডান হাত দিয়ে তার গালে কয়েকটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'শালে, হাম্‌রা পকেট তু মারেগা। লে আও হামরা রূপেয়া। ব্লাডি সোয়াইন—'

ছেদির পক্ষে এই নূতন পরিস্থিতি বুঝে নিতে কিছুমাত্র দেরি হয় নি। মোজেজের মতো সেও ছিল একজন পাকা সেয়ানা। ছেদি তাড়াতাড়ি রুমাল সমেত টাকার বাণ্ডিলটা মোজেজের হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে সাব, আপকো রূপেয়া। হামকো পুলিসমে মাৎ দিজিয়ে। হাম এইসেন কাম আউর নেহি করেগা।'

মোজেজ সময়োচিত অভিনয়-চাতুর্যে ছিল একজন সুদক্ষ ব্যক্তি। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে তার খ্যাতি আছে। মোজেজ এইবার রুক্ষ মেজাজে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপরাও। আলবৎ টুমকো পুলিসমে দেগা।' এর পর সে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলে, 'এ ট্যাক্সি, ট্যাক্সি!'

দৈবক্রমে একখানি ট্যাক্সি সেই পথ দিয়ে সে সময় যাচ্ছিল। ট্যাক্সিখানি দাঁড়িয়ে পড়তেই মোজেজ ছেদির চুলের মুঠি ধরে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে হেঁকে উঠল, 'চাপরাশী, বয়।'

করিম বুঝে নিয়েছিল যে, কার উদ্দেশ্যে এতো হাঁকা-হাঁকি। তাই সে ছুটে এসে মোজেজকে বলল, 'সাব, জী। হুকুম ফরমাইয়ে।'

মোজেজ এইবার খুশী হয়ে তার এই চাপরাশীকে বলল, 'ঠিকসে ইসকো পাকড়ো।' এর পর সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে হুকুম করল, 'এই ড্রাইভার, জলদি থানামে চল।'

ভিড়েব মধ্য থেকে অনেক লোকই সাহেব দেখে ও তার ইংরাজী বুলি শুনে সরে দাঁড়িয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে যারা বেশী সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ, তাদের কেউ কেউ এদের সঙ্গে থানায় যাবার জন্য ট্যাক্সির পাদানিতে উঠে দাঁড়াল। মোজেজ তাড়াতাড়ি তাদের ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, 'ভিড় মাট করো, উটাব যাও।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন নাছোড়বান্দা লোক মোজেজকে সাবধান কবে দিয়ে বলল, 'সাহেব, পাকা চোর, এখুনি পালাবে।'

তাদের এই অহেতুক উপদেশের উত্তরে মোজেজ সাহেবী মেজাজে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'ইউ ব্লাডি ফুল। গেট আউট।'

মোজেজের নির্দেশে ড্রাইভার নিমেষেব মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। আসল ফবিয়াদী যখন পুলিস সঙ্গে করে হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হল, তখন তাদেব সেই ট্যাক্সি অনেক দূর চলে গিয়েছে।

৬

থানার ঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারটা বেজে গেছে। টেবিলের ওপর কতকগুলো কাগজপত্র জড়ো কবে প্রণব থানার অফিসঘরে বসে ভাবছিল— এ ক'দিন প্রাণপণ চেষ্টা কবেও চুবির কোন কিনারা সে করে উঠতে পারে নি। দৈর্ঘে ও প্রস্থে কয়েক মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড এই কলকাতা শহর। চোরেরা চুরি করে যে কোথায় আত্মগোপন করে আছে, তার সন্ধান তাকে কে এনে দেবে। ভাবতে ভাবতে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্ববে বলে উঠল, 'তার আর কি হবে! সব চুরির কি আর কিনারা হয়? আর এর কিনারা না হলেই ভাল।'

প্রণব থানার আর আর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যতই সে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে, ততই প্রেগতির সেই কচি সুন্দর মুখখানি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তার মিষ্টি সুর প্রণবের কানে এসে ঝংকার দেয়, হৃদয়তন্ত্রীর সব ক'টা তার একসঙ্গে বেজে ওঠে। কী মুশকিল, কাজকর্ম করা যে অসম্ভব হয়ে উঠল।

শেষে ছুটি নিতে হবে নাকি! প্রণব ক্রমশঃ নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

প্রণব সত্য-সত্যই মুশকিলে পড়েছিল। দুশ্চিন্তার যেন তার আর শেষ নেই। ভাবতে যেন সে আর পারে না।

তার এই মুশকিলের অবসান করল জমাদার রামসিংএর বাজখাঁই গলা। দুয়ারের কাছ থেকে রামসিং জমাদার হেঁকে উঠে বলল, 'হুজুর, রামদীন ইনফরমার আয়া। উ রোজকো পকেটমার কেসকো একঠো খবর ভি হ্যায়।'

প্রণবের সুখস্বপ্ন এইবার ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। প্রথমটায় জমাদারের ওপর সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে সে উত্তর করল, 'কোন্? রামদীন! উ শলে ত খুদ্ চোর হ্যায়।'

রামদীন নিজেও যে একজন পুরাতন পাপী তাতে প্রণবের মত রামসিংও নিঃসন্দেহ ছিল। তবুও সে ইচ্ছা করেই রামদীনকে থানায় ডেকে এনেছে। এর কারণ পুরানো চোরকে খুঁজে বার করতে হলে এই সব পুরানো চোরদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাই জমাদার রামসিং উত্তরে প্রণববাবুকে বলল, 'চোর ত উ হ্যায়ই। চোর নেহি হোগা ত চোর কা পাত্তা কেইসেন উসকো মিলেগা।'

জমাদার রামসিংএর কথাটা ছিল অতীব সত্য। প্রণব রামদীনকে ভিতরে নিয়ে আসতে বলল। প্রায় আট নয় বারের দাগী চোর এই রামদীন। সম্প্রতি বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছে। চুরি করে জেলে যেতে সে আর রাজী নয়। সে চোর হওয়ায় চাকরিও তাকে কেউ দেয় না। তাই মাঝে মাঝে পুলিসে খবর দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ সে কিছু কিছু পায়। জাতব্যবসা যে সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল, তাও না। তবে খুব বুঝে সুঝে সাবধানে পুলিসের নজর এড়িয়ে আজকাল সে ঐ সব কাজে হাত দেয়।

এই সব পুরানো পাপীদের দেওয়া খবর বুঝে সুঝে হিসাব করে তবে তা গ্রহণ করা উচিত। একেবারে পুরাপুরি এদের বিশ্বাস করা চলে না। রামদীন হুকুম মত ভিতরে এলে তাকে উদ্দেশ করে প্রণব বলে উঠল, 'ঝুটা খবর হাম্ নেহি মাঙতা হ্যায়। খবর নেহি সাচ্চা হোগা ত তুমকোই হাম্ জেল ভেজ্বা দেগা—এ বাত হাম তুমকো পয়লাসে বোল দেতা।'

'নেহি হুজুর! একদম সাচ্চা বাত আছে।' রামদীন হাত জোড় করে খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করল, 'ঝুটা বাত হাম কভি নেহি বলবে।'

এই শ্রেণীর ইনফরমারদের কাছ থেকে প্রণব খবর নিত বটে, কিন্তু এদের সে একেবারেই বিশ্বাস করত না। বিশেষভাবে যাচাই না করে এদের কথায় কোন কাজ করা কখনই সে উচিত মনে করে নি। এমন কি আমল দিতও সে এদের খুব কম। তবে এদের সাহায্য একবারে প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। রামদীনের আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে প্রণব তাকে আদেশ করল, 'কেয়া বোলেগা বোল। গপ্ হাম নেহি মাঙতা। যো জানতা ওই বোল।'

রামদীন এইবার একটু প্রণবের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর, এ কাম ত সেখ মুন্সিকো দলকো আদমি লোক করিয়েছে। লেকেন—'

রামদীনের এই কথায় প্রণব ভ্রূ কুঁচকে উত্তর করল, 'সেখ মুন্সি? হাঁ হাঁ, বহুত রোজ পয়লা এহি থানামে একদফে পাকড় গিয়া থা। লেকেন, কেইসেন তোমরা জানা হুয়া, ওই কিয়া?'

প্রত্যুত্তরে রামদীন প্রণববাবুর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত বলল, 'কসরৎসে হুজুর। সে শিরমে কুছু ফেলিয়ে দিয়ে পাছু পানি দোলায় কে উন্ লোক কাম করিয়ে লেয়। এ বাত ত বাবুসাব শহরমে সবকই জানে। চুরিকে কসরৎ শুনবে ত হামি লোক বলিয়ে দেবে কোন কোন দল কোন কাম করিয়েছে। হামি ভি উনলোককো মাফিক এক সেয়ানা আছে হুজুর।'

'আরে উ ত সমজে নিছি', উত্তরে প্রণব বলল, 'লেকেন উন লোক আভি আছে কোথা? তু ত বহুত গপ করিস। উন লোককো আঁফিস আছে, ডেরা আছে? আরে সে কোথা আছে, বোল।'

প্রণব এই কোতোয়ালির একজন নূতন অফিসার। চোর-ডাকাত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল তার খুবই কম। এই বিষযে প্রণবকে প্রথমে ওয়াকিবহাল করা দরকার। পিক-পকেটের রীতিনীতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান না থাকারই কথা। তাই একটু ভেবে চিন্তে রামদীন ইনফরমার উত্তর করল, 'এই মুশকিল করেন হুজুর। উন লোককো আফিস কি এক জেয়গায় থাকে? এক জেয়গায় থাকবে ত হাপুনি লোক পাকড়ে লেবেন। আজ এক জেয়গায় আফিস ওদের আছে, না, কাল দেখবেন দোসরা জেয়গায় উ লোক ঘর লিইয়েছে। দাঁড়ান, হামি সে সব খবর উবর লিয়ে লি। পুরাসে পাত্তাভি লাগাই। উসকো বাদ হাম—'

এদের এই মুভিং আফিসের খবর প্রণব আগেই পেয়েছিল, কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা সে জেনে উঠতে পারে নি। মুন্সির দলের যে এটা কাজ তা সে তাদের সেই মোডাস অপারেণ্ডাই থেকেই টের পেয়েছে। কিন্তু তাদের গোপন ডেরা খুঁজে বার করা অতো সহজ কাজ ছিল না।

অন্য সূত্রে পাওয়া খবরের সঙ্গে রামদীনের দেওয়া এই খবরের মিল দেখে প্রণব স্বভাবতঃই খুশী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রামদীন ইনফরমারকে সে কথা জানালে সে আস্কারা পেয়ে যাবে। তা ছাড়া তাকে আরও একটু বাজিয়ে দেখাও দরকার। তাই প্রণব একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'বহুত যাস্তি বাত তুম বোলতা। আড্ডাকো পাত্তা তুম পয়লা নিকাল।'

রামদীন সেদিম জ্ঞানতঃ একটা সাচ্চা খবর নিয়ে এসেছে। তাই প্রণববাবুর এই কথায় ভড়কে না গিয়ে সে দৃঢ়স্বরে উত্তর করল, 'জরুর নিকালবে, হুজুর। হাম্মি কি মামুলি ইনফরমার আছে। উন্‌লোক কো পাত্তা গরবু কাহারসে মিলবে হুজুর। উন্‌কো সাথ মুন্সি সর্দারকো বহুত দুশমনি ভি আছে। এই গরবুয়াসে উসকে পাত্তা মিলবে। থোড়াসে টাঙ করিয়ে, উ সব বাত্ বোল দেগা।'

মুন্সি সর্দার কিছুদিন আগে এই গরবু কাহারের দলের একজন বাঙালী ছোকরাকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য গরবুকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। এই নিয়ে দু-একটা মারপিটও তাদের মধ্যে হয়। তবে মারটা গরবুর লোকেরাই বেশী খেয়েছিল। যারা মারে তারা ভুলে যায়। কিন্তু যারা মার খায়, তারা তা ভোলে না। গরবুর লোকেরা মুন্সির দলের উপর ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিশোধ নেবার জন্য একটা সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু সেই অনুপাতে মুন্সির দলের লোকেরা একেবারেই সাবধানে থাকত না। কথাটি রামদীনের জানা ছিল।

রামদীন ইন্‌ফরমার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিট কনস্টেবল পূর্ব-কথিত ছোকরা ফরিয়াদী ও আরও জন আট-নয় লোক সঙ্গে করে থানায় ঢুকে সেদিনকার সেই পকেটমারির খবরটা জানাতে শুরু করল। সব কথা শুনে প্রণব অবাক্ হয়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ! বল্লেন কি মশাই? চোরেরা ত জব্বর কসরৎ দেখিয়েছে।'

থানার মধ্যে ফরিয়াদী একা আসে নি! তার সঙ্গে আরও অনেক লোক ভিড়ে থানায় ঢুকে পড়েছে। এদের একজন একটা ভিজিটিং কার্ড প্রণবের

হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন আবার এই কার্ডটা। ওতে কি লেখা রয়েছে। লোকটা আমার হাতে ওটা গুঁজে দিয়ে বলে উঠল, টানামে যাও, হাম টানামে যাতা হায়। কার্ডমে হামারা নাম লিখা হায়। আমরা ত মনে করেছিলাম তাকে একজন পাকা সাহেব।'

প্রণব কার্ডখানি হাতে করে সেটা দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'কি? মিঃ এম্. এন. গ্রেগরী, প্রোপ্রাইটার, গ্রেগরী অ্যাণ্ড কোং। বাপরে—এই দরওয়াজা, বড়বাবুকে সেলাম দেও।'

থানার বড়বাবু ইতিমধ্যে তাঁর ওপরের কোয়ার্টার থেকে নেমে এসে পাশের ঘরেই বসেছিলেন। এইজন্য আর ওপরে সিপাই পাঠিয়ে খবর দেবার প্রয়োজন হয় নি। পাশের ঘরের গণ্ডগোল তাঁর কানে গিয়েছিল। প্রণবের হাঁক-ডাক তাঁর কানে যাবা মাত্র তিনি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার প্রণববাবু? কি কেস? গোলমেলে ব্যাপার নাকি?'

উত্তরে প্রণব বলল, 'হ্যাঁ স্যার, একটু গোলমেলে আছে। আপনাকে সেই জন্যই ডেকেছি।'

'এ নিশ্চয়ই, এম্ সোরেপের কাজ। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চোর।' থানা ইন্‌চার্জ নরেনবাবু সব কথা শুনে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তবে সে ত ইউরোপীয়ান হাউসেই চুরি কবে বেশী। এখন পকেটমারদের সঙ্গেও যোগ দিয়েছে নাকি?'

'আশ্চর্য কি! আজকাল ত এ-রকম দু'একটা কেস দেখা যাচ্ছে,' নরেনবাবুর এই অভিমতের উত্তরে প্রণব বলল, 'এক ধরনের চুরি ছেড়ে, অন্য আর ধরনের চুরি তারা শুরু করেছে। কলকাতার এই পাঁচমেশালি শহরে বিচিত্র কিছুই নয়। তবে অভ্যাসেব অভাবে ধরা পড়ে এরা সহজে, এই যা।'

নরেনবাবু বললেন, 'আপনার হাতে অনেকগুলো কেস রয়েছে, না? এটা তাহলে আমিই নিই।'

তাঁর এই কথার উত্তরে প্রণব বললে, 'হ্যাঁ স্যার, তা ছাড়া আমায় সেই পুরানো দশ হাজার টাকার পকেটমার কেসটার ফরিয়াদীর বাগবাজারের বাড়িতে আজ একবার যেতেই হবে।'

একদিন এই কেসটা রিপোর্ট করতে করতে প্রণব থানার অফিসার ইনচার্জ নরেনবাবুর কাছে ঠাট্টার ছলে মনের কথাটা খুলে বলে ফেলেছিল। কিন্তু প্রণব সাবধানে বিষয়টা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেও প্রণবের মনের

অবস্থাটা নরেনবাবুর বুঝতে বাকি থাকে নি। নরেনবাবুর মুখে ও চোখে একটা সন্দেহ বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠল। তিনি চোখ কুঁচকে প্রণবের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠলেন, 'চোরগুলো তাহলে ফরিয়াদীর বাড়িতে বসে রয়েছে, কেমন? আচ্ছা, তার আর কি করা যাবে? যান, ওদের বাড়িতে তাহলে একটু ঘুরে আসুন। কিন্তু আমার আজকের এই কেসটা তদন্ত করতে করতে যদি আপনার কেসের সেই দশ হাজার টাকা রিকভারী হয়ে যায়? অ্যাঁ? তাহলেই ত আপনার সেই তিনি সেই ডেপুটি ছেলের হাতে ফসকে চলে যাবেন। তখন—? বলেন ত এ কেসটাও আপনাকে দিয়ে দিই, শেষে আবার আপনি এ জন্য আমাকে দোষ দেবেন।'

সত্যই প্রণব এতদিন প্রগতির জন্য যত ভেবেছে, তাদের টাকা ক'টার কথা তার তুলনায় একেবারেই ভাবে নি। এ বিষয়ে গাফিলতি তার যথেষ্টই ছিল। প্রথমটায় সে এ জন্য বেশ একটু লজ্জিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটু সামলে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে উত্তর করল, 'কি আপনি বলেন স্যার! আপনি দেখছি আমার সব কথাই সত্যি বলে মেনে নেন। মাঝে মাঝে ফরিয়াদীর সঙ্গে দেখা না করলে তারা মনে করবে, আমরা চুরির ব্যাপারে কিছুই চেষ্টা করছি না, তা যতই আমরা খেটে মরি না কেন। এ দেশের লোকেরা কি ধরনের তা ত জানেন। কাজের চেয়ে কাজের ভড়ংটাই তারা বেশী বোঝে।'

প্রণবের এই কৈফিয়তের উত্তরে নরেনবাবু আরও কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেলতেন, কিন্তু প্রণববাবুর ভাগ্যগুণে তা আর তাঁর বলা হয়ে উঠল না। হঠাৎ এই সময় একজন ভদ্রলোক একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে থানায় ঢুকে তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, 'মশাই, আমি একজন উকিল মানুষ। আমার পকেট থেকে চুরি! ঠিক ধরে ফেলেছি।'

নরেনবাবু পাশের একখানি চেয়ার ভদ্রলোকটির দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বসুন। কে চুরি করল—এই ছেলেটা?'

ভদ্রলোকটি ছিলেন এই শহরেরই আদালতের একজন পুরাতন উকিল। কি করে থানায় এজাহার দিতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। এই সম্বন্ধে তিনি বেশ একটু ভেবে-চিন্তেই থানায় এসেছেন। নরেনবাবুর প্রশ্নে তিনি তোতা-পাখির মত আরম্ভ করলেন, 'আরে মশাই, ক্যানিং স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম।

এই ছেলেটা আমার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। আমি মনে করলাম সত্যি পড়ে গেল বুঝি। হাত ধরে একে উঠাতে যাচ্ছিলাম। যেমন নীচু হয়েছি, অমনি এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম, আর ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে।'

ছেলেটা গোড়া থেকেই কাঁদছিল। ভদ্রলোকটির কথা শুনে ছেলেটা আরও জোরে কেঁদে উঠল—অ্যাঃ—অ্যাঃ—অ্যাঃ।

ছেলেটাকে একটা ধমক দিয়ে নরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থাকিস? কার সঙ্গে এসেছিলি?'

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে উত্তর করল, 'অ্যাঃ—অ্যাঃ। গরবুয়া ত আমাকে নিয়ে এল'। বলল—'

নরেনবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'গরবু কাহার! কত দিন তার সঙ্গে ঘুরছিস? জিভ দেখি। নিশ্চয়ই কোকেন খাস?'

'অ্যাঁ! কোকেন?' অবাক্ হয়ে প্রণব বলে উঠল, 'কোকেন খায় এইটুকু ছেলে?'

ছোট ছোট ছেলেদের দলে সংগ্রহ কববার জন্যে দলপতিরা তাদের কোকেন খাইয়ে থাকে। এই কোকেন একদিক থেকে এদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অপস্পৃহা জাগ্রত করে তোলে। অপর দিকে দুর্দমনীয় একটা নেশা তাদের দলপতিদের ডেরায় বারে বারে আনাগোনা করতেও বাধ্য করে। অপরাধ তত্ত্বের এই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধে নরেনবাবু সম্যক অবগত ছিলেন। তাই নরেনবাবু নির্বিকার চিত্তে উত্তর করলেন, 'পাখিকে পোষ মানাবার জন্য যেমন আমরা তাদের আফিম খাওয়াই, বদমায়েসরা এই সব ছেলে সংগ্রহ করে, ঐ একই উদ্দেশ্যে তাদের কোকেন খাওয়ায়। ফলে তাদের এমন একটা ক্রিমিন্যাল মেণ্টালিটি এসে যায় যে, চুরি ছাড়তে বা দল ছাড়তে তাদের মন আদপেই চায় না।'

প্রণব বিস্ফারিত নেত্রে নরেনবাবুকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'বলেন কি! সর্বনাশ! তাহলে এইভাবে এরা দলের জন্য ছেলে সংগ্রহ করে?'

ছেলেটা কিন্তু তখনও সেই একই ভাবে এক নাগাড়ে কাঁদছিল, 'অ্যাঁঃ অ্যাঃ অ্যাঃ ও ঠাকুমা।'

ছেলেটিকে আবার একটা ধমক দিয়ে নরেনবাবু সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রুমালে কত টাকা আপনার ছিল?'

ভদ্রলোকটি এইবার বেশ একটু গর্বের সঙ্গে উত্তর করলেন, 'তিন আনা এক পয়সা। ওর বেশী পকেটে আমি রাখিই না।'

নরেনবাবু এইবার হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনার সবসুদ্ধ দু' টাকা তিন আনা এক পয়সা লোকসান?'

এই অবান্তর প্রশ্নে অবাক্ হয়ে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম, সে কি রকম?'

উত্তরে নরেনবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, 'এই,—এই সঙ্গে দু' টাকা ফিও নষ্ট হল। নিজে ফরিয়াদী না হলে একে ডিফেন্স করে আপনিই এটা পেতেন।'

এতক্ষণে উকিলবাবু নরেনবাবুর এই পরিহাসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে নরেনবাবুর এই সব কথার উত্তরে উকিলবাবু একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখিয়ে বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ, কি যে বলেন? দু'টাকা ফি নিই, তা আমরা কিন্তু স্বীকার করি না।'

এদের এই ঠাট্টা-তামাসাব ব্যাপারে প্রণব একটুও আগ্রহশীল ছিল না। এতক্ষণে আপন নিশ্চেষ্টতার জন্য তার আত্মগ্লানি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রণব এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল। এইবার সে সোৎসাহে বলে উঠল, 'চুরি বড্ড বেড়ে উঠছে স্যার। এ আমাদের বন্ধ করতেই হবে। সব ক'টা কেসই আমি ডিটেক্ট করব; আমার সে বড় পকেটমারিটাও। সব ক'টাই তাহলে আমি নিজে নিচ্ছি, দেখি, কি হয়।'

নরেনবাবু প্রণবের ওই উত্তেজিত ভাব দেখে বেশ খুশীই হয়ে উঠলেন। প্রণবের ক্ষমতার উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। এ ভাবে চুরি বেড়ে যাওয়ায় তিনিও একটু বেশ চিন্তিত ছিলেন। প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে তিনি হেসে ফেললেন, তারপর একটু মুচকি হেসে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ, বলেন কি? তোমার সেই দশ হাজারী কেসটাও? তা ভয় নেই, দশ হাজার টাকা আর নেই। তা থেকে অন্ততঃ ছ' হাজার টাকা এতদিনে ভাগাভাগী করে আপনার বন্ধুরা খরচ করে ফেলেছে। বাকী হাজার দু' চার টাকা আর তার সঙ্গে চোরগুলোকে খুঁজে বার করতে পারেন ত দেখুন। ডেপুটি সাহেবের বাবা অবশ্য চার হাজারে নিশ্চয়ই রাজী হবে না, তা আপনার প্রগতি যতই সুন্দরী হোন না কেন!'

নিছক পরিহাস ছাড়া নরেনবাবুর কথার মধ্যে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত ছিল না। একজন না একজনকে উপলক্ষ্য করে এরূপ পরিহাস প্রায়ই চলে, কিন্তু তাঁর কথা কয়টা প্রণবকে ভাবিয়ে তুলল। এই ব্যর্থতার জন্য

তাহলে দায়ী কে? গোড়া থেকে সচেষ্ট থাকলে হয়ত দশ হাজার পুরোপুরিই রিকভার্ড হত! প্রণবের মনে এতক্ষণে একটা ধিক্কার আসছিল।

প্রণবের মনের মধ্যে যে এই ব্যাপারে একটা গভীর আলোড়ন চলছে তা লোকচরিত্রে বর্ষীয়ান অফিসার নরেনবাবুর বুঝতে বাকি থাকে নি। তাই নরেনবাবু প্রণবের এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে পরিহাসের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে খোকা, ভাব কি?'

প্রণববাবু তখন ভাবছিল, 'প্রেম-ট্রেম কর্তব্যের কাছে? ও কিছু নয়, হোক গে প্রগতি ডেপুটি সাহেবের।' প্রণব এইবার একটু ভেবে অবাক্ হলো ও দৃঢ়চিত্তে উত্তর করল, 'ভাবছি কি ভাবে তদন্ত আরম্ভ করা যায়। সব ক'টা কেসই আমি ডিটেক্ট করছি, দেখুন না।'

'দেখ, আমার মনে হয়', উত্তরে নরেনবাবু এইবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এদের এই কেসটা থেকেই তোমার সেই দশ হাজারী কেসটা ডিটেক্ট হবে। রামদীন ইনফরমারও এই গরবু কাহারের কথা বলেছে। ওই ছেলেটাও ত তাই বললে। দেখ—'

এই পকেটমারের মামলা কয়টির তদন্তের সাফল্য সম্বন্ধে প্রণব বেশ একটু আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে কখন যে প্রগতি রানীর চিন্তা তার মন হতে নিঃশেষে বিদুরিত হয়ে গিয়েছে তা সে জানতেও পারে নি। তাই প্রণব এর পর আর একটুও দেরি না করে চিৎকার করে হেঁকে বলে উঠল, 'এই পাহারা! হাওয়ালদারকো দো সিপাই আউর এক জমাদার জলদি তৈয়ারি করনে বোল।'

প্রগতিদের বাড়ি যাওয়া প্রণবের আর সেদিন হয়ে উঠল না। সে তাদের কথা ভুলে গিয়ে চুরি কয়টির তদন্তে মনোনিবেশ করল। কর্তব্যের একটা গভীর প্রেরণা সাময়িকভাবে তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রগতির সেই কচি মুখখানি, তার সজল চোখের চাহনিটুকু পর্যন্ত তার মন থেকে বেত্রাহত কুকুরের মতই দূরে চলে গেল। প্রণবের মুখে ফুটে উঠল নিশ্চিন্তরূপ একটা হাসি। তার সবটুকু প্রতিভা ও কর্মপ্রেরণা তার চোখ ও মুখ দিয়ে ফুটে জলজল করে উঠল।

৭

সিঙ্গিবাগানের একটা খোলা মাঠের পিছনে পুরানো ভাঙা একটা বস্তি। মাঠের উপর কতকগুলো করে ছাগল, হাঁস ও ভেড়া চরছে। এখানে ওখানে গরুও কয়েকটা দেখা যায়। কোথাও বা আবার পাতলা থান ইটের তলায় ভিজে কাপড় বিছিয়ে দিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। আশে-পাশে আচারের হাঁড়ি, শুখোতে-দেওয়া আমসত্ত্ব, আমসি ও বড়ি।

কলকাতার এই নামজাদা বস্তিটা হিন্দুদের, তবে মুসলমানেরাও যে কয়েকজন সেখানে নেই, তা নয়।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই পোড়ো মাঠের পিছনে বাঁশ ও বাখারি ঘেরা দর্মার বেড়া। বেড়ার পর থেকে আরম্ভ হয়েছে বিস্তীর্ণ বস্তিগ্রাম। বাঙালী, দেশোয়ালী, পুরবিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী কত জাতের লোক যে সেখানে বাস করে, তার ইয়ত্তা নাই।

একজন বাঙালী বৃদ্ধা গোবরের তাল হাতে এই ছাঁচি বেড়ার উপর ঘুঁটে দিচ্ছিল। প্রায় তেরো বছর আগে তার ছেলে বৌ দুজনাই একটি দু' বছরের শিশু রেখে অকালে ইহলোক ত্যাগ করে। তাদের সেই ছেলেটিরই নাম হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ। সেই ছেলেটিকে তার দু' বছর বয়েস থেকে ঘুঁটে বিক্রি করে অতি কষ্টে বুড়ী মানুষ করে আসছিল।

লক্ষ্মীরই সমবয়সী একটি ছেলে ঘুড়ি ও লাটাই হাতে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুঁটে দিতে দিতে বুড়ী তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরে ও মদনা, আমার লক্ষ্মী কোথায় গেছে রে?'

এদেরই মত বস্তিবাসী হলেও ছেলেটি ছিল একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী। সে আনমনাভাবে চলে যেতে যেতে উত্তর করল, 'আমি কি জানি! সকালে গবুকা আর বিচকে এসে তো তাকে ডেকে নিয়ে গেল। বারে!'

বুড়ী উত্তরে আর তাকে কিছু বলল না। তাদের পাড়ার এই গরবুয়া ও বিচকেকে মনেপ্রাণে বাধ্য হয়ে বুড়ী সমীহ করেই চলে; তাই শুধু আপন মনে সে গজরাতে লাগল, 'নচ্ছার ছেলে! গরবুভায়া ওঁকে চাকরি করে দিয়েছে। চাকরি করতে যান! একটা পয়সাও ত বুড়ী ঠাকুমা পায় না। আজ বিড়ি খেতে শিখেছে, কাল খাবে ভাং, পরশু করবে চুরি! পোড়া কপাল আমার!'

বুড়ী আপন মনে বক বক করছিল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, এমন সময় সে শুনতে পেল পিছন দিক থেকে গরবু কাহার এসে তাকে বলছে, 'বুড়ী, এই লে তোর লাতির রোজগার!'

বুড়ী ফিরে দেখল পাড়ার গরবু কাহার। হাতে তার রুমালে বাঁধা কয়েক আনা। বুড়ী তাকে দেখে জ্বলে উঠে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা, চাকরি তো লক্ষ্মী বোজ রোজ করতে যায়, পয়সা তো একটাও পায় না।'

বুড়ীর এই অভিযোগের মধ্যে একটুও মিথ্যে ছিল না। অন্য লোক হলে এজন্য লজ্জিত হয়ে উঠত। কিন্তু এদের মধ্যে লজ্জা সরমের বালাই কোন কালেই নেই। তবুও কি ভেবে এই দিন গরবু রুমাল সুদ্ধ সেই চুরির তিন আনা এক পয়সা বুড়ীর হাতে দিয়ে বলে উঠল, 'লে এ ওর একদিনের মাইনে।'

মাত্র তিন আনা এক পয়সার কাজ করে গরবুব মনটা সেদিন ভাল ছিল না। কাজ হাসিল করে সে আগেই সরে পড়েছিল, তাই লক্ষ্মী যে ধরা পড়েছে তা সে জানতে পারে নি। তার ধারণা ছিল সেও এখনি ফিরবে। তাই ফেরবার পথে বুড়ীর কথা শুনতে পেয়ে সে সেদিনকার পয়সা ক'টা বুড়ীকেই দিয়ে দিল।

এই সামান্য অর্থ অন্য লোকের কাছে সামান্য হলেও বুড়ীর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য ছিল যথেষ্ট। তা ছাড়া এটা ছিল তার আদরের নাতির প্রথম রোজগারের পয়সা। তাই পয়সা ক'টা পেয়ে বুড়ী খুশীই হয়েছিল। আনন্দে আটখানা হয়ে আশীর্বাদ করতে করতে বুড়ী বলে উঠল, 'আমার লক্ষ্মীকে তুমি দেখ বাবা! ওর যেন সুমতি হয়। তা বাবা, সে এখনও ফিরছে না কেন?'

গরবু উত্তরে বুড়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ ফিরবে, কিন্তু তা' আর তার বলা হল না। সে দেখতে পেল ইনসপেক্টার প্রণব, জমাদার রামসিং

ও কয়েকজন পাহারাওয়ালা সঙ্গে করে সেই দিকে আসছে। পুলিস দেখে ব্যস্ত হয়ে সে সামনের তারের বেড়ার উপর লাফিয়ে পড়ল।

তারের বেড়ার ঘা খেয়ে সে ছিটকে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই সে উঠে পরে আবার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট দিল।

প্রণব দূর থেকেই গরবুকে লক্ষ্য করেছিল কিন্তু তাকে সে চিনত না। তাকে গরবুয়া বলে সন্দেহ করবার কোন কারণও ছিল না। এখন তাকে এইভাবে পালাতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো চোর!'

বেড়া-ঘেরা মাঠটার গেট সামনের দিকেই ছিল। দৌড়তে দৌড়তে মাঠের মধ্যে ঢুকে প্রণব ও রামসিং গরবুয়াকে তাড়া করল।

এদিকে গরবুয়াও প্রাণপণে ছুটে চলেছে। প্রণব তাকে ধরা শক্ত বুঝে তার হাতের মোটা ছোট লাঠিটা তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। লাঠিটা পায়ে লাগবা মাত্র গরবু পড়ে গেল। একে তারের বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে কাঁটায় তার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছল, তারপর এই লাঠির ঘা। কিন্তু তবুও সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই সময় একজন সিপাই ছুটে এসে তার লম্বা লাঠিটা গরবুয়ার পায়ে সজোরে বসিয়ে দিল। গরবুয়া আর উঠতে পারল না।

সকলে মিলে এর পর গরবুয়াকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে প্রণববাবুর কাছে নিয়ে এল। গরবুয়াকে সেই অবস্থায় দেখে লক্ষ্মীর ঠাকুমা বুড়ী কেঁদে উঠে পুলিসকে উদ্দেশ করে বলল, 'অ বাবা, ও যে আমার ধর্মছেলে। ও যে খুব ভাল বাবা। ওকে—'

গরবুয়া কাহার এতক্ষণে ভালোরূপেই বুঝেছিল যে এই যাত্রা তার আর নিস্তার নেই। খুবই সম্ভবতঃ মামলা তার বিরুদ্ধে ভালো রূপেই প্রমাণিত হবে। তবুও আত্মরক্ষার জন্য শেষবেশ চেষ্টা করলে কোনও ক্ষতি নেই। গরবু একবার প্রণবের দলের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল, তারপর সে বুড়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল, 'না কাঁদিস ধাইমা, হামি কি চোর ডাকু আছে? হামি কারবার করিয়ে খাই। সবকই এ বাত জানে।'

গরবুয়া সর্দারের প্রকৃত স্বরূপ প্রণব ইতিমধ্যে বুঝে নিতে পেরেছিল। এখানে তাকে খুব বেশী না চটিয়ে কায়দামাফিক তার কাছ হতে কথা বার করতে হবে! এর বিবৃতির উপর বাকি মামলা কয়টির তদন্তের সাফল্য

নির্ভর করছে। তাই প্রণব তাকে একটা নামমাত্র ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'বলিস কিরে, অ্যাঁ! তুই সাধু আছিস! মুন্সি তো খবর দিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে এল, তোকে দেখিয়ে দিলে। আমরা কি তোকে চিনি?'

গরবুয়াকে এইভাবে তাতিয়ে দিয়ে কথা বার করবার জন্য প্রণব মিথ্যেই বলেছিল, কিন্তু গরবুয়া তা বুঝেও বোঝে নি। রাগে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে এইবার রাগে দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কি, শালা সাধু আছে! উ রোজকো দশ হাজারী কামতো উ লোকই করিয়েছিল।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। উত্তেজনা ও ক্রোধের একত্র সন্নিবেশ ঘটলে মানুষের মনের অবস্থা হালবিহীন নৌকার মত হয়ে ওঠে। প্রণব গরবুয়ার এই বিশেষ মানসিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে একটুও দেরি করল না। সে একটু কৃত্রিম ক্রোধের অভিনয় করে গরবুয়াকে বলল, 'এই ঝুটা মাৎ বলিস। সে ত বললে তুই করিয়েছিস।'

কথা বার করবার প্রণবের এই চাতুরী গরবুয়া একেবারেই বুঝতে পারলে না। চুরি-চামারী করার বাইরে তাদের বুদ্ধি একটু কমই থাকে। সে এবার ক্ষেপে উঠে বলে উঠল, 'কেয়া, হামি লোক করিয়েছি! উন লোককো সব কুছ বাত ঝুটা হুজুর! কালীমায়িকা কশম, উ কাম উন লোকই করিয়েছে। হামি সব কইকো এইবার ধরিয়ে দিবে। উন্ লোককো আড্ডাকো পাত্তাভি বাতলে দিবে।'

'ক্যা বলতা, সাচ?' প্রণব এইবার খুশী হয়ে গরবুয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'উ লোককো আড্ডা কোথা রে?'

'পয়লা ত উ লোককা অফিস থা হুজুর, বালক দত্ত লেন—ছ' নম্বর বস্তিমে' গরবুয়া ক্রোধভরে উত্তর করল, 'আভি দীঘিপারকে নজ্‌দিকে এক মাঠকোঠামে ঘর নিয়েছে। এ দু'রোজকা পয়েলাকো বাত আছে। হামাকে হুজুর ছাড়িয়ে দিন, হামি সে ঠিক খবর লিয়ে আসবে।'

গরবুয়াকে ছেড়ে দিলে সহজেই খবর পাওয়া যেত। কিন্তু তার নিজের বিরুদ্ধেই একটা চুরি কেস রয়েছে। একবার আসামীকে ধরে আর তাকে ছাড়া যায় না। প্রণব আর তাকে ছাড়তে পারল না। সে সোজাসুজি এইবার তাকে প্রশ্ন করল, 'আজকে ক্যানিং স্ট্রীটে কে পকেট মেরেছে? অ্যাঁ? কেসটা কে করেছে, বল ঠিক করে?'

কথাটা শুনে গরবুয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। এত শীঘ্র পুলিস তার এই আজকের কাজের পাত্তা পাবে, তা সে কল্পনাও করে নি। তার সন্দেহ হল হয়তো লক্ষ্মী ধরা পড়েছে। সে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু পুলিসের সঙ্গে বা আর কোথাও লক্ষ্মীকে দেখতে না পেয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই সে উত্তর করল, 'হু' দফে দাগী আছি হুজুব, লেকেন হামি এ সব কাম একদম ছাড়িয়েছি। যখনি সুবিধে মিলে, হামি পুলিসের খবর-উবর ভেজিয়ে দিই। হামি এ সব কাম বিলকুল করি না।'

গরবুয়ার এই কৈফিয়ৎ শুনার পর প্রণব গম্ভীরভাবে উত্তর করল, 'আচ্ছা।' তারপর জমাদারের দিকে চেয়ে তাকে আদেশ করল, 'আসামী লক্ষ্মীকো গলিকো অন্দরসে বোলাকে লে আও।'

পাশের একটা গলির মধ্যে একজন সিপাইয়েব জিম্মায় লক্ষ্মীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রণবেব আদেশে একজন সিপাই গিয়ে গলিব ভিতব থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা লক্ষ্মীকে ডেকে সেখানে নিয়ে এল।

লক্ষ্মীকে দেখে গরবুয়ার বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। কাঁচা ছেলে ওই লক্ষ্মী সব ফাঁস করে দিয়ে পুলিসকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে এসেছে। এরপর সে আর কোন কথা বলতে পারল না।

লক্ষ্মীকে দেখে বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। সঙ্গেব সিপাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে লাঠি দিয়ে তাকে আটকে হেঁকে উঠল, 'এই, খবরদার! এ আসামী হ্যায়।'

লক্ষ্মীর উপর নাড়ীর টান ছিল এই বুড়ীর। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সে চিৎকার করে কেঁদে গরবুয়াকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা গরবুয়া! এই চাকরি করাতে কি বাছাকে তুমি রোজ রোজ নিয়ে যেতে? অ্যাঁ?'

'উ কুথা যেত তো হামি কি জানি। হামি কি মালিক আছে যে উর চাকরি করিয়ে দিবে', উত্তরে গরবুয়া বলে উঠল, 'চাকরি হামি কুথা পাবে? বদমাসদের সঙ্গে মিশিয়ে উ চোর হইয়েছে, তা হামি কি করবে?'

'ও বাবা, মিছে কথা বলুনি।' গরবুয়ার এই কথায় বুড়ী উত্তর করল, 'এপনো চন্দ-সুয্যি উঠচে। এই তো ওর চাকরির পয়সা ক'টা দিয়ে গেলি আজ!'

কথা ক'টা বলে রুমাল সমেত পয়সা ক'টা বুড়ী তার মুখের সামনে তুলে

ধরল। এই চোরাই রুমালের কোণে ফরিয়াদীর নাম সংক্ষেপে লেখা ছিল—M. L. D.

বুড়ীর এই সব কথা শুনে আসল ব্যাপারটি বুঝে নিতে প্রণবের একটুকুও বাকী থাকে নি। প্রণব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এসে টপ করে বুড়ীব হাত থেকে রুমালসমেত পয়সা ক'টা তুলে নিয়ে বলে উঠল, 'এই যে বামাল! বাঃ, কি রে, চুরি করিস নি?'

গরবুয়ার শেষ আশা ছিল ফরিয়াদি তাকে চিনতে পারবে না। এত দ্রুত সে সরে পড়েছিল যে ফরিয়াদীর তাকে ভাল করে দেখবার সময় হয়ে ওঠে নি। অন্ততঃ আদালত থেকে রেহাই পাবে বলে সে আশা করেছিল। নাম লেখা রুমালটা প্রণবের হস্তগত হওয়ায় তার সে আশা নির্মূল হল। সে এইবার প্রণবের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে উত্তর করল, 'সব ত বুঝিয়ে লেছেন! এখোন হুজুর যা করেন।'

প্রণব এইবার ভাবল, যাক্, একটা কেশ ডিটেক্ট হল, এ থেকে বাকিগুলো ডিটেক্ট হতে পারে। সে এইবার সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকলকে হুকুম করল, 'চল, আসামী লোককে থানামে লে চল।'

পুলিসের দল আসামীদ্বয়কে নিয়ে থানার পথ ধরছিল, এমন সময় বুড়ী চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ওগো, আমার দাদুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ গো-ও?'

বুড়ীর এই প্রশ্নেব অন্য কেহ উত্তর দিল না। তার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে শুধু গরবুয়া। সে ভেংচে উঠে বলল, 'আভি থানামে, পাছু জেলমে। চলিয়ে সিপাইজী।'

তার এই কথা শুনে বুড়ী চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। সিপাইরা তাকে ঠেকাবার আগেই সে পিছন দিক থেকে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ওরে আমার নাড়ীছেঁড়া ধন, আমার অন্ধের মণি গো? ও বাবা—'

বুড়ী লক্ষ্মীকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে দিল। কিন্তু তার দুর্বল বাহু তাকে কতক্ষণ ধরে রাখবে? জমাদার রাম সিং জোর করে তাকে সরিয়ে দিল। বুড়ী মাটির উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল, 'ওরে আমার বাবা রে, ওরে। ওরে আমার বাবা রে-এ...'

পুলিসের দল চলে গেল তাদের আসামী নিয়ে, তাদের যত কিছু কর্তব্যের বোঝা মাথায় করে, আর বুড়ী সেইখানেই শুয়ে আছড়াতে লাগল। কেউ আর তার দিকে ফিরেও তাকাল না। কেউ তার ব্যথা বুঝল না।

৮

পুলিসবাহিনী ধীর পদবিক্ষেপে পথ চলছিল। পুলিস ও চোর, এদের সম্বন্ধ যে চিরন্তন, শাশ্বত যুগের। ধরা পড়ার পর চোরদের সঙ্গে পুলিসের এই সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ়, আরও অভেদ্য হয়ে ওঠে। কারণ, এই সম্বন্ধের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ধরা ও ধরা পড়া, এইটেই তাদের কাছে চিরন্তন সত্য। পরস্পরের এই মধুর সম্বন্ধটা তারা সহজ ভাবেই নিয়ে থাকে, কারণ একের জন্যেই অপরের সৃষ্টি।

চোর ও পুলিস,—কারও প্রতি কারও বিরাগ নেই। নিঃশব্দে তারা পথ চলছিল। হঠাৎ পাশের বাড়ির পাঁচিলের উপর থেকে কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর, চোর। এই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস?'

নূতন পথের পথিক এই লক্ষ্মীনারায়ণ, তারপর বয়সও ছিল তার কম। তারই বয়সী ছেলেদের কাছ থেকে এই অভিনন্দন পেয়ে তার চোখের জল থেমে গেল। লজ্জা ও অনুশোচনা তাকে অভিভূত করে দিলে। সে চোখ নীচু করে কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকল। একদল ছেলে তাই দেখে বলে উঠল, 'বাবা, আবার লজ্জা হচ্ছে! শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কিনা!'

ছেলেদের কথা শুনে লক্ষ্মীনারায়ণ মরমে মরে যেতে লাগল বটে, কিন্তু গরবুয়ার সে সব বালাই একেবারেই ছিল না। সে হেসে তাদের এই সব অভিবাদনের উত্তর করল, 'হ্যাঁ খোঁকা, হামি লোক শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, তুমি লোক হামাদের সঙ্গে আসবে?'

এতক্ষণ বরযাত্রীর মতন ছেলেদের বড় একটা দল. তাদের অনুসরণ করে পথ চলছিল। তারা গরবুয়ার কথায় সমস্বরে জিভ নাড়তে নাড়তে তাদের বিদ্রূপ করে চিৎকার করতে শুরু করে দিলে, 'উলু উলু উলু উলু—বর, বর!'

তাদের মধ্য থেকে একজন আবার বলে উঠল, 'নোয়ার গয়না পরেছে আবার!'

ছেলেদের হাঁক-ডাক আর চিৎকারে আশে-পাশের অনেকগুলি বাড়ির জানালা খুলে গেল।

প্রণব উপর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, একটি বাড়ির দোতালায় জানালার ধারে ঠিক প্রগতির মতই সুন্দরী একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে একটু পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও দিদি, শীগগির আয়, চোর!'

প্রণব আর একবার দোতালার সেই জানলার দিকে চেয়ে দেখতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেই বাড়িরই নীচের তলার দরজার উপর ছোট-বড় কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ছুটে এসে ভিড় জমালেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। চোরদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'এই ত সব কেমন ধরা পড়েছে। সব বাড়ির চোরই ধরা পড়ে। আমাদের বাড়ির চোরগুলোই শুধু ধরা পড়ল না। গয়নাগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল গা।'

নীচের তলার সেই মেয়েদের চোখের সামনে প্রণবের দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে আর উপরের তলার দিকে উঠতে পারল না। সেই বর্ষীয়সী মহিলাটির পাশে একটি কমবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আসামীদের নিয়ে পথ চলতে চলতে প্রণব শুনতে পেল, মেয়েটি বলছে, 'ও দিদিমা, আমার শ্বশুরবাড়িতেও এরাই বোধহয় চুরি করেছিল। বাবা, কি রকম চেহারা দেখ!'

কথাটা গরবুয়ারও কানে গিয়েছিল। উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ, বহুৎ খুপসুরৎ। এবার ফিরিয়ে আসবে ত তুহু লোককো বাড়ি চুরি করবে।'

গরবুয়ার কথায় মেয়েটির দিদিমা শিউরে উঠে বলে উঠল, 'ও বাবা, আমার সোনার ইস্টিকবচটা উপরের ঘরে ফেলে এলাম যে, চুরি করে নেবে না ত?'

তাদের এই সব কথা শুনে গব্‌বুয়া উত্তর করল, 'ফেলিয়ে রাখলেই লিবে। তুমি লোক ফেলিয়ে রাখবে, আর হামি লোক লিবে না?'

গর্‌বুয়ার উত্তরগুলো প্রণবের কানে বড় বিসদৃশ ঠেকছিল। সে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'চোপরাও, সরম লাগ্‌তা নেই!'

ধমক খেয়ে গরবুয়া চুপ করে গেল, আর কোন কথা বলতে তার সাহস হ'ল না। ছেলেদের দল তখনও তাদের পিছু ছাড়ে নি। তারা এইবার সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, 'চোর, এই চোর!'

ছেলেদের এই ক্রমবর্ধমান ভিড় প্রণবের বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল।

বিরক্ত হয়ে প্রণব জমাদার রামসিংকে হুকুম করল, 'ভাগাও ইন লোক্‌কো!'

জমাদার রামসিং কৃত্রিম আস্ফালনে লাঠি উঁচিয়ে ছেলেদের তাড়া করল। তাড়া খেয়ে দেখতে দেখতে ছেলেদের দল অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ আর সেখানে দাঁড়াল না, উঠি-পড়ি করে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল।

চোর ও পুলিসকে সমভাবে রেহাই দিয়ে ছেলেদের দল বহুক্ষণ হল সরে পড়েছে। এদিকে ততক্ষণে প্রণবও তার দল নিয়ে চিৎপুর ট্রাম লাইনের ধারে এসে পৌঁছেছে। সে এইবার একটু হাঁপ ছেড়ে জমাদারকে বলতে যাচ্ছিল, 'চল থানামে', কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করে গেল। হঠাৎ ট্রাম লাইনটা চোখে পড়ায় প্রণবের ভাবান্তর উপস্থিত হল। এই তো সেই ট্রাম লাইন, প্রগতির বাড়ির গা ঘেঁষে সোজা বাগবাজারের দিকে চলে গিয়েছে। প্রণব ভাবছিল যে সে একবার প্রগতিদের বাড়িটা হয়ে আসবে কি না!

প্রণবের সেই উসখুস ভাব জমাদার রামসিংয়ের চোখ এড়ায় নি। বাবুর মনের কথাটা সে সহজেই বুঝে নিয়েছিল। সে বলে উঠল, 'আউর কাঁহা যায়গা, হুজুর?'

প্রণব একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর করল, 'হাঁ, উধার হামরা একঠো কাম হায়। তুম্‌ আসামী লোক্‌কো ঠিকসে থানামে লে যানে শেকেগা?'

জমাদার রামসিং শুরু থেকেই প্রণবের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা উস্‌খুস ভাব লক্ষ্য করছিল। প্রণবের মন যে কোথায় চলে গিয়েছে তা তার বুঝতে বাকি থাকে নি। খুব সাবধানে গোঁফের নীচে একটা হাসির ক্ষীণ রেখা টেনে জমাদার রামসিং উত্তর করল, 'হুজুর কাহে নেহি শেকেগা। আপ যাইয়ে না। বাগবাজারকো টেরামভি আগিয়া!'

শেষের কথাটা জমাদার রামসিং অসাবধানতাবশতঃই বলে ফেলেছিল, তাই সে লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। এই রকম ধরনের একটা কথা জমাদারের কাছ থেকে শুনবে প্রণব তা মোটেই আশা করে নি। প্রণব বিরক্তির সঙ্গে জমাদার রামসিংয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর আর কোনও কথা না বলে বাগবাজারের চলন্ত ট্রামটায় এক লাফে উঠে পড়ল।

৯

ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। চারদিককার গুমোট ভাব তখনও কাটে নি। আকাশের গায় কালো কালো মেঘগুলো তখনও গুলতান করছে। নর্দমায় নর্দমায় জলের তোড় তখনও কমে নি। রাস্তায় লোক চলাচল তখনও বিরল। সার্সিবদ্ধ ঘরের মধ্যে তার ছোট পুরানো অর্গানটা টেনে নিয়ে প্রগতি গান গাইছিল—

ঘরেতে আজ একা
বাইরে বাদল বাজায় মাদল
নেইক যে তার দেখা,
ঘরেতে আজ একা।

প্রগতি আপন মনে গেয়ে চলেছে। হঠাৎ বাইরে থেকে কড়া নাড়ার একটা শব্দ এল। অর্গানের সব কয়টা রীড একসঙ্গে চেপে ধরে প্রগতি কান খাড়া করে শুনল, বাইরে থেকে প্রণব ডাকছে, 'ধীরাজবাবু বাড়ি আছেন?'

এর আগেও প্রণব তদন্তের ব্যাপারে তাদের বাড়ি বার দুই-তিন এসেছিল। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল, যাওয়া-আসার ফলে যেমন হয়। তবে তত প্রগাঢ় নয়, এমনি ভাসা ভাসা। প্রণবের গলার আওয়াজ শুনে প্রগতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। তারপর প্রণবের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'বাঃ, আসুন। ওমা, প্রণববাবু এসেছেন।'

বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়াটারপ্রুফটা বাম হাতে রেখে প্রণব অনেকক্ষণ ধরেই প্রগতির গান শুনছিল। সংগীত মিষ্টি হলে অন্তরাল হতে বোধহয় তা আরো ভালো শুনায়। এইজন্য প্রণবের বাইরে আরও একটু অপেক্ষা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গান শুনতে শুনতে সে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে ঝোঁকের মাথায় সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কড়া নেড়ে ফেলেছে।

প্রণবের মুগ্ধ ভাব তখনও কাটে নি। প্রগতির কথা শেষ হবার আগেই প্রণব বলে উঠল, 'থাক, মাকে আর—এই—। আপনি গাইছিলেন বুঝি? বেশ গান ত?'

প্রগতির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। সে অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করল, 'ছাই গাই! এই ঘরে এসে বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি। ও মা—'

প্রগতির মা প্রতিদিনের মত এই দিনও পাশের ঘরে বসে কি একটা সেলাই করছিলেন। প্রগতির হাঁকডাকে তিনি বেরিয়ে এলেন। তারপর সামনে প্রণবকে দেখে বলে উঠলেন, 'এই যে বাবা, এসো! দিন চোদ্দ হয়ে গেল, সেই এসেছিলে, তারপর আর কোনও খবরই পেলাম না। হ্যাঁ বাবা, চুরির কোন কিনারা হল? তা, কিছু করতে পারলে?'

মা'র কথায় বাধা দিয়ে প্রগতি বলল, 'মা যেন কি! উনি এলেন, একটু বসতে-টসতে বল, না খালি চুরি আর চুরি।'

প্রগতির মা মেয়ের এই কথায় নিজেকে সামলে নিয়ে অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, বসো তুমি। টাকার শোকে পাগলেব মত হয়ে গেছি কিনা! কিছু মনে করো না বাবা।'

প্রণবের ভাবের ঝোঁক তখনও কাটেনি। সে ঝোঁকের মাথায় ঢিপ করে প্রগতির মাকে একটা প্রণাম করে বসল। এর আগে প্রণব কারুর কাছে কখনও মাথা নোয়ায় নি। কোন রকমে মাথাটা উঠিয়ে নিয়ে সে উত্তর করল, 'চেষ্টা তো করছি মা, তারপর আপনাদের কপাল আর আমার হাতযশ। দেখুন, কি হয়।'

ঢিপ করে পায়ের নীচে কেউ মাথা ঠুকলে বর্ষীয়ান নারী মাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাৎসল্য ভাব উথলে উঠে। এটা হচ্ছে এদেশীয় সনাতনী সভ্যতার একটা অবশ্যম্ভাবী রীতি। ভারতীয় নারীদের এই দুর্বলতার সুযোগ মন্দ লোকের ন্যায় ভালো লোকেরাও নিয়ে থাকে। এইরূপ একটা কিছু ভেবে চিন্তে প্রণব এই কাজটা না করলেও তার ফলটা একই রূপই হল। প্রগতির মা খুশী হয়ে দুই পা পিছিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'থাক থাক হয়েছে, উঠে পড় বাবা। এত ভাল মানুষ বাপ আমার, কি করে পুলিসে কাজ করে কে জানে! তা বাবা, তুমি ত চেষ্টা করছই, তারপর আমার আর ওই পোড়াকপালীর কপাল। যতই ও নেকাপড়া শিখুক না কেন, টাকা না পেলে ত আর তারা—, হায় রে।'

প্রগতির মা প্রগতির বিয়ের কথাই বলছিলেন, কিন্তু এর বেশী আর তাঁর বলা হল না। প্রগতি মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'বাঃ, উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন বুঝি? তুমি বেশ ত মা।'

প্রগতির মা ছিলেন কিছুটা সেকেলে ধরনের মানুষ। তাই এতোখানি ভেবে দেখবার প্রয়োজন মনে করেন নি। প্রগতির এই কথায় অপ্রতিভ ভাবে তিনি উত্তর করলেন, 'ওমা, তাই ত, দাঁড়িয়েই ত রয়েছে বাছা। ও পেগু, তুই ওকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, আমি একটু চা তৈরি করে নিয়ে আসি। যা মা, যা—'

কথা কয়টা বলে প্রগতির মা পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

প্রগতির মা পাশের ঘরে চলে যাওয়ায়, প্রণব বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রগতির মধ্যে কোন বিব্রত ভাব দেখা গেল না। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, সহজ সরল তার ভঙ্গি। নিষ্পাপ ছিল তার মন। প্রগতি হাসি হাসি মুখ করে অনুরোধের সুরে প্রণববাবুকে বলল, 'আসুন, ওই ঘরে বসবেন আসুন।'

পাশের সেই ছোট ঘরটায় একটা গোল টেবিল ও তার দু' পাশে দুখানা চেয়ার প্রগতির হাতে-বোনা একখানা চিত্রিত সুন্দর কার্পেটের উপর পাতা ছিল। প্রণব যন্ত্রচালিতের মত ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর টেবিলের একধারের একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে অদূরে ন্যস্ত ছোট অর্গানটার দিকে চেয়ে সলজ্জভাবে বসে পড়ল।

প্রগতি কিন্তু তখনও মেঝের উপর দাঁড়িয়েছিল। অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে প্রণব তার দিকে একবার চেয়ে দেখে অনুযোগ করে বলল, 'কৈ, আপনিও বসুন।'

প্রগতি তার মাথাটা নীচু করে কিছুক্ষণ কি একটা ভেবে নিল। তারপর সে একবার দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে ও একবার বাড়ির সদর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে টেবিলের অপর দিককার চেয়ারখানি টেনে নিয়ে তার উপর বসে পড়তে পড়তে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, বসি।'

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে সামনা-সামনি বসে রইল, কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারল না। প্রণব যতবার কথা বলবার জন্য প্রগতির দিকে চায়, ততবারই একখানি জলজলে মুখ তার চোখ দুটো যেন ঝলসে দেয়। সে কথা বলতে পারে না, মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রগতি তাই দেখে মুচকে মুচকে হাসে, কিন্তু কথা বলে না।

এমনি নীরবতার মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। শেষে প্রগতিই কথা কইল প্রথম। শাড়ির খুঁটটা আঙুলের উপর জড়াতে জড়াতে প্রগতি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনার কতদিন চাকরি হল?'

প্রণব সাহস করে প্রগতির দিকে আর একবার চেয়ে দেখল। সেই জলজ্বলে গোলগাল মুখ, সবটা যেন একসঙ্গে চোখে পড়ে না। সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ঘাড় হেঁট করে উত্তর করল, 'বেশী দিন নয়, মাত্র দু'বছর।'

প্রণব ইতিমধ্যে প্রগতির নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটি প্রগতির মনে এইদিন প্রথম ধরা পড়ল। তার মনে হল, এমন সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্যবান মিষ্টভাষী সুপুরুষ সে অনেকদিন দেখে নি। দেওয়ালে টাঙান একখানি ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রগতি প্রণবকে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের বড় কষ্ট, নয়? রাত জাগতে হয়। সময়ে নাওয়া-খাওয়াও বোধহয় হয়ে ওঠে না।'

নাওয়া-খাওয়া ঘুম তো দূরের কথা, সময় ও সুযোগই বা তাদের কোথায়? এমন কি কোনও বাড়িতে তদন্তে গেলেও গৃহস্থেরা তাড়াতাড়ি তাদের বিদেয় করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এতো কথা সে প্রগতিকে বলেই বা কি করে? তাই একটু চুপ করে থেকে উত্তরে প্রণব প্রগতিকে বলল, 'সময়ে খাওয়া-দাওয়া ত নয়ই, অনেক সময় একেবারেই তা হয়ে ওঠে না। স্থানের চেয়ে অস্থানে, সময়ের চেয়ে অসময়েই আমাদের ডাক পড়ে বেশী। একটু বেশী খাটতেও হয়। তবে সব সময় তাতে লাভ হয় কৈ! আপনাদের এই কেসটা নিয়ে ত দিনরাত খাটছি, কিন্তু এখনও ত কিছু করতে পারলাম না। আপনার মা বলছেন বটে, কিন্তু···'

প্রণবের হাবভাব ও কথাবার্তা যে প্রগতির মনে এতো দিনে একটা দাগ কাটে নি তা নয়। তবে তা নিতান্ত সাময়িক হলেও হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রগতির মন প্রণবের উপর সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। তার গলার স্বরটা এইবার একটু নরম হয়ে এল। সে খানিকটা চুপ করে থেকে উত্তর করল, 'মা'র কথা ছেড়ে দিন। আপনি ত আর ভগবান নন, মানুষের সাধ্যের বাইরেও আপনি যেতে পারেন না। আমাদের মত মানুষ ছাড়া আপনি ত আর কিছু নন। তারপর যখন চুরি হয়, তখন আপনি সেখানে ছিলেনও না, আর চোরেরা আপনাকে বলে-কয়েও চুরি করে নি।'

প্রগতির এই অভিমতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য ছিল। কিন্তু এমন লোকও শহরে আছে যারা মনে করে যে, চোরেরা পুলিসকে বলে-কয়েই চুরি করে। এর মধ্যে সামান্য সত্য থাকলে এরা এদের অপহৃত অর্থ এতোদিনে নিশ্চয় ফিরে পেত। যাক, ভাগ্য ভালো যে প্রগতি এই সব গুজবের কথা বিশ্বাস করে না। তাই উত্তরে প্রণব খুশী হয়ে প্রগতিকে বলল, 'সব ত বুঝি, কিন্তু আপনাদের টাকা কয়টা ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমার মনে যে আর শান্তি নাই। আমি আপনার বাবাকে যে কথা দিয়েছি।'

সেদিন থানাতে ধীরাজবাবু ও প্রণবের মধ্যে কথার আদান প্রদান যা হয়েছিল, তার সবটাই বাড়ি এসে তিনি গল্প করেছিলেন। প্রণবের সেই উদার অভিমতটাও তিনি তাদের বলতে ভোলেন নি। অপর সকলের মত প্রগতিও তা শুনেছিল, এজন্য তার কৌতূহলও ছিল যথেষ্ট। প্রণবের কথায় প্রগতি শিউরে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর করল, 'দেখুন, এ একটা একোনমিক্ ব্যালেন্স, ডিস্ট্রিবিউশন অব মনি। সিভিক্স-এর এ একটা কমন কোশ্চেন। মনি ডিস্ট্রিবিউশনের যত রকম এজেন্সি আছে, চুরি হচ্ছে তার একটা। এজন্য দুঃখ করবার কি আছে! তা ছাড়া টাকা পাওয়া না-পাওয়া, সে ত আমাদের অদৃষ্ট। কিন্তু—'

প্রগতি আর কিছু না বলে হঠাৎ চুপ করে গেল। প্রগতিকে হঠাৎ চুপ করতে দেখে প্রণব বলে উঠল, 'কিন্তু কি? বললেন না যে, চুপ করে গেলেন?'

প্রগতি একটু সলজ্জ ভাবে প্রণবের এই প্রশ্নের উত্তব করল, 'বাবা মা কিন্তু বলেন যে, অতগুলো টাকা আমরা হারিয়েছি বটে, কিন্তু বিনিময়ে আপনার মত একজন বন্ধু আমরা পেয়েছি ত! তার মূল্য কি কম? এক হিসাবে আমরা আমাদের খুব ভাগ্যবান বলেই মনে করি।'

এমন ভাবে প্রগতি প্রণবের সঙ্গে যে কথা কইবে তা তার কল্পনার বাইরে ছিল। কোনও বাড়িতে তদন্তে গেলে ঘরে ডেকে কেউ তাদের বসতে তো বলেই নি, এমন কি লেখালেখি করার সুবিধার জন্যে তারা তাদেরকে বাইরের ঘরে বসিয়ে টেবিল চেয়ার ব্যবহার করতেও দেয় নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেওয়ালের উপর কাগজ রেখে তাদের লেখালেখির কাজটা সেরে নিতে হয়েছে। তদন্ত করতে এসে প্রগতির মত একজন মেয়ের সঙ্গে এতোক্ষণ ধরে গল্প করায় বিষয় ছিল প্রণবের কাছে একটি অচিন্তনীয় ঘটনা। তাই

উত্তরে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রণব প্রগতিকে বললে, 'আমিও সেজন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করি। দেখুন, আমরা যদি কারুর পা জড়িয়ে ধরি সে মনে করে যে আমাদের, নিশ্চয় তার জুতা জোড়াটা সরাবার মতলব আছে। কিন্তু আমরা লোকের মনে যদি ব্যথা দি, তা বাধ্য হয়েই দি, আর তা দিই আমরা তাদেরই মঙ্গলের জন্যে। আর এ কথাও ঠিক, যত ব্যথা আমরা তাদের দিই, তার চেয়ে ঢের ব্যথা নিজেরা পাই। লোক তাজমহলের শুধু পাথর দেখে, ভিতরের প্রাণ দেখতে চায় না। এ আমাদের বড় দুঃখ। এ সত্বেও আমার মতন নির্গুণ একটা লোককে আপনাদের মত সজ্জন লোকেরা বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন, এ ত আমারই ভাগ্যের কথা—'

প্রণবকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রগতি বলে উঠল, 'থাক, খুব বিনয় দেখাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার মা আছেন?'

প্রণব এইরূপ একটি প্রশ্ন প্রগতির কাছে আদপেই আশা করে নি। সে এইবার একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, 'না, আমার কেউ নেই। আমি একা থাকি।'

প্রগতির মা আজও জীবিত। তাই মায়ের স্নেহ কি তা সে বোঝে। প্রগতির মন সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। তাই উত্তরে সহানুভূতির স্বরে প্রগতি প্রণবকে বলল, 'অ্যাঁ, সে কি? আপনার কেউ নেই? বিয়েও করেন নি? আপনার তাহলে বড় কষ্ট ত?'

প্রণব প্রগতির দিকে একবার চেয়ে দেখল মাত্র। সহসা সে প্রগতির এই কথাটার উত্তর দিতে পারল না। তবে মনে সে বেশ একটু খুশীই হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে সে উত্তর করল, 'বিয়ে! না বিয়ে ত করি নি। আর আমাদের মত হতভাগাকে কেই বা বিয়ে করবে! সামান্য চাকরে লোক আমরা।'

প্রগতি প্রণবের এই হতাশাব্যঞ্জক কথায় কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে কি একটা বিষয় বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে উত্তর করল, 'কি যে আপনি বলেন! আপনার মত লোককে বিয়ে করা ত ভাগ্যের কথা। করলেনই বা আপনি সামান্য চাকরি। পয়সাই কি সব? পয়সা কিছু বটে, কিন্তু সব নয়।'

প্রগতি সহজ ভাবেই কথাটা বলেছিল। প্রণবেরও তার কথাটা সহজ ভাবেই নেবার কথা। তবু প্রণবের মন প্রগতির এই উত্তরের মধ্যে একটা

প্রচ্ছন্ন অর্থ খুঁজে বার করতে চাইল। প্রথমটায় একটু বিব্রত ভাব অনুভব করলও পরে সামলে নিয়ে প্রগতির এই কথায় প্রণব একটু হেসে উত্তর করলো, 'আচ্ছা, আপনার ত এখন বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাক, তারপর আমার জন্য একটা মেয়ে দেখে দেবেন।'

এই কথা কয়টা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেই প্রণব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হল এতটা অন্তরঙ্গতা এদের সঙ্গে দেখানো বোধ হয় ভালো হয় নি। প্রণব ভাবছিল, এই জন্য সে ক্ষমা চেয়ে নেবে কি না।

প্রণবকে অবাক করে দিয়ে প্রগতি এইবার উত্তর করল, 'অ্যাঁ! আমার বিয়ে? না, বিয়ে-টিয়ে আমি করব না, দেখবেন। সত্যি!'

'এ কি বলছেন আপনি! কে একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে না?' প্রণব আশ্চর্য হয়ে প্রগতিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বিয়ের জন্যেই ত আপনার বাবা টাকা তুলে আনছিলেন। তারপর—'

'হুঁ! আমার বাবা মা তাই ত বলেন।' প্রগতি বেশ একটু দৃঢ় চিত্তে প্রণবের এই প্রশ্নের উত্তর দিল, 'কিন্তু—ভালই হয়েছে, টাকা চুরি হয়েছে আমিও রেহাই পেয়েছি। যারা আমার চেয়ে টাকাটাই বেশী করে চায়, তাদের বাড়ি আমি যেতে চাই না। আপনারা ভালো করেই জেনে রাখুন যে, বিয়ে-টিয়ে আমি করব না।'

কথা কয়টা বলে প্রগতি মুখ নীচু করল। প্রণব ভাবল এ আবার কি! এর পর উত্তরে প্রণব কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় প্রগতির মা এক কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'পেগু, দে'ত মা চিনিটা ঠিক করে। আমি বাছা ওটা এখনও ঠিক করতে পারি না। আমি ততক্ষণ মিষ্টিটা নিয়ে আসি।'

পাশের শেলফে এক টিন চিনি ছিল। প্রগতি সেখান থেকে টিনটা নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে চায়ের সঙ্গে চিনিটা মেশাতে মেশাতে প্রণবকে বলল, 'আপনাদের জীবনটা বড় বৈচিত্র্যময়, না? কত রকম লোকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়। সমাজের কত ঘাত-প্রতিঘাত, অনুভূতি দৈনন্দিন জীবনে আপনাদের সামনে আসে। আমার ইচ্ছা হয় দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আপনার কাছে বসে আপনাদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনি।'

প্রণব খুশী হয়ে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় দরজার কাছ থেকে ধীরাজবাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল। তিনি বাইরে থেকে সেই সবেমাত্র ফিরছিলেন। ধীরাজবাবু হাঁক-ডাক করে কাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কৈ, প্রণববাবু কোথায়? কতক্ষণ তিনি এসেছেন?'

প্রণব আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেল। প্রগতি একটু একটু করে সরে দাঁড়াল। প্রণবও তার চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিল। তারা দুজনেই ধীরাজবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ তারা শুনতে পেল ধীরাজবাবু অনুচ্চস্বরে স্ত্রীকে বলছেন, 'তোমারও ওঘরে থাকা উচিত ছিল। পেশু ওখানে একলা রয়েছে।'

সামান্য কয়দিনের পরিচয় হলেও প্রণবকে শুরু হতেই প্রগতির মা'র ভালো লেগেছিল। প্রণবের প্রতি স্বামীর এই অহেতুক সন্দেহ তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারলেন না, তাই প্রগতির মা প্রত্যুত্তরে ঝঙ্কার দিয়ে স্বামীকে বললেন, 'কেন, তাতে হয়েছে কি? মুখুয্যেদের সেই ডেপুটী ছেলেটির সঙ্গে তখন নিজেই ত ওকে পীড়াপীড়ি করে পাঠিয়ে দিতে। যত দোষ, না—'

ধীরাজবাবু কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রীর কিছু পূর্বেই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি এখানে দেখেছেন ও শুনেছেন অনেক। এত সহজে মানুষকে বিশ্বাস করলে তাঁর চলবে কেন? তাই উত্তরে ধীরাজবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সে—তার সঙ্গে মিশতে বলেছি, কথা বলতে দিয়েছি, তার একটা কারণ ছিল। তাকে আমরা জানি। আজকালকার ছেলেরা যে চায় ওই। আমি কি করব বল। তারপর দু'হাত এক'—

বহির্জগতে পুরুষেরা বুঝে-সুঝে কাজ করলেও অন্দর মহলে এসে তারা বোধ হয় বেসামাল হয়ে ওঠে। তাই ধীরাজবাবুকে আর কথা বলতে না দিয়ে প্রগতির মা বলে উঠলেন, 'তুমি চুপ কর। ভদ্রলোকের ছেলে শুনতে পাবে।'

হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠায় ধীরাজবাবুর অতো-সতো ভেবে দেখবার বোধহয় সময় ছিল না। তিনি শুধু স্ত্রীর গাফিলতির কথাই ভেবেছিলেন। আশে-পাশের কোনও দিকে চেয়ে দেখবার চিন্তা তাই তাঁর মনে স্থান পায় নি। তাই উত্তরে ধীরাজবাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এ যতই ভাল

হোক, পুলিসের লোক। ওরা নানা জায়গায় যায়, কত রকমের—। ওরা ভাল থাকে না সে বুঝচো না তুমি?'

প্রণব সম্বন্ধে এ রকম একটা ধারণা, তাকে ভাল করে জেনেও ধীরাজবাবুর মনে আসতে পারে, তা প্রগতি কল্পনাও করে নি। প্রগতি লজ্জায় মরে গিয়ে আড়ষ্টভাবে দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল। প্রণব বোধহয় এতখানি এদের কাছে আশা করে নি। সে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় ধীরাজবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে প্রণববাবু! বাঃ, বসুন। কি রে পেণ্ড, চা-টা দিয়েছিস ত, তা—'

ধীরাজবাবুর এই অভিবাদনের পর প্রণব মাথা নীচু করে উত্তর করল, 'না, আর বসব না। অনেকক্ষণ এসেছি। আপনার টাকাটা বোধহয় রিকভারি হবে। দেখি—'

১০

রামবাগানের বেশ্যাপল্লীর সেই নামকরা মাঠ। খানিকটা খোলা বাঁধানো জায়গা আর তার চারদিকে বড় বড বাড়ি। বাড়িতে বাড়িতে আভিজাত্যের পরিচায়ক টানা টানা টেলিফোনের তার। জানালায় জানালায় পর্দা, দুয়ারে ও বারান্দায় ঝুলান চিক। বাইরের এই স-সাবধান আবরণ রূপোপজীবিনীদের চোখের আড়াল করে রাখে, কিন্তু তাতে এদের প্রতি পথিকদের ঔৎসুক্য বাড়ে বৈ কমে না!

চারদিকে শুধু ভ্যাপসা একটা গন্ধ। আর সেই গন্ধের রেশ দালালদের ডাকাডাকি ও পানওয়ালাদের ছুটাছুটির সঙ্গে মিশ খেয়ে চারদিককার আবহাওয়ার মধ্যে একটা যেন মাদকতা এনে দিচ্ছে। আর সেই মাদকতার পূর্ণতা এনে দিচ্ছিল ফিরিওয়ালাদের কর্কশ গলা। পথের ভিড়ের মধ্যে ভিড় করে তারা পায়চারি করছিল ও সেই সঙ্গে তারা থেকে থেকে হেঁকে উঠছিল, 'চাই বেলফুলের মালা, গোটা গোটা বেলফুল। কাশীর জর্দা, কুলপীবরফ।'

ফিরিওয়ালাদের সেই কর্কশ গলা শুনতে শুনতে, পথিকের দল কেউ মোটরে, কেউ বা পায়ে হেঁটে এসে এদিক ওদিক একবার চেয়ে কি দেখে

নিচ্ছিল ; তারপর দালালদের হাত ও পরিচিতদের নজর এড়িয়ে সুটসাট্ করে এ বাড়ি ও বাড়ি ঢুকে পড়ছিল।

আশে-পাশের প্রত্যেক বাড়িখানিই যেন উৎসবাকুল হয়ে পথ থেকে অতিথি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। বিখ্যাত নটী চামেলীরানীর বাড়িখানির অবস্থাও সন্ধ্যাসমাগমে এই একই রূপ ধারণ করেছে। তবে সেই পরিবর্তন সেখানে ঘটেছে বেশ একটু আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে ; এইটুকুই যা এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ। কারণ গৃহকর্ত্রীর শিকারদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সভ্য এবং শিক্ষিত ছিল।

দ্বিতলের এক আলোকোজ্জ্বল প্রকোষ্ঠে একটি সোফার উপর তনুখানি এলিয়ে দিয়ে চামেলীরানী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল, আর সামনের একখানি কুশন চেয়ারে বসে হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে একজন অল্পবয়স্ক ছোকরা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করছিল। হঠাৎ ছোকরাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চামেলী বলে উঠল, 'হাঁ করে কি দেখছ? বোকা ছেলে কোথাকার।'

উত্তরে ছোকবাটি কি একটা বলতে চাইল, কিন্তু সহসা সে কিছু বলতে পারল না। মেজের উপর পাতা কার্পেটের উপরে পায়ের আঙুলগুলো সে ঘষতে লাগল মাত্র। নূতন পথের পথিক সে, সলজ্জভাব তার তখনও যায় নি। তাই সে একটু ভেবেচিন্তে উত্তর করলে, 'কই না! কিছু না! এই এমনি—'

ছোকরাটির এই নবীশ ভাব বেশ উপভোগ করতে করতে চামেলীরানী কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় চমকে উঠে সে শুনতে পেল চামেলীর মা মোক্ষদার গলা। ভিতরের বারান্দা থেকে চিৎকার করে তিনি বলছিলেন, 'ও বাবা, কারা গো! কারা তোরা?'

মায়ের চিৎকারে বেরিয়ে এসে চামেলীও লক্ষ্য করল, দুটো বেয়াড়া গোছের লোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। লোক দুটো আর কেউ নয়, তারা আমাদেরই করিম ও ছেদি। পকেটভবা টাকা নিয়ে তারা উপরে উঠছিল, কিন্তু তারা জানত না যে এই শ্রেণীর রূপোপজীবিনীরা টাকা ছাড়া আরও কিছু চায়। সিঁড়ির উপরের চাতালের উপর চামেলীর মা মোক্ষদা দাঁড়িয়েছিল। এইবার সে আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ও বাবা, এ যে উপরে উঠে আসে গো। ও ভুকিয়া—'

মোক্ষদাকে এইভাবে চেঁচাতে দেখে ছেদি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'আরে চিল্লাস কেন! হামরা কি ডাকু, মারতে আসছি? অ্যাঁ? দুটো গান শুনবে, পয়সা ভি দিবে।'

ছেদি ও করিমকে দেখে মোক্ষদা গুণ্ডার দল মনে করেছিল, কারণ এরকম গুণ্ডার জুলুম সেখানে মাঝে মাঝে হয়। ছেদি ও করিমের উদ্দেশ্য শুনে মোক্ষদা আশ্বস্ত হল, সাহসও তার দ্বিগুণভাবে ফিরে এল। সে এইবার ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আস্পর্ধার কথা শোন। বলে কিনা রাজপুত্তুররা ফিরে যাচ্ছে! এখুনি বেরো ব্যাটারা এখান থেকে।'

বুকভরা আশা নিয়ে করিম ও ছেদি এইদিন উপযুক্ত প্রণামীসহ তাদের এই আকাঙ্ক্ষিত দেবীর কাছে এসেছে। এত সহজে ফিরে যাবার পাত্র তারা নয়। মোক্ষদার কথায় করিম একটু বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করল, 'আরে আরে, এ কেয়া বাৎ। হামলোককো অপবাধ ক্যা হ্যায়?'

করিম ও ছেদির একমাত্র অপরাধ ছিল তাদেব পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা ও হাবভাব। তবে তা তারা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিল।

এদিকে চামেলীর মা যুগপৎ ক্রোধে ও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠছে। আর একটু দেরি করলে বিপদ ঘটতে পারে। করিমের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মোক্ষদা চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও ভিকু-উ। বাবা দু'ঘণ্টা ধরে সেই দু'খিলি পান আনছে। এধারে যে ডাকাতেরা এসে—'

টাকা ছাড়া এখানকার মেয়েরা যে আরও কিছু চায় তা ছেদি ও করিমের ধারণার বাইরে ছিল। তাই এদের খুশী করবার জন্যে এরা পকেট ভবে পর্যাপ্ত টাকাই এনেছে। এভাবে এখানে এলে অভ্যর্থিত হতে হবে, ছেদি ও করিম তা আশা করে নি। তারা যতদূর সম্ভব গলাটা মিষ্টি কবে উত্তর করল, 'আরে ভিকু কি করবে! হামাদের বাত শুন। হামরাভি আদমি আছি।'

মায়ের হাঁক-ডাক শুনে প্রমাদ গুনে চামেলীও ইতিমধ্যে ঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে। তার মনের একটা মিষ্টি আমেজ ও কৌতুক এইভাবে এদের আগমনের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এদের উপর তার মায়ের চেয়েও বেশী রাগ হচ্ছিল। মায়ের কথায় কোনও ফল হচ্ছে না দেখে চামেলী বলল, 'কে তোরা? বেরো বলছি। আমি এক্ষুণি থানায় ফোন করব।'

ছেদি ও করিম তখনও চামেলীকে লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ তাকে দেখে ও তার গলা শুনে চমকে উঠল। তারপর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একরকম আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, 'আরে বিবিজান! বাঃ, সেলাম!'

কিন্তু এতেও বিবিজানের মন একেবারে ভিজল না। সে ঠিকরে এসে ঘরে ঢুকে পড়ল।

চামেলীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সেই ছোকরাটি জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কি হয়েছে গো? কারা ওরা?'

ছোকরাটির এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চামেলীর যথেষ্ট সময় ছিল না। তার পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা ছিল যে, এখুনি এদের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এরা বারে বারে এসে তাকে বিরক্ত ও অস্থির করে তুলবে। থানায় ফোন করতে শুরু করলে তারা তখনকার মত পালিয়েও যেতে পারে। এদিকে ভয়ার্ত ছেলেটি তার যা কিছু লজ্জা সরম তা দূর করে দিয়ে একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে শান্ত করবার জন্যে একটা কিছু তাকে না বললেও নয়। নির্ভেজাল প্রীতির সঙ্গে বাম হাতটা ছোকরাটির কাঁধের উপর রেখে টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে চামেলী ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'দুটো গাড়োয়ান ক্লাসের লোক তাড়ির ঝোঁকে একেবারে উপরে উঠে এসেছে। এদের ঠাণ্ডা করবার জন্যে এখুনি আমি দিচ্ছি থানায় ফোন করে।'

মুখ্যসুখ্যু মানুষ হলেও ছেদি ও করিমের চোখ কান খোলাই ছিল। পালাবার পথ খোলা রেখে তারা ভাল মন্দ কাজে হাত দেয়। বারান্দা থেকে ছেদি ও করিম দেখল, চামেলী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলছে, 'বড়বাজার টু থ্রি ওয়ান ফোর। জোড়াসাঁকো থানা, দেখুন—'

বহুকাল জেলে থাকার পর সম্প্রতি তারা মুক্ত পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে। মুক্তি বা ছুটির একটা দিন পুরোপুরিই ভোগ করে নিতে চায়। এত শীঘ্র থানার হাজতে বন্ধ হতে তাদের মন এখন একটুও চায় না। তাই পুলিসের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে ছেদি ও করিম এই সময় একেবারেই রাজী ছিল না। তারা বিরক্ত হয়ে পিছু হটতে হটতে বলে উঠল, 'আচ্ছা বাবা, হামি লোক যাচ্ছি। এবার আসবে তো, ওই ছোকরাবাবুর মাফিক পাণ্টুলেন পরিয়ে আসবে। একদম ভোদ্দর লোক বানিয়ে তবে আসবে।'

এদের তাড়াবার জন্যে টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটা তুলে নিলেও চামেলীর

পিছন দিকে নজর ছিল। তাই ফোন করতে করতে চামেলী দেখতে পেল, ছেদি ও করিম তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে। গুণ্ডাগুলোকে এখানে আটকে রাখবার জন্যে সে চিৎকার করে বলে উঠল, ওমা, পালিয়ে গেল ওরা। শীগগির দেখ ভিকু এসেছে কি না? ভিকুকে ওদের ধরতে বল, এক্ষুণি পুলিস আসছে।'

করিম ও ছেদির আগমনে ছোকরাটিও ভয় পেয়ে গেছল, এখন পুলিস আসছে শুনে তার ভয় দ্বিগুণ হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি রিসিভার-সমেত চামেলীর হাতখানি চেপে ধরে অনুযোগ করল, 'ওরা ত চলে গেছে, এখন বারণ করে দাও। ওরা যে এখানে এসে আমাকে দেখে ফেলবে। ছি ছি, কি মনে করবে ওরা, হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি—'

ছোকরাটির এই ভয়ার্ত ভাব দেখে চামেলী হেসে ফেললে ও তারপর ছোকরাটির গাল দুটো টিপে দিয়ে সস্নেহ ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'এত যদি ভয় তো আস কেন এখানে? দুষ্টু ছেলে কোথাকার।'

ছোকরাটি উত্তরে চামেলীকে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে ভীষণ রকমের একটা গোলমাল শুনা গেল। ছোকরাটির আর কিছু বলা হল না। সে সভয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এখান থেকে পালাবারও যে তার পথ নেই। চামেলী ততক্ষণে বাড়ির সামনেকার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এখানে যে মুহুর্মুহু এত বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তা ছোকরাটির ধারণার বাইরে ছিল। অগত্যা ছোকরাটিও অসহায়ভাবে তার দয়িতার পিছু পিছু এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিকের ফাঁকে বাইরের ব্যাপারটা একবার দেখে নিল, তারপর ভয়ার্তকণ্ঠে চামেলীকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠল, 'কি হবে, ওরা যে এসে পড়ল!'

সে সময়ে ওই অঞ্চলে খুন-খারাবি একটু বেশী হচ্ছিল। তাই চামেলীর ফোন পাবা মাত্র পুলিসের দল একখানি ট্যাক্সি করে রামবাগানে মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। ছোকরাটির এই ভয়ার্ত ভাব দেখে চামেলীর একটু দয়াই হল। সে বাঁ হাত দিয়ে ছোকরাটির চিবুকটা একটু নেড়ে দিয়ে বলল, 'ভয় কি! আমি নীচে গিয়ে বুঝিয়ে ওদের বিদায় করে দিয়ে আসছি। তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত খাটের উপর উঠে শুয়ে পড়।'

চামেলীর এই অভয় বাণী ছোকরাটিকে একটুকুও নিশ্চিন্ত করতে পারে নি, তাই ছোকরাটি নিশ্চল কাষ্ঠের মতই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে সে একটু আশ্বস্ত হয়ে উত্তর করল, 'ওরা উপরে আসবে না ত?'

চামেলীর ধারণা ছিল যে তার চটুল চাহনি ও মোহিনী শক্তির প্রভাবে সে পুলিসকে নীচে থেকেই বিদায় করে দিতে পারবে। তাই চামেলী উত্তরে ছোকরাটিকে আশ্বস্ত করে বলল, 'না, না। ওরা এখানে আসবে না। এখন তুমি খাটের উপর উঠে পড়বে, না তোমার জুতোটা আমায় এখন খুলে দিতে হবে?'

চামেলীর কথার কোনও উত্তর না করে ছোকরাটি লক্ষ্মী ছেলের মতই খাটে উঠে বসল। আর চামেলী তার অগোছাল শাড়িখানা ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে, চাবির শব্দ করতে করতে নীচে চলে গেল, তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ইনিয়ে বিনিয়ে এই সব আগন্তুক গুণ্ডাদের সম্বন্ধে পুলিসকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে।

নীচে এসে চামেলী যা দেখতে পেল, তাতে সে অবাক্ই হল বেশী। সিঁড়ির নীচে চাতালের উপর সেই বেয়াড়া গোছের লোক দুটো চাকর ভিকু ও ঝি মেনকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কথা বলছে। ঝি ও চাকর দুজনারই হাতে দু'খানা করে দশ টাকার নোট। বিস্ময়ের ঝোঁকটা কোনও রকমে কাটিয়ে নিয়ে চামেলী চিৎকার করে উঠল, 'ওমা! ওরে ও ভিকু! বলি ও নিমকহারাম!'

চামেলীর কথায় ভড়কে গিয়ে ভিকু পিছিয়ে গেল। মেনকা কিন্তু অত সহজে ভড়কাবার পাত্রী ছিল না। এমনি দালালীর কাজ সে জীবনে বহুবার করেছে। মধ্যে মধ্যে তার এই সব প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যাত হয় নি তা নয়। তবে এর শেষ ফল সম্বন্ধেও তার বহু অভিজ্ঞতা আছে। যার শেষ ভালো তার সবই ভালো। এই রকম অনেক দেমাকী মেয়ের দেমাক সে ভেঙেছে। এই সব কাজে দুই একটা গালিগালাজ তারা তাদের হক পাওনাই মনে করে থাকে। তাই সে একটু এগিয়ে এসে উত্তর করল, 'নাওঘরের জমিদার দীপচাঁদের কাছ থেকে লোক আসছে মা! জমিদার সাহেব খুদ আসতে চান। আপনার দু-একটা ভালো-মন্দ শুধু গান শুনবেন। এনারা লোকমুখে আপনার নাম শুনেছেন কি না! এরা বলছে যে, তেনারা এক এক গানে আপনাকে পান্‌শ' টাকা—'

এতদিন ধরে চামেলীর ঘরে চাকরি করেও বোধহয় ভিকু ও মেনকার দুজনার কেউই তাদের মনিবানীকে চিনতে পারে নি। আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে চামেলীর যথেষ্ট তফাৎ ছিল। টাকার জন্যে দেহ বিক্রয় করতে সে কোনদিনই রাজী হয় নি। চামেলী ঝঙ্কার দিয়ে তাদের ধমক দিয়ে বলে উঠল, "দরকার নেই, দূর করে দে ওদের।'

এইদিন চাকর ভিকু ও ঝি মেনকার কপালে বোধহয় আরও গালিগালাজ মনিবানীর কাছ হতে জুটত। কিন্তু তাদের ভাগ্য বোধহয় এই দিন ভালো ছিল। ততক্ষণে বাড়ির নম্বর ঠিক করে পুলিসও দরজার কাছে এসে পড়েছে।

পুলিস দেখে এক লাফে ছেদি ও করিম পিছিয়ে বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ালো। চামেলী তাই দেখে চিৎকার করে পুলিসকে বলল, 'এই এরা, শীগ্‌গির ধরুন এদের—'

পুলিসের দল চামেলীর নির্দেশ মত ছেদি ও করিমকে তাড়া করল, কিন্তু এখানকার মামুলী পেটী কেসের আসামীদের মত এক দৌড়ে এদের ধরা পুলিসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুলিসের দল দৌড়ে তাদের কাছে আসবার আগেই উঠানের শেষের পাঁচিলটার উপর লাফিয়ে উঠে তারা বলে উঠল, 'বা রে বিবিজান!'

ছেদি ও করিমকে বিনা বাধায় পাঁচিলের উপর উঠতে দেখে পুলিসদের একজন জমাদার তার সিপাইদের ধমকে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, কেয়া দেখতা হায় তুম লোক? পাক্‌ড়ো, জলদি উনলোককো পাক্‌ড়ো।'

সিপাইরা তাদের ধরবার জন্য ছুটে গেল বটে, কিন্তু তার আগেই ছেদি ও করিম বাড়ির পিছন দিককার একটা গলিতে নেমে পড়ে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে চোঁচা ছুট দিয়েছে। নাদাপেটা সিপাহী জমাদাররা চেষ্টা করেও তাদের ত্রিসীমানায়ও এইদিন পৌঁছতে পারল না।

পলায়ন বিশারদ ছেদী ও করিমের পক্ষে পুলিসের নজর এড়িয়ে সরে পড়া সহজ কাজ। ছেদি ও করিম কোনদিকে আর না চেয়ে, উঠি-পড়ি করে কিছুদূর ছুটে গেল ও তারপর থমকে, দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, কেউ তাদের অনুসরণ করছে কি না। তারপর পিছনে কাউকে না দেখতে পেয়ে ছেদি করিমকে বলল, 'কোহি নেহি পিছুমে আছে। এবে শালে, কুচ্ছ কামকো না! চো-ল্‌, এবে ফিরিয়ে চোল।'

কথা ক'টা বলে ছেদি এগিয়ে যাচ্ছিল; তাকে বাধা দিয়ে করিম বলল, 'যাবি কোথা! চোল্‌, ফিন উখানে।'

এখনো যে করিমের শখ মেটে নি তা ছেদি ভাবতেও পারে নি। তাই উত্তরে ছেদি বিস্মিত হয়ে করিমকে বলল, 'আরে, পাগলা আছে নাকি? চামলী চামলী করিয়ে তুহার শির একদম বিগাড় গেছে। হুয়া চামলীকে মা ভি আছে, আউর পুলিস ভি আছে, সে ভুলিয়ে যাস কেন? তু শা—'

চামেলী ও তার মায়ের এই ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে এইদিন করিম একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার বহুদিনের সাধের স্বপ্ন এরা ভেঙে দিয়েছে! এত সহজে সে তাদের ক্ষমা করেই বা কি করে? গলির পাশের একটা ভাঙা চাতাল থেকে একখানা থান ইট উঠিয়ে নিয়ে করিম উত্তর করল, 'আরে উন লোক তো আছে, লেকেন হামি লোক ভি আছে, হামি লোক কি মরিয়ে গেছে? এবে চোল্ শালে, উন লোককে থোড়া হুঁশিয়ারী করিয়ে আসি।'

ছেদি করিমকে ইটখানা চাতাল থেকে তুলে নিতে দেখে তার উদ্দেশ্যটা সহজেই বুঝে নিয়েছিল। করিমের সংকল্প থেকে তাকে বিরত করা যে কত দুঃসাধ্য তা সে জানত। তাই তার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় আর না করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেদি করিমকে বলল, 'তুঁহার সে শির একদম বিগাড় গেছে। আচ্ছা, যো করে খোদা, চোল—'

ধীরে ধীরে ফিরে এসে তারা চামেলীদের বাড়ির পাচিলের নীচে হাঁটু গেড়ে বসল। চামেলী তখনও নীচের উঠানের উপর দাঁড়িয়ে পুলিসের সঙ্গে কথা কইছে। তাদের অস্পষ্ট কথা ছেদি ও করিম সেখান থেকে ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না, কিন্তু চামেলীর মা'র গলা তারা সুস্পষ্টই শুনতে পেল। চামেলীর মা উপরের বারান্দায় সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে তখনও গজরাচ্ছে, 'বলে কিনা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! এত বড় গুণ্ডা হয়েছিস তোরা, আমি মোক্ষদা বাড়িউয়ালী, আমার বাড়িতে কিনা—'

পুলিসের কাছে নিজেকে একজন সিনেমা আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে চামেলী তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিল। সিনেমা আর্টিস্ট হওয়ায় সে আর সাধারণ রূপোপজীবিনীদের মধ্যে পড়ে না। এজন্য তার খাতিরও বেড়ে গিয়েছে। তাই চামেলী তার মা'র এই রকম বীভৎস চিৎকার আদপেই পছন্দ করছিল না। এর কারণ এতে তার সম্বন্ধে পুলিসের লোকদের খারাপ ধারণা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এদিকে তার মায়ের চিৎকার যেন থামতেই চায় না। মায়ের চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে নীচে থেকে চামেলী বলল, 'তুমি চুপ কর মা। চেঁচিও না।'

উত্তরে চামেলীর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'কেন না! চুপ করব কেন, আসুক না ব্যাটারা, তাদের চোদ্দ পুরুষের—'

ছেদি নির্বিকারভাবেই চামেলীর মা'র কথাগুলো শুনল, কিন্তু করিম তা

সহ্য করতে পারল না। তারপর সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। থান ইটখানা বাগিয়ে ধরে করিম সেখানা সজোরে চামেলীদের দোতলার সিঁড়ির কাচ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল, তারপর ইটখানি ঠিক তাগসই লাগল কি না তা দেখে নিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। এইবার কোন দিকে আর না চেয়ে ছেদিও তাকে অনুসরণ করল।

ইটখানি সজোরে এসে দোতলার সিঁড়ির জানলার একখানা কাচ চুরমার করে ভেঙে দিয়ে ভিতরের বারান্দায় এসে পড়েছিল।

বারান্দার উপর সিঁড়ির ঠিক মুখটাতেই চামেলীর মা দাঁড়িয়েছিল। ইটখানা তাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়। ভাঙা কাচের কয়েকটা টুকরো সশব্দে এসে তার গায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপার দেখে সে ঠিকরে এসে চামেলীর ঘরে ঢুকে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে মা। ও বাবা গো—'

চামেলীর মা'র চিৎকারে পুলিসের দল তরতর করে উপরে উঠে এল, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে সেখানে পেল না। এমন কি সেই ছোকরা বাবুটির পর্যন্ত সেখানে দেখা মিলল না। কিন্তু পুলিস সব সময়েই নির্বিকার। শোক, দুঃখ, সফলতা বা নিষ্ফলতা কোন কিছুই তাদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। তারা শুধু বোঝে কর্তব্য ও উপরওয়ালার হুকুম। তাই নিষ্ফলতা ও সফলতা তাদের কাছে সমান। তারা ক্ষুণ্ণও হল না, দুঃখিতও হল না, কিন্তু চামেলীর হল এক মহা ভাবনা। ছোকরা বাবুটি তাহলে গেল কোথায়?

জমাদার তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তখনও চোর খুঁজছিল, আর চামেলী হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। হঠাৎ জমাদার সাহেব লক্ষ্য করল ঘরের কোণে জড়োকরা বালিশ, লেপ ও তোশকের উপরকার একটা অংশ মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। সে এইবার অবাক্ হয়ে বলে উঠল, 'আরে, কেয়া হ্যায়, হ্যাঃ, উসমে কোন্ হ্যায়? শালে লোক জরুর—'

জমাদারের কথায় চামেলীরও দৃষ্টি ঘরের কোণের সেই জড়োকরা তোশক ও বালিশগুলোর উপর গিয়ে পড়ল। চামেলীর বুঝতে আর বাকি রইল না, ওই লেপ-তোশকের মধ্যে আত্মগোপন করে কে বসে আছে। সে ধাবমান জমাদারের দিকে ছুটে এসে তাকে আগলে ধরে বলে উঠল, 'বেরাল, বেরাল। উসমে বিল্লি হ্যায়। মাৎ যাও উঁহা।'

চামেলী সামনে এসে দাঁড়ানোতে জমাদার সাহেব আর এগোতে

পারে নি, চামেলীকে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবও ছিল না, কিন্তু একজন সিপাই ঝোঁকের মাথায় ছুটে গিয়ে সেই তোশকের গাদার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। সিপাইজীর হাতখানি সরাসরি ছোকরাটির মাথায় ঠেকেছিল। সে ছোকরাটির লম্বা চুলগুলো মুঠো করে ধরে একেবারে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'আরে, এ কোন্ হ্যায়? হিঁয়া কোউন ছিপাতা, আর-এ—'

এই সব লেপ-তোশকের মধ্যে আর যে কেউ লুকিয়ে থাকুক না কেন, চোর ডাকাত যে এই রকম একটা জায়গায় লুকোবে না, এ বুদ্ধি থানার অভিজ্ঞ পুরানো জমাদারের নিশ্চয়ই ছিল। সে তার গোঁফের ফাঁকে একটু মুচকি হেসে চামেলীর দিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর ছোকরাটির এই ভয়বিহ্বল সকাতর মুখখানি দেখে জমাদার সাহেব বলে উঠল, 'আউর কোন, চোর উর হোবে। লে আও খিচকে—'

জমাদারের হুকুম মত কাজ করতে সিপাইরা সব সময়েই বাধ্য থাকে। এ ছাড়া পুলিস বিভাগে নবাগত হওয়ায় ভিতরের ব্যাপারটা সে একটুও বুঝতে পারে নি। বরং এই ছোকরাটিকে সে একজন চোর-গুণ্ডার সামিলই মনে করেছিল। তাই সিপাইটি একজন চোর ধরার আনন্দে আনন্দিত হয়ে ছোকরাটিকে ধরে টেনে নিয়েই আসছিল। এমন সময় চামেলী ছুটে এসে সিপাইটির হাত থেকে ছোকরাটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছোড় দেও, এ—এ হামরা—'

এতক্ষণ জমাদারের ধারণা হয়েছিল যে ছেলেটি ছিল একজন সিনেমা জগতের লোক। নট বা স্টার হবার লোভে এমনি অনেক ছেলে-ছোকরারা সময়ে অসময়ে এদের সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু এই ছেলেটির উপর চামেলীর এই দরদ দেখে জমাদারের আর বুঝতে বাকি ছিল না যে ছোকরাটি চামেলীর কে। গোঁফটা আবার একবার মুচড়ে নিয়ে ছেলেটির দিকে একবার চেয়ে দেখে হেসে ফেলে সে চামেলীকে জিজ্ঞেস করল, 'এহি আদমী আপকো বিল্লি হ্যায়?'

এই সব অতর্কিত ঘটনার প্রবাহে ছোকরা বাবুটি লজ্জায় আধমরা হলেও চামেলীর এতে লজ্জার কারণ ছিল না। এইভাবে মানুষের সম্মান বাঁচানো ছিল তার পেশাগত কর্তব্যের একটা অঙ্গমাত্র। তবে এই ভাবে ধরা পড়ার জন্যে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, এই যা। এখন যে রকম করে হোক এই ডেকে আনা আপদকে বিদায় করা দরকার। তাই জমাদারকে

শান্ত করে চামেলী বলল, 'ইজ্জতদারকো লেড়কা হ্যায়, ইজ্জতসে থোড়া ডরতাই। আপ তো সব কুছ সমজেতেহি। আভি যাইয়ে আপ লোক।'

জমাদার সাহেবের জীবনে এ রকম ঘটনা নূতন একটা অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল না। এখানে অপেক্ষা করার তার প্রয়োজন নেই। তাই সে সিপাহীদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, উ তো ঠিক বাৎ আছে।'

জমাদার সাহেবকে এই ভাবে ভালয় ভালয় আর কোনও ঝামেলা না করে বেরিয়ে আসতে দেখে খুশী হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চামেলী বলল, 'আচ্ছা ভাই, রাম রাম। আপ লোক তো বহুৎ তকলিফ—'

সরকারী কাজ, তারা তাদের কর্তব্যই করতে এসেছে, এতে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই, এইটিই ধন্যবাদদাত্রীকে জানিয়ে দেবার জন্য জমাদার সাহেব একবার মুখ ফেরাতেই সেই ছোকরা বাবুটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। বাবুটি এতক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকায় জমাদার তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নি। তার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে এইবার সে অবাক্ হয়ে উঠল, 'আরে, আপ ত বহুবাজার থানাকো মতিবাবুকো ভাতিজা। আপ হিঁয়া কেঁইসে আগিয়া?'

ছোকরাটি বহুবাজার থানার ইনসপেক্টর মতিবাবুর সম্পর্কে ভাগিনেয়, ভাতিজা নয়। জমাদার সম্পর্কটা ভুলে গেলেও মানুষটাকে একেবারে ভোলে নি। এক বছর আগে জমাদার যখন বহুবাজার থানায় কাজ করত, তখন ছেলেটিকে মাঝে মাঝে মাতুলের কাছে সে আসতে দেখেছে। ছোকরাটি জমাদারকে চিনতে না পারলেও সে যে তাকে চিনেছে, সে সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহ ছিল না। সে এক মহা ভাবনায় অতিষ্ঠ হয়ে ছুটে এসে জমাদারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'মাফ করিয়ে ভাই, মামাবাবুকো মাৎ বলিয়ে।'

জমাদার সাহেব নিজেও ছেলেপুলের বাপ। এই ছোকরার মতই তার একটি ছেলে পাটনা শহরের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছে। এই উচ্ছন্ন-যাওয়া ছেলেটির কথা ভেবে সে তার নিজের ছেলেটির জন্যও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। ছেলেটির এই নির্লজ্জ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জমাদার তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তর করল, 'ছোড় দিজিয়ে। আপকো সরম লাগতা নেহি? স্কুলিয়া হোকে, ই কাঁহা আ'ইয়া?'

জমাদারের কথায় ছোকরাটির মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। সমস্ত

দেহটা তার থেকে থেকে দোলা দিয়ে উঠছিল। আত্মীয়স্বজন সকলেই তাকে গঙ্গাজলের মতই পবিত্র বলে জানে। এখনই বা সে কি এমন অপবিত্র হয়ে পড়েছে? এমন কোন কাজ তো সে এখনও করে নি। কিন্তু তার এ কথা কে বিশ্বাস করবে? ভাবতে ভাবতে সে ক্রমেই হতভম্ব হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরে কি ভেবে আবার জমাদারের কাছে ছুটে এল। তারপর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট জমাদারের হাতে গুঁজে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সরে দাঁড়াল।

পুলিস সম্বন্ধে একটা অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়েই ছোকরা বাবুটি নোটখানা জমাদারকে দিয়েছিল। কিন্তু এখানে সে একটু বোধহয় ভুলই করেছিল। জমাদার সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই নোটখানা তার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এ কেয়া করতা হ্যায়, পুলিস লোক ঘুষ খাতা? আ? আপ অভিতক্ লেড়কা হ্যায়, ওহি ওয়াস্তে ছোড় দেতে! নেহি তো হাম আপকো উপর একঠো কেশ জরুর চালায় দেতে থে। এইসান ফিন কভি—'

চামেলী তাড়াতাড়ি নোটখানি কুড়িয়ে নিয়ে ছোকরাটিকে পিছনে একটু সরিয়ে দিয়ে জমাদারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আড়াল করে দিল, তারপর নিজে সামনে একটু এগিয়ে এসে ছোকরাটির উদ্দেশ্যে একটু অনুযোগ করে বলে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া শিখে এই রকম বুদ্ধি তোমার?' তারপর সে এই জমাদারের দিকে ফিরে অনুনয় করে, তাকে বুঝিয়ে নিজে এই ছোকরাটির হয়ে মাফ চেয়ে বারে বারে বলল, 'মাফ কিজিয়ে সাব, লেড়কা হ্যায়।'

চামেলীর উপর জমাদার সাহেবের কোনও অভিযোগ ছিল না। ওরা তো পুরুষানুক্রমে এখানে পশার বসিয়ে আছেই। থাকবেও এখানে এরা শিকারের জন্য ওৎ পেতে আরও বহুকাল। কিন্তু লেখাপড়া শিখেও নিজের সর্বনাশ করতে এই ছোকরাবাবুটি এখানে আসবে কেন? এজন্য তার যত রাগ তা এই ছোকরাবাবুর উপরই গিয়ে পড়েছে। তাই উত্তরে জমাদার চামেলীকে বলল, 'কেয়া বোলে হাম আপকো, লেড়কা তো ই হ্যায়ই। লেকিন ইনকো বাড়ে হাম্ কেয়া বোলে?'

জমাদার সাহেব তখনও তার বক্তব্য শেষ করে নি। হঠাৎ ছোকরা-বাবুটি আবার ছুটে এসে জমাদারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ক্রন্দনের সুরে বলে উঠল, 'মামাবাবুকো মাৎ বলিয়ে।'

এই পাড়ায় এই ছোকরাবাবুর মত খানদান আদমীর লেড়কারা হামেসাই

এসে থাকে। এই জন্যে এর ওর মামাবাবুদের বলে দেবার মত যথেষ্ট সময় ও ধৈর্য জমাদার সাহেবের ছিল না। উত্তরে জমাদার সাহেব নাক সিঁটকে বলল, 'হাম কোইকো নেহি বোলেগা। লেকেন আউর ফিন রেণ্ডি বাড়িমে মাৎ আও।'

কথা ক'টি বলে জমাদার ছোকরাটির দিকে আর না তাকিয়ে সিপাহীদের সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচের সিঁড়ির উপর জমাদার সাহেবের জুতার শব্দ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলেও ছোকরাটির হৃদপিণ্ডের ধ্বনি সমানভাবেই ধ্বনিত হচ্ছিল। ছোকরাটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তার হৃৎপিণ্ডের সেই ধ্বনি অনুভব করতে লাগল, কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। ভীতি ও লজ্জার একটি কঠিন আবরণ দিয়ে আকণ্ঠ তাকে কে যেন ঢেকে দিয়েছে। চেষ্টা করেও সে আর একটুও নড়তে পারে না।

ছোকরাটির মনের অবস্থা চামেলী সহজেই বুঝে নিতে পারল। সে সান্ত্বনার স্বরে ছোকরাটির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠল, 'কি গো, ভয় হচ্ছে? তোমার কোন ভয় নেই। তোমার মামাকে ও কোনো কথাই বলবে না। একথা আমি ঠিকই বলছি। পরে তুমি ভাই দেখে নিও। ওরা এর কথা ওর কাছে বলে না।'

ছোকরাটির চোখ দুটো আরও ছলছল করে উঠল। ছোকরাটির এই সময় চামেলীর প্রতি জমাদারের সেই অকথ্য সম্বোধনটুকুই শুধু বারে বারে মনে পড়ছিল। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে, এত জায়গা থাকতে চামেলীর মতন একজন ভাল মেয়ে কেনই বা এখানে পড়ে আছে। সে পাশের চেয়ারখানায় বিমর্ষভাবে বসে পড়ে চামেলীকে বলল, 'ওরা মামাবাবুকে বলে বলুক, সেজন্য আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি শুধু তোমার কথা। ওদের হাতে আমার লাঞ্ছনার কথা ভেবে আমার তত লজ্জা হচ্ছে না, যত হচ্ছে তোমার সম্বন্ধে ওদের ধারণার কথা শুনে। জমাদারটা তোমাকে কি বলে সম্বোধন করল, তা তো তুমি ওর মুখ থেকেই শুনতে পেলে।'

জমাদার চামেলীকে যা বলে সম্বোধন করল, তা ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যে যায় না, তা চামেলী ভাল করেই বোঝে। কিন্তু তবু জমাদারের এই শেষের কথাটায় তার মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল। সিনেমা জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বহির্জগতের আলো-হাওয়ার প্রচুর পরিচয় সে পেয়েছে। এখানকার এই অন্ধকার আঁস্তাকুড় আজকাল তার এমনিই ভাল লাগে না।

তবু একটু ভেবে চামেলী উত্তর করল, 'আর সকলের সম্বন্ধে ওরা যা ভাবে আমার সম্বন্ধেও ও তাই ভেবেছে। অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখবার ক্ষমতা ও বেচারীর নেই। ও তো আর তুমি নও।'

'তোমাকে কতদিন বলেছি, অন্ততঃ এ-জায়গাটা ছেড়ে অন্য জায়গায় চল', উত্তরে ছোকরাটি ক্ষুণ্ণমনে বলল, 'তা যদি তুমি শুনতে, তাহলে তো লোকটা তোমাকে অমন ভাবে অপমান করতে সাহস করত না।'

স্টুডিও থেকে ফেরত পথে আর্টিস্ট বান্ধবীদের সঙ্গে বালিগঞ্জ অঞ্চলের ভদ্রসমাজে মেলামেশার সুযোগ তার ইদানীং কয়েকবার হয়েছে। সেখানকার সেই মধুর পরিবেশের হাতছানি চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়। তবু এইখানকার এই জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া যে এমনিই কত কঠিন, ছোকরাটির তা বুঝবার ক্ষমতা না থাকলেও চামেলীর ছিল। তাই চামেলী লজ্জিত ভাবে একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, এ জায়গা ছেড়ে যাব এইবার।'

ছোকরাটি বোধহয় এতটা আশা করে নি, তাই খুশী হয়ে সোৎসাহে বলে উঠল, 'যাবে তো? ঠিক?'

চামেলী চোখ বুজে একটু কি ভাবল, তারপর হেসে ফেলে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, ঠিক যাব।'

১১

বেলা প্রায় চারটা তখন বেজে গেছে। এখানে আর বেশী দেরি করা চলে না। বেশী দেরি করলে তাদের সব মতলব ভেস্তে যেতে পারে। পোশাকের একটা গাঁটরি হাতে ওয়াছেল মোল্লার দোকান থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে ছেদি করিমকে বলল, 'সে এখনি সব টেকা খরচ করিয়ে ফেলবি। সাত রোজ তো কোনও কামভি করেয়েছিস না।'

অপরাধী সমাজের লোকেরা ভবিষ্যতের পরোয়া কমই করে থাকে। অন্যায় ভাবে অপহৃত শেষ কপর্দকটি ব্যয়িত না হওয়া পর্যন্ত তারা নূতন রোজগারের কথা ভাবে না। তাই উত্তরে করিম বিরক্ত হয়ে ছেদিকে বলল, 'আরে টেকা লিয়ে সে হামি লোক কি করবে! হামি লোক কি সাদি উদি করিয়েছি?'

করিমের পছন্দমত নানা দোকান ঘুরে জুতো, জামা, কাপড়, পাগড়ি কিনতে কিনতে ছেদি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'তো শালাকে সাধি করবে কে রে? তু শালা—।'

'সাদি করবে তু শালা, আউর করবে ভদ্দর লোক,' উত্তরে ভেঙ্চে উঠে করিম বলল, 'হামি লোক সাদি করবে?'

ছেদির আর বেশী কথা বলতে ভাল লাগছিল না। এ দিকে করিমের হাত থেকে সহজে রেহাই পাবারও উপায় নেই। সে কথার উপর কথা আর না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আভি যাবি কুথা বোল?'

করিমেরও যে এই সময় খুব ভালো লাগছিল তা নয়। সেও বেশ একটু দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। তাই করিম একটু সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করল, 'কেনো, আমিনা কো কুঠি। উসকো আস্তে ভি দুটো শাড়ি লিয়েছি। পহেলী আমিনাকো তেনি খুশী করবে। উসকো বাদ চামেলী বিবিকো কুঠিমে যাবে।'

ফুটের ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি ভাড়া দেবার মত এদিন টাকাও ছিল তাদের যথেষ্ট। পায়ে হেঁটে পথ চলতে আর যেন তাদের মন চায় না। ট্যাক্সিটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ছেদি বলে উঠল, 'খুব বলিয়েছিস। এবে চোল। টেকসিমে উঠ।'

এর পর তারা এগিয়ে এসে ট্যাক্সিখানিতে বেশ একটু চালের সঙ্গেই উঠে বসল। ট্যাক্সিচালককে গন্তব্য স্থান বলে দিয়ে কুশনের উপর তারা নিশ্চিন্ত মনে তাদের দেহ এলিয়ে দিল। সারাদিন ছুটাছুটি করে তারা একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। মনটাও তাদের খুব খুশী ছিল না। করিম তাই ছেদিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ভাবিস কেন, এখনো সে বহুৎ রূপেয়া আছে। এবে তু ঠিকসে বৈঠ।'

ছেদি অন্যমনস্ক হয়ে বোধহয় আমিনার কথাই ভাবছিল। এতই যদি তাকে অবহেলা করবে তো করিম তাকে ছেড়েই বা দেয় না কেন? কিন্তু যদি সে তাকে ছেড়েই দেয়, তাহলে আমিনার কি হবে? এই দিকটা চিন্তা করে ছেদি লজ্জিত হয়ে উঠে আপন মনে বলে উঠল, 'ধ্যেৎ।' হঠাৎ এইবার করিমের ধাক্কায় সে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে ও সেই সঙ্গে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে উত্তর করল, 'তু শালা বেইমান আছিস। তুহকে আমিনা এতো মহব্বৎ করে। তবু তু শালা, সে চামেলী চামেলী করবি।'

করিম ছিল একজন পাকা সেয়ানা। সে জানে শুধু নিতে, দিতে সে

শেখে নি। নিজের মনকেই সে বুঝতে শিখেছে। অন্যলোকের মনের খবর সে রাখে না। নিজেকে বঞ্চিত করে বা হারিয়ে ফেলে অপরকে খুশী করার পাত্রই সে নয়। তাই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে উত্তরে করিম বলল, 'আরে আমিনা তো দুধ আছে। একদম খাঁটি দুধ। লেকেন ঘোলভি থোড়া থোড়া পিননে চাহি। হামি লোক মরদ আছি না!'

সেদিনকার সে অপমানের পরও করিমের এই চামেলী-প্রীতি ছেদির অসহ্য হয়ে উঠছিল। যতই তারা পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে ভোল বদলাক না কেন, তাতে যে খুব বেশী সুবিধা হবে তা ছেদির মনে হয় নি। বরং ছেদি এইদিন চামেলীর বাড়িতে গিয়ে অধিকতর অপমানেরই আশঙ্কা করছিল। তাই সে এবার বিশেষ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তু শালা এহিবার সোত্যিই সে ঘোল খাবি।'

এদিকে করিমের উদ্যমের শেষ নাই! ছেদির মত সে মান অপমান বুঝে না! সে শুধু বোঝে বুদ্ধি ও চেষ্টা। তার কাছে নিষ্ফলতা, অপমান, সফলতা সব সমান। এ ছাড়া আর কিছু সে জানে না। আশু সাফল্যের আনন্দে করিম বুকটা একবার চিতিয়ে নিল। তারপর সে খুশী মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, 'সে পেণ্টুলেন পরিয়ে, পাগড়ি বাঁধিয়ে, সে দিঘপতিয়াকা কুমার তো আভি বোন্ যাই! উস্‌কো বাদ বাস, সে চামেলীরানী হামারি! চা—মে—লী—রা—নী হা—মারি, বিলকুল সে হামারি, হাঃ। ঘাবড়াস্ কেনো!'

করিমের কথায় ও ভঙ্গিতে ছেদির মনের উৎসাহ কতকটা ফিরে এল। চামেলীর সঙ্গলাভের ইচ্ছা মনে মনে তার যে একেবারে না ছিল তা নয়, তবে ইচ্ছা থাকলেও এই সম্বন্ধে তার আশা ছিল না, এই যা। সে এইবার করিমকে বাহবা দিয়েই বলে উঠল, 'তু শালা, এবার বোড় জব্বর মতলব বাৎলেছিস! আচ্ছা, এবে তো চোল্।'

ঝা ঝাঁ করছে রোদ্দুর। পথের লোক চলাচল ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে। দু-একখানি রিকশা ও বন্ধ গাড়ি ছাড়া আর কোন যানাদি চোখে পড়ে না। মোড়ের মাথায় ট্যাক্সিখানি বিদায় দিয়ে পুঁটলি হাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছেদি ও করিম যখন বস্তির অপরিসর পথটায় ঢুকল, তখন তাদের নূতন-কেনা হাতঘড়িতে প্রায় বেলা দুটো বেজে গেছে।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ধীর পদক্ষেপে কতকটা পথ চলে এসে

তারা আমিনার বাড়ির সামনে একবার থমকে দাঁড়াল। সহসা বাড়ির ভিতর ঢুকতে তাদের বাধ-বাধ ঠেকছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর করিম বলল, 'যো থাকে কোপালে, আভি তো চোল্।'

আমিনা দুয়ারের কাছে বরাবরই দাঁড়িয়েছিল। করিমের মত নির্মম লোকের সঙ্গে বাস করলেও তার পৌরুষকে সে পছন্দ করত। তা ছাড়া সে ছিল একজন নারী। ইতিমধ্যে একনিষ্ঠ হওয়ার একটা শখও তাকে পেয়ে বসেছে। এতক্ষণে তার মনে হচ্ছিল যে করিমকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেই বোধ হয় সে অন্যায় করেছে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিল যে ভালোয় ভালোয় এরা এখানে ফিরে এলে হয়। করিম ও ছেদিকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে সে তাদের কাছে ছুটে এসে আবেগভরে করিমকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'সে দু'দিন কোথা ছিলি রে? হামার উপর বোড্ড রাগ করিয়েছিস্, না?'

আমিনা যে তাদের এত শীঘ্র ক্ষমা করবে, তা করিম বা ছেদি আদপেই আশা করে নি। এমন কি সাহস করে তারা আমিনার দিকে তাকাতেও পারছিল না। আমিনার এই অপ্রত্যাশিত অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে করিম সোহাগভরে আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার চোখে কপালে চার-পাঁচটা চুমা এঁকে দিয়ে বলল, 'গোস্তাকি তো হামি করিয়েছি। লেকেন তু সে হামাকে মাফ করিয়েছিস তো?'

আমিনার মত মেয়েরা প্রতিশোধ নিতে যেমন জানে, তেমনি তারা অপরাধী মানুষকে ক্ষমা করতেও পারে। কিন্তু এই প্রশ্ন এখানে আদপেই ওঠে না। এত শীঘ্র যে করিম তার কাছে ফিরে আসবে তা তার আশাতীত ছিল। তাই উত্তরে আমিনাও করিমকে ভাল-মন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর তার বলা হয়ে উঠল না। আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে জড়াজড়িতে ধড়াস করে তারা মেঝের উপর পড়ে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন হল না।

এদের এই আবেগের আতিশয্যে ছেদি বিব্রত হয়ে উঠছিল। সে এইবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, 'আরে এ কেয়া তাজ্জব! এ তুলোক—'

কিন্তু এই বিষয়ে করিমের কোনও লজ্জা সরমের বালাই ছিল না। তাই উত্তরে করিম ধমকে উঠে ছেদিকে বলল, 'এবে তু শালা আঁখ বুদ্।'

আমিনা ও করিমের প্রেম যে এত শীঘ্র এমন নিবিড় হয়ে উঠবে তা ছেদির ধারণার বাইরে ছিল। বেগতিক দেখে ছেদি মেঝে থেকে একটা ছেঁড়া কম্বল উঠিয়ে নিয়ে নিজের দেহটা তা দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে রোলারের মত গড়াতে গড়াতে বলল, 'আচ্ছা, হামি রোলার বানিয়ে গেছি। তুলোক উপরে বৈঠে গল্প কর। হাম্‌মি তোদের বাত্‌চিত্‌ শুনবে, লেকেন কুচ্ছু দেখবে না।'

ছেদির কাণ্ড দেখে আমিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। করিম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ছেদিকে একটা পায়ের ঠোক্কর দিয়ে বলল, 'এই ওঠ্‌, জলদি ওঠ্‌।'

এই ভাবে মাটির উপর ছেদির বেশীক্ষণ পড়ে থাকার ইচ্ছে ছিল না। তাই করিমের পায়ের ঠোক্কর খেয়ে ছেদি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে উত্তর করল, 'শা, তো ভারি—'

আমিনা এইবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে লক্ষ্য করলো যে, করিম ও ছেদি ধাক্কাধাক্কি করতে করতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ততক্ষণে আমিনাও মাটির দেওয়াল ধরে উঠে পড়েছিল। কিন্তু তার মনের সেই আবেগ তখনও কাটে নি। তার মনে হচ্ছিল এরা দুজনাই যেন তার কত আপনার। এদের কাউকেই সে আজ ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সে এইবার এক হাতে করিমের ও আর এক হাতে ছেদির গলা জড়িয়ে ধরে শূন্যের উপর একটু তুলে নিয়ে বলল, 'আয়, আভি কুছু খাবি আয়। হামি সে-এ—'

করিমের কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই দুইয়ের মূল্য ছিল সমান। বর্তমানকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করে সে ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়িয়েছে। আমিনাকে সোহাগ করলেও চামেলীকে সে ভোলে নি। দাওয়ার একধারে চট দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় আমিনা রসুই করত। রসুইখানার দিকে যেতে যেতে করিম আমিনাকে বলল, 'খাইয়ে লিয়ে হামি লোক সে একটু নিকাল যাবে।'

আমিনার কিন্তু করিমের অভিসন্ধি সম্বন্ধে অতসত ভেবে দেখবার সময় ছিল না। আকাঙ্ক্ষিত মিলনের এই শুভ মুহূর্তটি সে বৃথা নষ্ট করতে দিতে রাজী নয়। আমিনা ছেদি ও করিমের কাঁধে ভর দিয়ে আর একবার একটু তুলে নিল, তারপর সহজভাবে মাটির উপর দাঁড়িয়ে পড়ে সে উত্তর করল, 'আরে, তুলোক কহত কি? আভি তো আইলি, ফিন্‌ সে কুথা যাবি? হামি তুহদের খোড়াই যানে দিবে।'

মনের অভিধান হতে করিম আমিনাকে বুঝাবার জন্য কয়েকটি বাছা বাছা মিথ্যে কথা তুলে রেখেছিল। তবুও করিম আমিনার এই প্রশ্নের উত্তরে আজ আর হুবুহু মিথ্যা কথা বলতে পারল না। কথাগুলো যেন মুখ থেকে তার আর বার হতেই চায় না। সে এইবার আমতা আমতা করে উত্তর করল, 'সে একঠো বড় কামকো বন্দোবস্ত আছে। বহুত রূপেয়া কো— ও—'

প্রেমের তড়িৎপ্রবাহ মেয়েদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু স্তিমিত করে দেয়। এর ফলে সাময়িক ভাবে তাদের বিবেচনা শক্তির হানি ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়া মাত্র তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা পুনরায় তাদের মধ্যে ফিরে আসে। এতক্ষণে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমিনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে করিমের দিকে একটু চেয়ে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি চুরি কো, না! হুঁ, বুঝিয়ে হামি সব লিয়েছি, তু সে চামেলী বিবিকো— সে—'

আমিনা আর কথা বলতে পারল না, তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। আমিনার চোখে জল দেখে করিম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিছল। কিন্তু এতদূর এগিয়ে আর ফেরা যায় না। তাই কোনও রকমে মাথা নীচু করে সে উত্তর করল, 'আরে সে চুরি তো উ চামেলীকোই বাড়িমে হোবে। বেটী কো সে বহুত জহরৎ—'

আমিনা ভালোরূপেই জানত যে পকেটমারেরা বাড়ির চুরি করে না। সে সহজেই বুঝে নিল করিম বেকায়দায় পড়ে মিথ্যা বলছে। তবে সে এও জানত যে করিমকে আটক রাখার চেষ্টা নিরর্থক। তাই সে চোখের জলটা আঁচল দিয়ে মুছে নিতে নিতে উত্তর করল, 'আচ্ছা তবে যা, খাইয়ে লিয়ে যা। লেকেন্ জলদি জলদি আসিস্।'

আমিনার এই অপ্রত্যাশিত উদারতায় করিমের মত নির্মম লোকেরও মনটা একটু ভিজে গেল। উত্তরে করিম আমিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার উপযুক্ত মনের মত কোনও ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন সময় ছেদি এক লাফে খানিকটা পিছিয়ে এসে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'আরে এ পুলিস।'

করিম সভয়ে চেয়ে দেখল যে, তাদের দরজার সামনে একজন পুলিসের জমাদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুক-পকেটে তার একরাশ কাগজ। একটা ছোট খেঁটে লাঠি হাতে দরজার সেই চটের পর্দাটা একটু সরিয়ে সে উঁকি দিচ্ছে।

করিমও সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে ছেদির পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে জড়াজড়ি করে উলটোতে পালটাতে আরও পিছিয়ে এসে আমিনার ঘরের ভিতরকার তক্তপোশের তলায় আত্মগোপন করতে করতে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, 'সাবড়েছে রে শালে—'

অকাজ কুকাজে হাত না পাকালেও প্রত্যুৎপন্নমতিতে আমিনা করিম ও ছেদির চেয়ে কম যায় না। চোর ডাকাত নিয়ে যারা ঘর করে তাদের সময়ে অসময়ে এদের একটু-আধটু সাহায্য করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। দুয়ারের কাছে পুলিস দেখা মাত্র আমিনা আপন কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিল। ছেদি ও করিম ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিনাও ছুটে এসে ঘরটার শিকলটা সাবধানে তুলে দিয়ে দরজার বাইরে এগিয়ে এসে জমাদারকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করল, 'আরে তু কোন্? হিঁয়া কেয়া মাঙ্গতে হো?'

আমিনার এই ঝাঁঝালো প্রশ্নে জমাদার সাহেব বেশ একটু ভড়কে গিয়েছিল। আর পাঁচজনের মত বিনা ওয়ারেণ্টে কোন গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশের স্পর্ধা সেও রাখে না। পুলিস হলেও ভব্যতার জ্ঞান তখন পর্যন্ত সে হারায় নি। জমাদার শুধু আমিনাকেই দেখেছিল। ছেদি ও করিমকে সে দেখতে পায়নি। তাই সে একটু কিন্তু কিন্তু করে আমিনাকে জিজ্ঞেস করলো, 'হামরা খবোর থে কি করিম বোলকে একটো দাগি হিঁয়া রয়তা। আপ জানতা উ আদমী কাঁহাপর হ্যায়?'

আমিনা জানতো যে ভয় পেলে পুলিসের লোকেরা আরও ভয় দেখিয়ে থাকে। তাই তার এই নির্ভীক ভাব শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার দরকার ছিল। উত্তরে আমিনা এইবার ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'চোর ডাকুকো বাত হামি কি জানে। এ গিরোস্থকো মোকাম হ্যায়। আভি মর্দানা লোক ইঁহিপর নেহি আছে। আপ ইঁহা ঘুঁষবে ত হাম আভি চিল্লাবে। ইসব পর্দানশীল জেনানা লোককো কুঠি। আপ ইঁহিপর কাহে আয়া।'

'আরে আপ এ কেয়া বোলতা? এ গিরোস্থকো কুঠি হ্যায়!' আমিনার কথায় জমাদার সসম্ভ্রমে পিছিয়ে এসে বলল, 'মাপ কিজিয়ে মায়ি। হাম সমঝেথি কি এ এক মামুলি কুঠি আছে। হামরা বিলকুল ঝুটা পাত্তা মিলি থে।'

করিম জমাদারের থানায় রেজেস্টারী দাগী। বহুদিন থেকেই সে গরহাজির ছিল। প্রায় এক বছর আগে তার শেষ জেল হয় ছ' মাসের জন্য। জেল থেকে ছুটে আসার পর তার আর কোন পাত্তা পুলিস পায় নি।

উপরওয়ালার আদেশে জমাদার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। খোঁজও সে ঠিকই পেয়েছিল, কিন্তু আমিনার ধাপ্পাবাজীতে ভড়কে গিয়ে তার সকল প্রচেষ্টাই ভেস্তে গেল।

জমাদারকে এইভাবে ভড়কাতে দেখে আমিনা বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গেই উত্তর করল, 'ঠিক হ্যায় বেটা। ইসমে কোহি বাত নেহি। কুছু জরুরি কাম রহে ত বিহানমে আ যাও। উসবখৎ মেরা আদমী ভি আ যায়গে।'

মানুষ আচমকা ভড়কে গেলে তার মস্তিষ্ক বোধহয় আর কার্যকর থাকে না। এই সময় তার মন অত্যধিকরূপে বাক্-প্রয়োগশীল হয়ে যায়। এ ছাড়া আমিনার ঢলঢলে মুখটা দেখে জমাদারের তাকে একজন গৃহস্থ নারী বলেই মনে হয়েছিল। এক কথায় জমাদার আমিনার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছিল। এইজন্য সে এর আর কোন প্রতিবাদ না করে বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল, বোধহয় তার ইনফরমারকে এই সব ঝুটা খবর দেওয়ার জন্য দশটা গালিগালাজ করতে করতে।

জমাদার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমিনা ছুটে গিয়ে ঘরের দরজার শিকলটা খুলে দিল। করিম ও ছেদি ঘরের ভেতর থেকেই আমিনার সেই কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিল। দরজা খুলে দিতেই করিম ছেদির সঙ্গে বেরিয়ে এসে আদর করে আমিনার গালটা একটু নেড়ে দিয়ে বলল, 'তু সে একদম শয়তান আছিস। বাঃ—'

আমিনা তখন নিজের কৃতিত্বের কথা ভেবে নিজেই মশগুল হয়ে গিয়েছে। এত সহজে যে পুলিসকে বোকা বানাতে পারবে তা সে নিজেও ভাবে নি। তাই এই ব্যাপারে অপরের প্রশংসার সে তোয়াক্কাই রাখে না। নিদেন পক্ষে আজ সে করিম ও ছেদির চেয়ে তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব তো প্রমাণ করতে পেরেছে। সে এবার অনুকম্পার দৃষ্টিতে একবার করিমের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর একজন বিজয়ী বীর নারীর মতো ঘাড় বেঁকিয়ে আমিনা সোহাগ করে বলল, 'ধরিয়ে লিয়ে যেত ত বেশ হত।'

'তাতে তুহরি লোকসান হত,' করিম আমতা আমতা করে উত্তর করল, 'জেল হামি ত বহুত দফে খাটিয়েছি, আউর এক দফে খাটিয়ে লিতাম। আউর কি!'

'বহুত তো বোলছিস, আভি খাবি চোল,' আমিনা সোহাগভরে করিমের দিকে চেয়ে বলল, 'সে চামেলী হোত ত আভি—হাঁ—'

চামেলীর নামে করিম আবার গম্ভীর হয়ে গেল। ভুলে গেল সে আমিনার সোহাগ ও ভালবাসা। অদূরে চৌকির উপর রাখা পোশাকের সেই পুঁটলিটার দিকে একবার চেয়ে দেখে সে একটু অন্যমনস্ক হল, তারপর সে ছেদির দিকে একবার চোখের ইশারা করে উত্তর করল, 'তু তো চামেলী আছিস না, তু আমিনা আছিস। বোল, আভি খানা কুথা আছে, বোল্।'

করিম আপন মনে গরসের পর গরস ভাত গিলে যাচ্ছিল, ভাল করে সেগুলো চিবোবারও তার আজ সময় নেই। সারা চিত্তটি তার সেই নূতন প্ল্যানের ভাবনাতেই বিভোর। তার ডান হাতখানি গরসের পর গরস ভোজ্যদ্রব্য মুখবিবরে তুলে দিলেও, সেই তুলে দেওয়ার খবর তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত আর পৌছে উঠছিল না। কখন যে খাবারের থালি শূন্য হয়ে গেছে, সেদিকে করিমের একেবারেই খেয়াল নেই। এইবার হঠাৎ চমকে উঠে করিম শুনল, আমিনা বলছে, 'কিরে, আউর কুছু লিবি? শুনত না?'

করিমের মন তখন আর এক চিন্তায় ভরপুর। চুরি করার ইচ্ছার ন্যায় এই ইচ্ছাও তার কাছে সমান ভাবে অদম্য। একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাকে পুরাপুরি পেয়ে বসেছে। পুরাকালীন ধর্মীয় ডাকের ন্যায় এর তাগিদে সেও নিমেষে আজ ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত। আমিনার এই কথায় করিম তার ডান হাতটা বার কয়েক জিব দিয়ে চেটে নিয়ে উত্তর করল, 'না, পানি দে, ধুইয়ে লি। আভি হামকো সে নিকালতে হবে।'

আমিনা এইবার ভেঙ্‌চে উঠে উত্তর করল, 'সে নিকালতে তো হোবে—বেইমান।' তারপর সে কানাভাঙা পিতলের একটা ঘটি টোল-খাওয়া একটা বালতির মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে সেই জলভরা ঘটিটা দুম করে দাওয়ার উপর নামিয়ে রেখে বলে উঠল, 'লে-এ, লিজে লিয়ে লে।'

কথা ক'টা বলে আমিনা ঠিকরে চলে আসছিল। করিম তাড়াতাড়ি তার বাম হাতখানা ধরে ফেলে উত্তর করল, 'আরে এতনা গোঁসা! তা যাওত কুথা?'

একটা দারুণ বিতৃষ্ণা আমিনা এতক্ষণ নাচার হয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে চেপে রেখেছিল, কিন্তু তার অন্তরের সেই গভীর বেদনা এরকম ভাবে চেপে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। তার নারীত্বের প্রতি করিমের এই সহজ অবহেলা ক্রমেই তার সহ্যের বাইরে এসে পড়ছিল। আমিনা এইবার সজোরে তার হাতখানা করিমের মুঠোর মধ্য থেকে মুক্ত

করে নিয়ে সামনের একটা কুঠরির মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, 'যাতা হাম জাহান্নামে—'

ছেদির তখনও খাওয়া শেষ হয় নি। সে খেতে খেতে বিক্ষুব্ধ হয়ে আমিনাকে ঐ রকম ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে করিমকে বলল, 'তু শালে কি জানোয়ার আছিস্,—এঁ্যা? যা, আভি উনকো গোড় পাকোড়।'

উত্তরে করিম ছেদিকে বলল, 'আরে থাম্। উ মেইয়া মানুষকো গোঁসা বহুৎ দেখিয়েছি। আভি আকে উ—'

দ্বিধাহীন চিত্তেই করিম তার আচমনের কাজ শেষ করল ও তারপর দাওয়ার উপরকার একটা চৌকি থেকে তাদের সেই কাপড়ের পুঁটলিটা একটানে উঠিয়ে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল। এদিকে ছেদি বাইরের দাওয়ায় আঁচাতে আঁচাতে ভিতরের দিকে চেয়ে দেখল, করিম তার জরির পাগড়ি, লম্বা সাটিন কোট, ঢিলে পায়জামা ও শুঁড়ওয়ালা লপেটা জুতো জোড়াটা পরতে পরতে হুবহু দিঘাপতিকা কুমার সাহেব বনে উঠছে।

আর সময় নষ্ট করতে করিম একেবারেই নারাজ ছিল। আত্মাকে কষ্ট দিতে সে একেবারেই রাজী নয়। আত্মার তৃপ্তির জন্য যে কোনও বিপদ বা ক্ষতি বরণ করতে সে প্রস্তুত। ছেদিকে হাঁ করে তার বেশভূষার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, করিম বিরক্ত হয়ে তাকে বলল, 'বুড়বাককো মাফিক দেখিস কি? জেনানা আছিস নাকি? জলদি জলদি পিনিয়ে লে।'

ছেদি করিমের কথায় আর কোন উত্তর করল না। সে ধীরে ধীরে চোখ তুলে আমিনার ঘরের দিকে একবার লজ্জিতভাবে চেয়ে দেখল। তারপর সেও নিঃশব্দে সেই পুঁটলি থেকে তার জরির গোল টুপি, ঘুন্টিবাঁধা কোর্তা, দেশী কাপড় ও নাগরা জুতো জোড়া তুলে নিয়ে সেগুলো একে একে পরে ফেলল।

পোশাক পরা শেষ করেও ছেদি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথাই তার মুখ থেকে আর বার হয় না। কিন্তু করিমের মধ্যে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নাই। কাটা কাটা তার কথা, সহজ সরল তার কাজের গতি। ছেদিকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে করিম বলে উঠল, 'তু কি রে! ভাবিস কি? সে ত ঠিক ম্যানজার বানিয়ে গেছিস। চোল আভি, সে বেটিকো—'

পুঁটলি বাঁধা চাদরখানার ওপর আমিনার জন্য কেনা দামী শাড়িখানা পড়েছিল। নিজেরই পোশাকের জাঁকজমকে করিম নিজেই আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। তাই সেই দামী কাপড়খানা আমিনার জন্য করিম নিজে কিনলেও

সেদিকে তখন আর তার খেয়াল ছিল না। করিমের কথার উত্তরে ছেদি তাকে সেই কাপড়খানা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'উ কাপড়টো কি হোবে? আমিনাকে তু সে দিবি না?'

এতক্ষণে করিমের নজর ঐ কাপড়খানার উপর গিয়ে পড়ল। করিম কিছুক্ষণ কাপড়খানার দিকে চেয়ে কি ভাবল। আমিনাকে উপহার দিয়ে তাকে কিছুটা শান্ত করার মতলবেই করিম এই শাড়িখানা কিনেছিল। কিন্তু চামেলীকে যদি এখুনি একটা উপহার দেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি আবার একটা শাড়ি কিনে আনা কি সম্ভব হবে? আমিনা তো ঘরের লোক আছে। তাকে একটা কিছু পরে কিনে দিলেই তো হবে। এইরূপ সম্ভাব্য কয়েকটা কথা ভেবে করিম তাড়াতাড়ি সেই কাপড়খানা উঠিয়ে নিয়ে বগলের মধ্যে সেটা লুকিয়ে ফেললে।

কাপড়খানা এইভাবে করিমকে লুকিয়ে ফেলতে দেখে ছেদি প্রতিবাদ করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে করিম ঠোঁটের উপর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তাকে বলল, 'চুপ! আমিনাকে দোসরা একটা দিবে।'

করিমের মনের এই পরিবর্তিত ভাব ছেদির কাছেও খুবই অস্বাভাবিক ও অবান্তরের মতই মনে হল। ছেদি কিছুতেই করিমের এই ব্যবহার বরদাস্ত করতে পারল না। সে সজোরে করিমের বগল থেকে কাপড়খানা ছিনিয়ে নিয়ে উত্তর করল, 'বেইমানি করিয়ে তু বিলকুল বেইমান্ হয়েছিস্। তুহর মাফিক্ বেইমানকো সাথি হামি নাহি হোবে। হামি আভি সে সর্দারকো পাশ—আউর্—।'

'আউর্ কেয়া রে? সর্দার তুহ্কো ছোড়িয়ে দিবে? মুফৎ মে?' নির্বিকার চিত্তে করিম উত্তর করল, 'আরে কোহি নেহি 'তুকো ছোড়বে। সর্দার ভি নেহি, পুলিস ভি নেহি।'

করিম ও ছেদির এই কথা কাটাকাটির সবটাই আমিনা তার ঘরের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছিল। সে হঠাৎ তাদের সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এল। তারপর করিমের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি ভেবে সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমিনাকে সামনাসামনি দেখে করিমের যেন একটু ভাবান্তর হল। তারপর ছেদির সেই কড়া-কড়া কথা ও তার রুক্ষ প্রতিবাদ তাকে একটু নরম

করে দিয়েছিল। করিম ছেদিকে টেনে নিয়ে আমিনার পিছু পিছু তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ও তারপর ছেদির হাত থেকে সেই কাপড়খানা তুলে নিয়ে সে আমিনার হাতের মধ্যে সেটা গুঁজে দিল।

অবহেলার চেয়ে বড় অপমান মেয়েরা বোধহয় কল্পনাও করতে পারে না। এই অবহেলা মেয়েদের বাঘিনীদের চেয়েও নির্মম ও হিংস্র করে তোলে। এই অবস্থায় পড়ে কেউ কেউ প্রতিহিংসাপরায়ণাও হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া পরের জন্যে কেনা কাপড় সে নেবেই বা কেন? তাই আমিনা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কাপড়খানা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে কিছু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে এসে প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'আবি, নেহি নেহি। এ কাপড়া হামি নেহি লিবে।'

করিম আমিনার কাছ থেকে এই রকমই একটা কিছু আশা করছিল। সে তাড়াতাড়ি আমিনার হাতখানা ধরে ফেলে বলে উঠল, 'আরে—কাপড়া তু তো নেহি লিবে, লেকিন চুমা তো একটা লিবে।'

আমিনা ঝটকান দিয়ে করিমের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে উত্তর করল, 'যাও, হামকো মাৎ ছুঁয়ো, ভাগো-ও হিঁয়াসে।'

ভাগো বললেই যে ভেগে যাবে, সে পাত্র করিম ছিল না। সে ছুটে গিয়ে আমিনাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিল। আমিনা প্রাণপণে করিমকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু করিম তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে তার মুখটা চুমায় চুমায় ভরে দিল। তারপর নিজের আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করে দিয়ে করিম আমিনাকে তার খাটিয়ার দিকে ঠেলে দিয়ে ছেড়ে দিল। আমিনার পিছনটা দড়াম করে খাটিয়ার উপর গেল ঠুকে।

পিঠের ভর খাঠিয়ার উপর রেখে আমিনা রুদ্ধ আক্রোশে হাঁপাচ্ছিল। একবার তার মনে হল যে, সে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু পড়শীদের কাছে খাম্‌কা বেকুব বনবার ইচ্ছা তার ছিল না। তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও আমিনা চেঁচাতে পারল না।

করিম আমিনার মনের ভাব ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। এত সব বোঝ-বার চেষ্টা করবে কেন? এই সব বুঝাবুঝির ঝামেলা করিমের কোনও দিন পোষায় নি। এ সব বাজে ঝামেলা তার কাছে ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সে আমিনার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও তারপর হেসে বলে উঠল, 'যো লিবার হামি সে লিয়ে লিয়েছি। আভি তুহর ইচ্ছে হয় তো যাতি পারিস।'

ছেদি এতক্ষণ নির্বাক ভাবে আমিনার প্রতি করিমের এই ব্যবহার লক্ষ্য করছিল। এইবার প্রতিবাদ করে সে করিমকে কি একটা কড়া কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু তাকে কিছু বলতে না দিয়ে করিম তার হাতখানা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বার করে আনল। কাচ-পোকার খপ্পরে-পড়া আরশুলার মত ছেদি নির্বাক হয়ে করিমের অনুসরণ করল। করিম তার বন্ধু ছেদিকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেদির পা যেন এইদিন আর সামনের দিকে এগুতে চায় না। হঠাৎ গলিটার মাঝ বরাবর এসে জোর করে ছেদি দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বিরক্ত হয়ে করিম ছেদিকে বলল, 'তু কি চাস বল তো? আমিনাকে চাস? তু লিবি তাকে?'

আমিনার উপর ছেদির যে বেশ একটু দুর্বলতা আছে তা আজ আর কারুর অজানা নেই। কিন্তু নিজেদের এই ধরনের দুর্বলতা চেপে রাখার একমাত্র উপায় ক্ষেপে উঠে তার প্রতিবাদ করা। তাই করিমের এই কথার উত্তরে ছেদি ধমক দিয়ে করিমকে বলল, 'খবরদার! মুখ সামালকে বাত করো। তুহোর মত হামি বেইমান না আছে।'

পকেট থেকে আর এক পুরিয়া কোকেন পানের সঙ্গে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে করিম উত্তর করল, 'আরে, এতনা ছোট বাতমে তু চটিস কেন? আমিনাকে তু মহব্বৎ করিস। ই বাত তুহভি জানে, হামভি জানে। আউর আমিনাভি জানে। ইসমে তুহর সরম কি আছে রে?'

ছেদি আরও চটে গিয়ে প্রতিবাদের সুরে আরও কয়েকটা কড়া কথা করিমকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা আর তার বলা হল না। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল বস্তির পাশে সেই একতলা কোঠা বাড়ির বাঙ্গালী মাস্টারটা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে আমিনাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। এই সময় মাস্টারকে ওই ভাবে আমিনাদের বাড়ির দিকেই যেতে দেখে ছেদি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে ভ্রূ কুঁচকে করিমকে ইশারায় সেই মাস্টারকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'আরে—এ। এ তো সেই মাস্টার আছে। এতো দিন বাদ আবার ই কুতা থেকে আইল।'

করিম মাস্টারের দিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'এ তো সেই বাঙালী। সেই মাস্টার আছে।'

মাস্টারকে সেখানে দেখে করিমের মত ছেদিও অবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

চোখ দুটো গোল করে ছেদি উত্তরে বলল, 'তাজ্জব কো বাত! কেয়া মাঙতা উ।'

মাস্টার ততক্ষণে আমিনাদের বাড়ির দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। করিম হঠাৎ এইবার লক্ষ্য করল যে, মাস্টার দরজার পর্দাটা একটু ফাঁক করে ভিতরে কি একটা যেন দেখবার চেষ্টা করছে। এর পর করিমের দিক থেকে চুপ করে থাকা আর সম্ভব হল না। সে ফস্ করে পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে সেটা খুলে ফেলল, তারপরে সে তার সেই ধারালো ছুরিখানা উঁচু করে ধরে বলল, 'আও, শা—কে—'

এই বাঙালী মাস্টারটা যে একজন বদমাস লোক তা ছেদির ভাল করেই জানা ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ছেদির আমিনার উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাই করিমের এই কথার উত্তরে ছেদি বলল, 'আরে রহো, বেইমান তু ভি আছিস। পয়লা দেখ তো তু! পাছু যো কুছ হোয় কিয়া যাবে। ছুরি লেকে কি করবে আভি, তু।'

করিমের রক্ত ততক্ষণে টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে, তাই ক্রুদ্ধস্বরে করিম উত্তর করল, 'দোনকো সে উড়িয়ে দেবে।'

কথা কয়টা বলে করিম ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে যাচ্ছিল। ছেদি তাকে তাড়াতাড়ি আটকে ফেলে একটু আড়ালের দিকে জোর করেই টেনে নিয়ে এল। তারপর অবিশ্বাসের একটা ম্লান হাসি হেসে গম্ভীরভাবে ছেদি বলে উঠল, 'পয়লা দেখিয়ে তো লে? সে বিশ্বাস তো হোয় না!'

বস্তির অংশ-বিশেষের আড়াল থেকে ছেদি ও করিম লক্ষ্য করল, মাস্টারের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আমিনা বেরিয়ে এল। আমিনাকে বেরিয়ে আসতে দেখে করিম আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ঝোঁকের মাথায় আবার এগিয়ে যেতে চাইলে ছেদি তাকে জোর করে আঁকড়ে ধরে, পিছনের দিকে আরও খানিকটা টেনে এনে বলে উঠল, 'খবরদার—চুপ।'

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এবার করিম ছেদির কথার অবাধ্য হল না, সে চুপ করেই সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। সেখান থেকে তারা স্পষ্ট শুনতে পেল, মাস্টারকে দেখে সবিস্ময়ে আমিনা বলছে, 'আরে, তু হিঁয়া পর! কেয়া মাঙতা তু?'

মাস্টারের অনেক কথাই বলবার ছিল। সে বলতে চাইল যে, সে তিন মাস পরে দেশ থেকে ফিরেছে। তাকে কিছুতেই সে ভুলতে পারে নি, এমনি

কত কি কথা। কিন্তু বস্তির সেই আবহাওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনও কথাই সে বলতে পারল না। সরাসরি তার মুখ দিয়ে মাত্র একটা কথা বেরিয়ে এল, 'তুহকে মেরি জান।'

এই পাগলা মাস্টারকে খামকা সেইখানে দেখে করিম ও ছেদির মত আমিনাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এদিকে এইদিন মনটাও তার ভাল নেই। পরাজয়ের একটা গ্লানি থেকে থেকে তাকে উত্যক্ত করে তুলছে। মাস্টারের কথায় আমিনার মুখটা পাংশু আকার ধারণ করল, মুখে তার দেখা গেল ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ও বিরক্তি। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আমিনা মাস্টারকে বলল, 'হামাকে! তুহকে সে বলিয়ে দিয়েছি না, হামার পাশ মাৎ আও। যাও, ভাগো, ভাগো—ও—'

মাস্টার তখনও মদের নেশায় মশগুল। ঘরে বসে পেগ খেতে খেতে হঠাৎ তার আমিনার কথা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে আমিনাদের বাড়ির দিকে। আমিনার যৌবন-উচ্ছলিত দেহের সেই নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে মাস্টার বলে উঠল, 'হামি সে মাস্টার আছি। তু হামকে চিনছোস না?'

আমিনার মনমেজাজ সত্যসত্যই এইদিন খারাপ ছিল। অপমানের পর অপমান সে আর সহ্য করতে পারে না। আমিনা আর সহ্য করতে পারল না। মাস্টারকে বেশ একটু শিক্ষা দেবার তার ইচ্ছা হল। সে মাস্টারকে চমকে দিয়ে অতর্কিতে চিৎকার করতে শুরু করে দিলে, 'আরে-এ লছমি মায়ি, বাড়িওযালে-এ, ভাঁওজী-ই হো—'

বস্তির লছমী সর্দারনী কিছু দূরেই তাল তাল গোবর নিয়ে বস্তির দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল! সেখান থেকেই সে উত্তর করল, 'আরে-এ এ আমিনা! আরে হুয়া কেয়া, তু এতনা চিল্লাচ্ছিস কেন?'

আমিনা তেমনি জোরে চিৎকার করে উত্তর করল, 'এক বদমাস আকে, হামকো-ও, বে-ইজ্জতি-ই করতি-ই।'

আমিনার চেঁচামেচিতে চালের উপর থেকে একটা মোরগ হুঙ্কার দিয়ে ডেকে উঠল, 'কোঁকর কোঁও—' ওদিকে লছমী আমিনাকে অভয় দিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উত্তর করল, 'আরে ডরো-ও মাৎ। হামি-ই আতা-আ—'

ব্যাপার দেখে মাস্টার সরে পড়তে যাচ্ছিল। নেশাও তার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু সরে পড়া তার আর হয়ে উঠল না। সামনেই

রুদ্রমূর্তিতে লছমনিয়াকে দেখা গেল। লছমী সর্দারনী আর কোনও কথা কাউকে জিজ্ঞেস না করে হাতের গোবরের বড় তালটা মাস্টারের মুখের উপর ছুঁড়ে দিল ও তারপর সে রক্তচক্ষু করে বলে উঠল, 'তুহর নানী আছি হাম। হামি লছ—হামকো।'

মাস্টারের মুখ, জামা ও গা গোবরে বোঝাই হয়ে গিছল। গোবরের ঝাপটা খেয়ে চোখেও সে আর ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। কোনও রকমে হাত দিয়ে চোখের উপরকার গোবরটা পুঁছে ফেলে সে দেখতে পেল, লছমী সর্দারনী তাকে আরও শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে দেওয়াল থেকে একটা গরানের খুঁটি ওপড়াবার চেষ্টা করছে।

ব্যাপার দেখে মাস্টার সেখানে তিলমাত্র আর না দাঁড়িয়ে সোজা সামনের পথটার উপর দিয়েই দৌড় দিল। কিন্তু এখানেও মাস্টারের কপাল ছিল মন্দ। কিছু দূর যেতে না যেতেই আবার ছেদি ও করিম তাদের সেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মাস্টারকে ধরে ফেললে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরে খোলা ছুরিখানা তুলে ধরে করিম তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'শালে—' কিন্তু পরে আবার সে অন্য কি একটা ভেবে বলল, 'কেয়া হ্যায় তোমরা পাশ লে আও।'

মাস্টার কাঁপতে কাঁপতে পকেট হতে তার মানিব্যাগটা বার করে সেটা করিমের হাতে তুলে দিল। এই রকম একটা বেল্লিক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতেও করিমের বোধহয় ঘৃণা হচ্ছিল। মানিব্যাগটা খুলে ভিতরের টাকাটা দেখে নিয়ে করিম টাকাশুদ্ধ ব্যাগটা দূরের একটা চালের উপর ফেলে দিলে। তারপর সে মাস্টারের মাথায় সজোরে একটা চাঁটি কষিয়ে বলল, 'এবে-শালা ভাগ।'

মাস্টার সসম্মানে ভেগেই যাচ্ছিল। কিন্তু তাতে বাদ সাধল ছেদি। করিম তাকে ছেড়ে দিলেও ছেদি ছাড়ল না। ছেদি মাস্টারকে আবার ধরে ফেলে করিমকে বলল, 'তু রহ হিঁয়ে; হামি আভি আতে।' তারপর সে করিমকে উত্তরে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই মাস্টারকে টানতে টানতে একেবারে আমিনার কাছে হাজির করল। আমিনা তখনও পর্যন্ত রাগে গরগর করতে করতে তাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ছেদি মাস্টারকে ধাক্কা দিয়ে আমিনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'ই তেরি মা আছে শালে—বোল্, মা বোল্। বোল মা।'

হঠাৎ মাস্টারকে পাকড়ে নিয়ে ছেদিকে তার কাছে ফিরে আসতে দেখে আমিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেদির দিকে একবার চেয়ে দেখল। এদিকে জাঁতাকলে ইঁদুর পড়ার মত মাস্টারের অবস্থা হয়েছে। এখানে আমিনার দয়া ছাড়া তার অন্য আর কোনও উপায় নেই। মাস্টার তখন পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল। আমিনা তাড়াতাড়ি ছেদির কবল থেকে তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কাঁহে ইসকো টাং করতা? ইসকো কুছ কসুর নেহী। ছোড় দেও ইসকো।'

অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পেয়ে মাস্টার টলতে টলতে চলে গেল। মাস্টার চলে গেলে আমিনা ছেদির দিকে একবার চেয়ে দেখল। ছেদি লজ্জায় ও ক্ষোভে মুখ নীচু করল, আমিনাকে কোনও কথা সে বলতে পারল না।

অনেকক্ষণ ধরে ছেদি আর কোনও কথা বলতে পারছিল না। ছেদি চুপ করে থাকায় আমিনা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুহর সে দোস্ত কোথা? চামেলীকো কুঠিমে যায়েঁ।'

ছেদি আমিনার প্রতি বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিল। আশ্বাসের ভঙ্গিতে ছেদি আমিনার এই প্রশ্নের উত্তর করল, 'তু সে ঘাবড়াস না! ইহিপর হামি ফিন উনকে লিয়ে আসবে। তু ভাই দুখ-উখ না করিস।'

আমিনার একবার মনে হল যে ছেদি বোধহয় শুধু তাকে আর একবার দেখে যাবার জন্যেই সেখানে ছুতা করে ফিরে এসেছে। তবু আমিনা তখনকার মত ছেদির এই সব কথার কোন সুস্পষ্ট উত্তর দিল না। সে ঠিকরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। তারপর দরজাটা বন্ধ করতে করতে উত্তর করল, 'উনকে মেরি কুছু জরুরত না আছে। হামি কহিকো নেহি মাঙতে। তুকো ভি নেহি, উসকো ভি নেহি।'

আমিনা চলে গেলে ছেদি সেই বন্ধ দুয়ারটার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে এসে বড় রাস্তায় দাঁড়াল। মোড়ের উপরই করিম ছেদির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোকেন-দেওয়া পান চিবাচ্ছিল! সে ছেদির পিঠের উপর একটা চাপড় বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমিনা তোকে কুছু বোল্‌ল?'

ছেদি করিমের কাছ থেকে একটা কোকেন-দেওয়া পান নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে পানটা চিবুতে চিবুতে উত্তর করল, 'বোল্‌ল তুহকে সে নাহি মাঙতে।'

করিম ডান হাতখানা ছেদির কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে উত্তর করল, 'আরে, যানে দেও উসব জানানা লোককো বাত। আভি দো-তিন ঘণ্টাকো বাস্তে হামি ভি উসকে নাহি মাঙতে। আও তো আভি সে চামেলিয়াকো কুঠিমে।'

১২

বেলা বোধহয় তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। অফিসাররা সকলেই যে যার কাজ সেরে স্নান আহার করবার জন্য উপরে উঠে গেছে। কিন্তু প্রণব তখনও আপন মনে কাজ করে যাচ্ছিল। উসকো-খুস্কো তার চুল। মনটাও যে তার খুব সুস্থ ছিল তা নয়। ডাইরীর পাতার উপর পেনসিলের শেষ আঁচড়টা টেনে নিয়ে প্রণব উপরের দিকে মুখ তুলে চাইল। হাতের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তার উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কোণের টেবিলে মাত্র একজন নিম্নতম কর্মচারী তখনও অফিস-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। প্রণবকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি স্যার, খেতে যাবেন না?'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রণব বিষণ্ণ মনে কি ভাবছিল। থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল তার মন। এই বাবুটির কথা ক'টা তাই একেবারেই তার কানে গেল না। সকাল থেকে তার অবসর সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তটিতে কিসের একটা ব্যথায় তার মনটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল প্রগতির বাপের সেই দিনকার সেই শেষ কথাটা। প্রণব বিরক্ত হয়ে নিজের মনে নিজেকেই বলে উঠল, 'দ্যুৎ।' তারপর বোধহয় আরও কিছু কাজ করবার জন্য নতুন একটা কাগজের তাড়া কোলের কাছে টেনে নিল।

প্রণবকে নিরুত্তর দেখে কোণের সেই বাবুটি আবার বলে উঠল, 'শরীরটা কি স্যার আপনার আজ ভাল নেই?'

উত্তরে প্রণব একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'কই, না। তেমন কিছু নয় তো!' তারপর দরজার সিপাইটার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'দেখত তেনি বাহারমে। ধামদীনকো আনেকো বাত থে। উ আদমী আয়ে হায় থানেমে?'

রামদীন অনেকক্ষণ থেকে বাইরে অপেক্ষা করছিল। প্রণবকে নিবিষ্ট-মনে কাজ করতে দেখে এতক্ষণ সে সামনে আসে নি। প্রণবের কথা শুনে এইবার সে সামনে এগিয়ে এল। তাকে সামনে আসতে দেখে প্রণব জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া রে, তু আ গিয়া? কুছ খবর-উবর হ্যায়?'

প্রণবের কথার কোনও উত্তর না করে রামদীন শুধু হাত কচলাতে লাগল।

রামদীনকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রণব তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল। তারপর সে মৃদু হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া রে! কুছ বোলেগা?'

এতক্ষণ রামদীন আসল কথা পাড়বার একটা মওকা খুঁজছিল, এইবার সে সলজ্জভাবে উত্তর করল, 'হুজুর, খানেকো কুছ পয়সা মাঙতে। ঘরমে আজ কুছ নেহি আছে।'

এইরকম একটা আবদার যে তার কাছে শুনবে তা প্রণবের অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রণব বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে রামদীনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উত্তর করল, 'পয়সা তো তু হরবখত লেতা। লেকেন্ খবর ত একটো ভি আভিতক নেহি দিয়া।'

প্রণবের এই উদারতার উপর রামদীনেরও যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাই সাহস করে কয়েক টাকা সে তার কাছে চাইতে পেরেছে। সব দিন খবর-উবর পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে তাদের হেঁসেলের হাঁড়ি তো বন্ধ থাকতে পারে না। রামদীন সানন্দ-চিত্তে তাড়াতাড়ি টাকা তিনটা তুলে নিয়ে গদগদ হয়ে বলে উঠল, 'হুজুর হামাদের মা-বাপ আছেন। চুরি-উরি ত বিলকুল ছাড়িয়ে দিয়েছি। সাধি ভি একটো করিয়ে লিয়েছি। আভি খানে মিলতা নেহি। হুজুরসে থোড়া ভিখ মাঙ্গতা।'

'উবাত তো হাম্ সমঝে নিয়েছে। লেকেন খবর তো লে আওঁ।' খুশী হয়ে প্রণব উত্তর করল, 'উনলোককো আড্ডাকে কুছ পাত্তা মিলা?'

'ওই গরবুয়াসেই উনলোককো পুরা পাত্তা মিল যায়গা হুজুর', আমতা আমতা করে উত্তরে রামদীন প্রণবকে বলল, 'উনকে থোড়ি টাং করনেসে উ সবকুছ বাত বাতায় দেয়েঙ্গে। নেহিতো হামকো উনকে সাথ লক-আপমে মিলায় দিইয়ে। হাম উনসে পুছ কর সবকুছ বাত নিকাল লেঙ্গে।'

এই রকম একটা সামান্য ধরনের খবর রামদীনের কাছ থেকে প্রণব একেবারেই প্রত্যাশা করে নি! প্রকৃতপক্ষে সে একটা পুরাতন খবরই নতুন

করে প্রণবকে শুনাতে চাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে প্রণব ভৎর্সনা করে তাকে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি ভেবে সে তখনকার মত নিজেকে বেমালুম ভাবে সামলে নিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণব উত্তর করল, 'কৌন? গরবুয়া? যো আদমী উস রোজ এক পকেটমারী মামলামে পকড় গয়া। উসকো তো হাম ইস বাড়ে পুছে থে, লেকেন উ তো কুছ নেহি বাতাতা।'

গরবুয়াকে কোনও এক মামুলি চোর কোনক্রমেই বলা যায় না। সে ছিল একটা নামকরা পিকপকেট দলের সর্দার। জেলকে সে কোনও দিনই ভয় করে নি। বরং জায়গাটাকে সে একটা বিরাট বিদ্যাপিঠ মনে করে এসেছে। এখানে এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে চুরির নতুন নতুন কায়দা-কানুন শিখে নেয়। নিজেদের দলের কোনও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকলে এরা সমব্যবসায়ীদের কখনও ক্ষতি করতে চায় নি। গরবুয়া যে সহজে নিজের বা পরের অপরাধ সম্বন্ধে পুলিসকে কোনও বিবৃতি দেবে না তা রামদীনের ভালোরূপেই জানা ছিল। তবুও প্রণবকে একটু খুশী করবার জন্য রামদীন উত্তর করল, 'নেহি বোলতা, কাহে? উসকো দে দিয়েনা দু'চার মোক্কা, ঠিক বোল দেগা। ইলোককো ঠিক্সে পিঠনে চাহি।'

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে আসামীর উপর দৈহিক পীড়ন করা আইন বিরুদ্ধ। দৈহিক পীড়ন বেশীর ভাগ সময়েই সুফল আনয়ন করলেও ঐরূপ রীতি-বিরুদ্ধ ব্যাপারের প্রশ্রয় ভারতীয় পুলিস কখনও দেয় না। তার উপর প্রণব দৈহিক পীড়নের পক্ষপাতী একেবারেই ছিল না! রামদীনের এই সব অবান্তর কথায় প্রণব প্রত্যুত্তরে বিরক্ত হয়ে উত্তর করল, 'নেহি নেহি। পিটনেকো কানুন নেহি হ্যায়। তেনি মিঠা বাতমে দেখ, খুশীসে উ কুছ, এক্‌বার করে তো করে। নেহি তো ওভি উসসে হাম নেহি মাঙতে।'

প্রণবের কাছ থেকে এরূপ একটা বেখাপ্পা মতামত শুনবে তা রামদীনের ধারণার বাইরে ছিল। পুলিসের লোকের মারধরের উপর বীতস্পৃহা সে কল্পনাও করতে পারে না। বেহস্ত এতো কাছে জানলে সে বোধহয় এত শীঘ্র চুরি-চামারি ছেড়ে দিত না। এদিকে গরবুয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ কাজ নয়। ওদিকে আসামীকে মারধর করতেও প্রণব রাজী নয়। একটু বিব্রত হয়ে প্রণবের দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে রামদীন বলল, 'আপি লোক আভি একদম দেবতা বানিয়ে গিয়েছেন। ওহিবাস্তে চুরি-

উরিভি বহুতসে বাড়িয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, যো হুকুম হুজুর, আসামীকো তেনি মাঙায়ে, দেখে, হামি কুছ উসসে নিকালনে শেখে কি না।'

রামদীনের কয়েকটি উক্তি প্রণব যে পছন্দ করেছিল তা নয়, তবুও রামদীনের কথায় প্রণব একটু ভেবে নিয়ে হেঁকে উঠল, 'সিপাহী—।'

দরজার সিপাই দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, প্রণবের হাঁকে এগিয়ে এসে উত্তর করল, 'জী হুজুর—।'

সিপাহী সামনে আসতেই প্রণব হুকুম করল, 'আসামী গরবুয়াকো নিকাল লে আও, হাজত সে—।'

সিপাহী হুকুমমত গরবুয়াকে লক্-আপ থেকে বার করে প্রণবের কাছে হাজির করল। প্রণব মুখ তুলে তার দিকে চাইতেই গরবুয়া বলে উঠল, 'কেয়া হুজুর বলিয়ে, কেয়া?'

উত্তরে প্রণব একটু কিন্তু কিন্তু করে গরবুয়াকে বলল, 'হ্যাঁ, দেখ। হ্যাঁ, রামদীনকো সাথ বাত করো।'

গরবুয়া খুব সম্মানের সঙ্গেই এতক্ষণ কথা কইছিল, কিন্তু রামদীনের নামে সে একেবারে ক্ষেপে উঠল। পুরানো চোরেরা অপরাধ করা তাদের একটা অধিকারেরই সামিল মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটা অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করে। একমাত্র বলাৎকার ও বিশ্বাসঘাতকতাকে তারা অপরাধ বলে স্বীকার করে ঐ সব অপরাধীদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করে এসেছে। রামদীনকে সেখানে দেখে চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'বেইমানকো সাথ কোন্ বাত বলবে হুজুর? আপ মালিক আছে, যো পুছনে হায় আপ পুছিয়ে।'

গরবুয়ার চেয়ে রামদীন ছিল আরও পুরানো চোর। কথায় কথায় গরবুয়ার কাছ থেকে সে কিছু কথা আদায় করতে পারবে ভেবে প্রণব রামদীনকে গরবুয়ার সঙ্গে কথা কইতে বলেছিল, কিন্তু ফল এতে বিপরীত হল দেখে প্রণব রামদীনকে পাশের ঘরে যেতে বলে নিজেই গরবুয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহে মন দিল। প্রণব যথাসম্ভব স্বরটা মিষ্টি করে গরবুয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'দেখ, তুকে হামি একদম ছাড়িয়ে দেবে, লেকেন্ তুকো সব বাত হামকে বাতানে হোগা।'

বহুদিনের পুরানো চোর ছিল এই গরবুয়া। প্রণবের মুখের ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কি, সে ভাল করেই বুঝত। তবে এজন্য সে প্রণবের উপর একটুও রাগ করতে পারল না। তার যেমন চুরি করবার অধিকার

আছে, পুলিসেরও তেমনি তাকে ধরবার অধিকার আছে। এইরকম একটা সেয়েনায় সেয়েনায় কোলাকুলি বরং তার কাছে উপভোগ্যের বিষয়। তাই প্রণবের কথায় সে হেসে ফেলে উত্তর করল, 'হামাকে কুছু শিখলাবেন না হুজুর, হামি এক পুরানা পাজি আছি। কেস তো আপ লিখ চুকা হায়, হামকো আপ কেইসেন ছোড়েগা?'

পুরানো চোরদের সর্দারদের কথাবার্তা এরকম কাটাকাটাই হয়ে থাকে। এজন্যে এদের উপর রাগ করা অনর্থক। তাই গরবুয়ার কথায় প্রণব হেসে ফেলে উত্তর করল, 'এ বাত তো ভাই ঠিক হায়। লেকেন তুমকো উ লোক পাকড়ায়া এ বাত ঠিক হায় ত? তব উ লোককোভি তুম পাকড়া দেও। তুমকো উলোক্ ফাঁসায়া, তুমভি উলোককো ফাঁসাও।'

এই মিথ্যে ধাপ্পাবাজিটা গোড়া থেকেই গরবুয়ার উপর কার্যকরী হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল যে মুন্সীর লোকেরা নিজেদের অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। তা ছাড়া মুন্সীর দলের উপর বরাবরই গরবুয়ার একটা আক্রোশ ছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য এই রকম একটা সুযোগ সে অনেক দিন ধরেই খুঁজছে। যারা অন্যের সঙ্গে বেইমানি করে তাদের সঙ্গে বেইমানি করা যেতে পারে। তবু গরবুয়া একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করল, 'লেকেন হামরা নাম হাপনি লিবেন না, কিসিকো পাশ না। লিবেন তো সে একটা খুন-খারাপী, যো কুছ একটা উসক সাথ হোয়ে যাবে।'

এত সহজে যে কাজ হাসিল করা সম্ভব হবে তা প্রণব আশা করে নি। এইজন্য স্বভাবতঃই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার মনের এই ভাব গরবুয়ার কাছে প্রকাশ পেলে ফল বিপরীত হতে পারে। এইজন্য জোর করে মনের এই আবেগ চেপে রেখে প্রণব গরবুয়াকে গম্ভীর ভাবে বলল, 'আরে ইবাত কভি নেহি কিসিকো বলবে। পুলিসমে কুছ দিন হামরাভি হো চুকা, কোহিকো হাম এ বাত থোড়াই বলবে।'

ঝোঁকের মাথায় প্রণবকে কয়েকটা কথা বলে ফেললেও গরবুয়া তখনও পর্যন্ত তার মনটা পুরোপুরি ঠিক করে নিতে পারে নি। তখনও পর্যন্ত সে ভাবছিল সম-ব্যবসায়ীদের এই সব গোপন কথা পুলিসের কাছে বলা উচিত হবে কি-না। তবু রক্ষে যে এই নিরক্ষর মানুষ গরবুয়া ভারতের ইতিহাসের পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদের কাহিনী পড়ে নি। ইতিহাসের এই কাহিনীটুকু তার

জানা থাকলে সে পুলিসকে মহম্মদ ঘোরীর স্থলাভিষিক্ত করে হয়তো ভাবত যে ওদের শেষ করে এই পুলিস পরে তাকে ধরবে না তো? গরবুয়া চুপ করে কিছুক্ষণ সেইখানে বসে রইল। এই বলা বা না-বলার ব্যাপারে অনেক কিছুই সে ভেবে নিল। তারপর প্রণবের কাছে একটু এগিয়ে এসে সে বলল, 'একঠো বিঁড়ি উড়ি দিবেন হুজুর, সে দো রোজসে—'

প্রণব নিজে বিড়ি-সিগারেট কিছুই খায় না। নিজে এগুলো খেয়ে ও ভব্যতার নামে অপরকে তা খাইয়ে তার মাসিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ খরচ করার মত নির্বুদ্ধিতা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখুনি একে একটা সিগারেট বা বিড়ি না খাওয়াতে পারলে ওর মনের এই আমেজটুকু অচিরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে একজন সিপাইকে ডেকে তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলে গরবুয়ার পিঠের উপর সস্নেহে বারকতক হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আভি বোল উ লোককো আড্ডা কুথা আছে?'

প্রায় চারদিন গরবুয়া পুলিস হেফাজতীতে থানার মধ্যে বন্ধ আছে। কয়দিন নেশা ভাঙ করতে না পেরে তার মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। একটা বিড়ির লোভে সে তখন একটা মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারে। এখন আশাতীতভাবে এক প্যাকেট সিগারেট হাতে পেয়ে সে যেন স্বর্গলাভ করল। আনন্দের আতিশয্যে তার মনের আগড় আগে থেকেই খুলে গিয়েছে। তবুও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে গরবুয়া চুপি চুপি প্রণবকে বলল, 'কেয়া বলে, হুজুর, উ লোককো আড্ডা আভি সে দীঘিপাড়কো—'

খেয়ালের মুখে কিছুটা বলে হঠাৎ বলা বন্ধ করা পুরানো চোরদের একটা সাধারণ রেওয়াজ। এর মধ্যে নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আর পাঁচজন অফিসারের ন্যায় প্রণবও কখনও জানবার চেষ্টা করে নি। তবে সে জানত যে আসল কথা জানাবার আগে হঠাৎ একস্থানে তার এই বক্তৃতা থেমে যেতে পারে। তাই প্রণব ব্যস্ত হয়ে উঠে গরবুয়াকে জিজ্ঞেসা করল, 'দীঘিপাড় তো একটা বড়িয়া জায়গা। দীঘিপাড়কো কাঁহা?'

'বোলতা হুজুর! ঠারিয়ে না, পাড়কো উত্তর তরফ-মে একটা রাস্তা আছে না', ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট কামড়ে গরবুয়া উত্তর করল, 'উ রাস্তাকো বীচমে এক আস্তাবোল হ্যায়। ঐ আস্তাবোলকো নজদিক কহি জায়গামে উনলোককে ডেরা হ্যায়। নম্বর উম্বর ত হামারা মালুম নেহি হুজুর, হাম গিয়া ভি নেহি উঁহা কভি—'

যেটুকু আজ গরবুয়ার কাছে পাওয়া গেল তা তদন্তের ক্ষেত্রে অল্প নয়। এই সূত্রটি ধরে তড়িত গতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। তাই প্রণব তাড়াতাড়ি গরবুয়ার নির্দেশ অনুযায়ী একটা প্ল্যান টেবিলের প্যাডের উপরই এঁকে ফেলল। এর পরে গরবুয়ার দিকে প্রণব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ বাত পয়লা রোজ হামলোককে কাহে নেহি বোলা? এঁ্যা?'

গরবুয়ার উপর প্রণবদের এই ব্যাপারে যে কি দাবি আছে তা গরবুয়ার বোধগম্য হল না। তবুও যতদিন সে এদের হেপাজতে আছে ততদিন এদের না ঘাঁটানোই ভালো। মধ্যে মধ্যে এদের খুশি করে দুটো একটা বিড়ি-টিড়ি তো পেতে হবে। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে উত্তরে গরবুয়া প্রণবকে বলল, 'কেয়া বোলে বাবু, হাপনি তো উ রোজ হামাকে ছাড়িয়ে দিলেন না। তব্‌ভি থোড়া থোড়া বাত হামি উ রোজ বলিয়েছি। হাপনি হুজুর,—'

প্রণব গরবুয়াকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করছিল, নরেনবাবু কখন নেমে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছেন, তা সে জানতে পারে নি। হঠাৎ চমকে উঠে পিছন ফিরে সে শুনতে পেল নরেনবাবু বলছেন, 'কি হে প্রণব, কি হচ্ছে? পেশুরানীর টাকা-রিকভারী? কিছু বলছে নাকি, তোমার এই গরবুয়া?'

যতটুকু খবর গরবুয়ার কাছ থেকে প্রণব সংগ্রহ করতে পেরেছে তারই আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। এইটুকু খবর হতে প্রগতিদের চুরি-যাওয়া টাকা ক'টা রিকভারী হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এই মামলাটা ডিটেক্ট করবার জন্য প্রণব এখন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। তার বিগত পাপের জন্যে সে বোধহয় আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, মুন্সীরই আড্ডার খবর। এই প্ল্যানটা দেখুন, ওর কথামত আমি এঁকে নিয়েছি। ও বলছে—!'

নরেনবাবু বহু বৎসর পুলিস বিভাগে কাজ করছেন। এমনি বহু দুরূহ মামলার কিনারা করে পুলিস মহলে তিনি যথেষ্ট নামও করেছেন। মামলা-সমূহের কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা আজ আর তাঁকে পূর্বের মত উতলা করে তোলে না। এই সব এখন তাঁর কাছে একটা সহজ কর্তব্যের সামিল হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে তাঁর মন নবীন অফিসার প্রণবদের মত এত সহজে উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। তাই এদের সব কথা ধীরভাবে শুনে নরেনবাবু

খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ ভাল খবর।' পরে গরবুয়ার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, জায়গাটা দেখিয়ে দিবি তো? এঁ্যা?'

মুন্সীর দল ছিল গরবুয়ার দলের শত্রুপক্ষের লোক। এলাকার ভাগাভাগি ও দলের লোক ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে এদের মধ্যে তখনও ঘোরতর বিরোধ চলছে। এ ছাড়া এক দলের কারো পক্ষে অপর দলের ডেরা দেখিয়ে আসা রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। এ সম্পর্কে অধিক ক্ষেত্রে এদের শোনা কথার উপরই নির্ভর করতে হয়। তাই নরেনবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে গরবুয়া শান্তভাবে বলল, 'হামি তো নিজে কোভি উহিপর গিয়া নেহী। লেকেন যা শুনিয়েছি উ ত বলিয়ে দিলাম।'

গরবুয়া যা বলেছিল তা ছাড়া আর কিছুই তার কাছ থেকে জানা গেল না। গরবুয়া যা নিজে জানে না, তা সে অপরকে জানাবেই বা কি করে? কিন্তু নরেনবাবু এই বিষয়ে একটু বোধহয় ভুল বুঝলেন। যে কোনও কারণেই হোক তাঁর মনে হল যে গরবুয়া সত্য গোপন করেছে। এ রকম সত্য গোপন তারা মাঝে মাঝে যে না করে তাও নয়। তাই পরিশেষে বিরক্ত হয়ে নরেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুম সব বাত ঝুট বোলতা। উনলোককে পাত্তা তোমরা জরুর মালুম হ্যায়। আভি তুমকো উস জায়গা হামিলোককে দেখলানে হোগা।'

গরবুয়া এতক্ষণ ধীরভাবেই নরেনবাবুর কথা গলাধঃকরণ করছিল। মুন্সীর গোপন আড্ডার পত্তাটুকু তার দুর্বল মুহূর্তে পুলিসকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে তার মনটা এমনিই খারাপ ছিল। এখানে সে তার এক দুষমনকে জব্দ করতে তাদের উভয়ের এক সাধারণ দুষমনকে সহায়তা করেছে। তার বারে বারে মনে হচ্ছিল যে এই কাজটা করা তার আদপেই উচিত হয় নি। এখন এভাবে পুলিসও তাকে অবিশ্বাস করায় হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেইমানি করিয়ে যো মালুম ছিল উ বলিয়ে দিলাম। তবভি আমি আপলোককে পাশ বদমাইশ আদমি আছি। হামি লোক সব চোর আছে, সব বাত ঝুটাই বলছে, এহি বাত তো! নেহি, হামি উনলোককো ডেরা নেহি নিকালবে। হামি উনকো বাড়ে কুছু নাহি জানছে।'

নরেনবাবুর মনে হল গরবুয়াকে এই ব্যাপারে একটু বেশী আসকারা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে আসকারা পেলে পরে তাকে আর সামলানো দায় হয়ে উঠবে। শাসনতান্ত্রিক কারণে পুলিসের উপর এদের

একটা ভয়-ডর থাকা ভালো। তাই গরবুয়ার এই ধৃষ্টতায় নরেনবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ধমকে উঠলেন, 'আলবাৎ তুম সব বাত জানছে। হাম আভি তুমসে সব বাত নিকাল লিবে। খুদ যাকে, তুমকো উনলোককো জায়গা দেখলানে হোবে।'

গরবুয়া তখন একেবারে বেপরোয়া। নরেনবাবুর ধমকে সে ভয় না পেয়ে ধড়াস করে মেঝের উপর বসে পড়ল। পরে একরোখা হয়ে উঠে সে সেইখানেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাত পা আছড়াতে লাগল।

গরবুয়াকে এইভাবে থানার মেঝের উপর শুয়ে পড়তে দেখে প্রণব বলল, 'এই শুন, হামারা বার্ত শুন। এই—'

যে-গরবুয়া মাত্র কিছুক্ষণ আগে প্রণবের মিষ্টি কথায় ভুলে তার একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছিল, সেই এইবার নরেনবাবুর একটু ভুলের জন্য একেবারে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। মানব-মনের একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সন্ততি সে। কখন কোন অবস্থায় সে থাকে তা সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। প্রণব ও নরেনবাবুর এই অকৃতজ্ঞতা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। পৃথিবীর কাউকেই এখন সে আর বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তাই প্রণবের এই মিষ্টি কথাতেও গরবুয়া চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'নেহি, কিসিকো বাত নেহি শুনবে। হামি আভি সব বুঝিয়ে লিয়েছে।'

পুরানো চোরদের স্বভাব সম্বন্ধে নরেনবাবু অজ্ঞ ছিলেন না। অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতা হামেশাই তাদের মনের পথে উঠা-নামা করে। নরেনবাবু বেশ বুঝতে পারলেন যে এখন তার মন নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসে গিয়েছে। এখন পুনরায় তার মন তার ভাবরাজ্যে উপনীত না হলে তার কাছ থেকে আর কোনও সাহায্য পাওয়া দুরূহ। তাই তিনি গরবুয়ার উপর কোনও রকম আর পীড়াপীড়ি না করে প্রণবের দিকে চেয়ে বললেন, 'চুলোয় যাক! আমরা নিজেরাই জায়গাটা খুঁজে নেব। ও যেটুকু বলেছে ওতেই হবে। এখন দশটা সিপাই, আর রাম সিংকে তৈরি হতে বল। হ্যাঁ, আর দুটো ট্যাক্সি ডাকাও! দেরি না হয়।'

প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে নরেনবাবু নিজে তৈয়ারি হবার জন্য পাশের ঘরে চলে গেলেন। এখুনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে বাইরে খবর হয়ে যেতে পারে। এমন কি থানার মধ্যেও এদের চর থাকা অসম্ভব না।

গরবুয়ার কাছ থেকে যে আর একটি কথাও বার করা যাবে না, তা

নরেনবাবুর মত প্রণবও বিশ্বাস করেছিল। তাই গরবুয়াকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা প্রণব নিষ্প্রয়োজন মনে করল। প্রণব টেবিলের উপরকার ছড়ান কাগজগুলো তাড়াতাড়ি গুছোতে গুছোতে হেঁকে উঠল, 'দরজা! হাওয়ালদারকো দশ সিপাই জলদি তৈয়ারি করনে বোলো, পুরা উর্দিমে! আউর দুঠো ট্যাক্সিভি বোলাও। রাম সিংকোভি আনে বোলো খুলা কোমরমে!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জুতার খস খস শব্দ করতে করতে, কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে লাল পাগড়ির দল লাঠি-হাতে থানার অফিসঘরে এসে অফিসারদের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার উপর ট্যাক্সি দু-খানার হর্নও শোনা গেল। পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে নরেনবাবুও তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গরবুয়া তখনও চিৎ হয়ে থানার মেঝের উপর শুয়ে পা আছড়াচ্ছিল। গরবুয়াকে তখনও পর্যন্ত সেইখানে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে নরেনবাবু খেঁকিয়ে উঠে একজন সিপাইকে বললেন, 'ইসকো লকআপমে লে যাও। ইসকো কালই হাম ম্যাজিস্ট্রেটি কর দেগা।'

নরেনবাবুর হাঁকে দরজার সিপাই এসে গরবুয়াকে তুলে হাজতঘরে নিয়ে গেল। গরবুয়া সুড় সুড় করে সিপাইয়ের সঙ্গে হাজতে চলে গেল। এটা তার কাছে এমন এক অতিসাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যে এতে সে কোন আপত্তি করল না।

গরবুয়া চলে গেলে নরেনবাবু একটু এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে প্রণবকে বললেন, 'চল হে! দেরি করা ঠিক না, দেওয়ালেরও কান আছে। ওদের ঘরে ইতিমধ্যে খবর হয়ে যেতে পারে।'

নরেনবাবুর এই সতর্ক বাণীর মধ্যে এতটুকুও মিথ্যে ছিল না। সত্যই দেওয়ালের মধ্যেও এই সব ব্যাপারে কারো না কারো কান পাতা থাকে। এদের খুঁজে বার করবার জন্যে পুলিসের যেমন চর থাকে, তেমনি পুলিসের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে এরাও লোক নিযুক্ত করে। এমন কি সিপাহী জমাদারদের মধ্যেও এদের চর মোতায়েন থাকা অসম্ভব নয়। এমনি কতো উকিল মোক্তার দালাল এদের জামিনের অজুহাতে থানার আশেপাশে ঘুরা-ফিরা করে। এদের কারো না কারো মারফৎ আগে-ভাগে খবর পেয়ে আড্ডা থেকে সময়মত সরে পড়া এদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে প্রণব উত্তর করল, 'হ্যাঁ স্যার, আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি চলুন।'

নরেনবাবু, প্রণব, ইন্‌ফরমার রামদীন ও রাম সিং জমাদার সামনের ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। দশজন সিপাই নরেনবাবুর নির্দেশমত পিছনের ট্যাক্সি-খানিতে চেপে বসল। এর পর হর্নের শব্দ করতে করতে ট্যাক্সি দুখানা ছুটে চলল জোড়াসাঁকো অঞ্চলের কুখ্যাত দীঘির পাড়ের দিকে।

এই কুখ্যাত জায়গার নাম ছিল দীঘির পাড়। কলকাতা শহর পত্তনের গোড়ার দিকে এখানে দীঘির মত বড় একটা পুকুর ছিল। এই দীঘি কবে বুঁজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এখন বিরাট একটা আবর্জনাপুর্ণ খালি মাঠ। দীঘির পাড়ের ধারের বস্তি বহুবার ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তবু জায়গাটাকে এখনও লোকে দীঘির পাড়ই বলে থাকে।

মাঠের ডানদিকের একটা রাস্তার উপর নরেনবাবু ও প্রণব দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কথা বলছিল। ইন্‌ফরমার রামদীনও তাঁদের সঙ্গে আছে। দূরের একটা ভাঙ্গা মাঠকোঠার আড়ালে বে-উর্দিতে কয়েকজন সিপাই ও একজন জমাদার বাবুদের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা খবরের উপর নির্ভর করে অনেকক্ষণই তারা সেখানে দাড়িয়েছিল। কিন্তু যাদের আশায় তাদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এতক্ষণে নরেনবাবুর মনে একটু সন্দেহ আসছিল। তিনি নিভে-যাওয়া চুরোটটাতে আর একটা টান দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রণববাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে প্রণব! গরবুয়া ঠিক এই জায়গাটার কথাই বলেছিল তো?'

গরবুয়া মুন্সীর আড্ডার সঠিক পাত্তা পুলিসকে দিতে পারে নি। তার একটা হদিস মাত্র সে পুলিসকে দিয়েছিল। এখনকার এই বিস্তীর্ণ বস্তিগ্রামের মধ্যে কোথায় যে তাদের আড্ডা তা খুঁজে নেওয়ার কাজ হচ্ছে পুলিসের। এর বেশী সাহায্য পাবার আশা কারো কাছ থেকে পুলিসের পক্ষে করা উচিত নয়। তাই এদের যাতায়াতের পথে ছদ্মবেশে ওত পেতে এদের আড্ডা-ঘরের প্রকৃত অবস্থান নরেনবাবু ও প্রণব বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলেন। নরেনবাবু গরবুয়াকে অবিশ্বাস করলেও প্রণবের তার উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। একটু কিন্তু কিন্তু করে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, এই জায়গাটার কথাই গরবুয়া বলছিল। হাজতে পাঠাবার আগেও আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

প্রণবের মত নরেনবাবু অতো বেশী আদর্শবাদী ছিলেন না। প্রণবের

চেয়ে তাঁর বয়স অনেক বেশি হয়েছে। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যৌবনসুলভ বহু আদর্শও চলে গিয়েছে। একটা মাত্র বিষয় নিয়ে এইভাবে মেতে থাকবার বয়স আর তাঁর নেই। তাই প্রত্যুত্তরে বিরক্ত হয়ে নরেনবাবু প্রণবকে বললেন, 'দ্যুৎ, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকব! কাল ছিলাম চার ঘণ্টা, আজ দু'ঘণ্টা হতে চলল। আজও না হয় থাক। আমি বাপু থানায় ফিরি, আর তুমি, তোমার সেই—তাঁদের বাড়িতে না হয় একবার ঘুরে এস। তবে দেখ কমপ্লেন-টমপ্লেন যেন না হয়।'

কি রকম প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়ে প্রণব সেদিন প্রগতিদের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে তা নরেনবাবুর জানা ছিল না। এ সব কথা জানা থাকলে নরেনবাবু নিশ্চয়ই এমনভাবে প্রগতিকে নিয়ে প্রণবের সঙ্গে পরিহাস করতে পারতেন না। ওখানকার সব পাট যে প্রণব সেদিন একেবারে চুকিয়ে দিয়ে এসে ওদের ঐ চুরির টাকা রিকভারির কাজে মেতে উঠেছে, তা এখন নরেনবাবুকে বলেই বা কি করে। তাই নরেনবাবুর এই কথা শুনে বিষাদজড়িত স্বরে প্রণব উত্তর করল, 'কেন লজ্জা দেন স্যার! ঠাট্টা করে আমি কিছু বলেছিলাম। তার সব কথাই কি সত্যি?'

চুরি করার ন্যায় চোর ধরবার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। এইরূপ এক উত্তেজনায় ইনফরমার রামদীন এই দিন মসগুল হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ সে নিবিষ্ট মনে এ সব অপরাধীদের যাতায়াতের পথের দিকে চেয়ে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল। প্রণবের কথা শেষ হবার আগেই রামদীন ছুটে এসে বলল, 'বাবু বাবু, দেখুন ওরা কারা!'

দুজন লোক পথ দিয়ে গলা জড়াজড়ি করে হেঁটে যাচ্ছে। একজনের পরনে সার্জের কোট, দামী শাল ও পাম্পশু, অপর জনের পরনে একটা ময়লা লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি। ভিন্নবেশী এই দুটি লোকের গলাগলি ভাব দেখে তাদের কারুরই বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রকৃতপক্ষে এরা কারা। এই লোক দুটো আপন মনেই পথ চলছিল। তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে নরেনবাবু বললেন, 'এদের সন্দেহজনক বলে মনে হয়। আমার বোধহয় এরা দুজনাই পকেটমার।'

প্রণবের জানা ছিল যে প্রয়োজনমত এই সব পিকপকেটরা বেশভূষা ধারণ করে। এদের মধ্যে যারা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন যানের ফার্স্ট

ক্লাসে ওঠে তাদের বেশভূষা খুবই দামী থাকে। যারা এ সব যানবাহনের নিম্নশ্রেণীতে গরিব গুর্ব লোকদের পকেট মারে তাদের বেশভূষা নিম্নশ্রেণীর মত হয়। কিন্তু কাজকর্মের শেষে তারা স্ব স্ব বেশভূষা সহ একই ডেরাতেই ফিরে আসে। একজন ধনীর সঙ্গে একজন গরিবের এই পঙ্কিল বস্তিতে এইভাবে মেলামেশার দৃশ্য হতে প্রণব সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে, এরা হচ্ছে একই দলের দলী। তাই এই ব্যাপারে একটুমাত্রও দোনা-মোনা না করে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'দেখছেন না স্যার! একজন বরের বাপ সেজে চলেছে, আর আরেকজনের একেবারে বিড়িওয়ালার বেশ। এরা দুজনা নিশ্চয়ই একই দলের পকেটমার।'

প্রণব ও নরেনবাবু দুজনায় দুজনার অজ্ঞাতে একই পথে চিন্তা শুরু করেছিলেন। অকাজ কুকাজ শেষে হিসেব-নিকাশের জন্য এরা যে তাদের গোপন আড্ডার দিকে যাত্রা শুরু করেছে তা এঁদের আর বুঝতে বাকি থাকে নি। এই বিরাট বস্তির কোনও এক মাঠকোঠায় যে এদের আড্ডা আছে তাতে এঁদের দুজনারই আর কোনও সন্দেহ নেই। নরেনবাবু স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রণবকে বললেন, 'এদের আড্ডাও কাছাকাছি আছে বলে মনে হয়। গরবুয়া তাহলে তোমাকে ঠিক খবর দিয়েছে। চল, এখন এদের ফলো করা যাক।'

রামদীন এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে নরেনবাবুর ও প্রণবের কথাবার্তা শুনছিল। নরেনবাবু ও প্রণববাবু এগিয়ে গিয়ে লোক দুটোর পিছু নেবার উপক্রম করলে সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'একটু হুঁশিয়ারিসে যাবেন হুজুর। ছুরি-উরি উ লোক না মারিয়ে দেয়।'

রামদীনের কথাটা ভাববার বিষয়। কথাটা শুনে নরেনবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পকেটের রিভলবারটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে নিলেন। তারপর একটু চিন্তিত হয়ে তিনি রামদীনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই ওদের চিনিস? তুই জানিস কারা ওরা?'

ইন্‌ফরমারি কাজকর্মে এত বড়ো কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ রামদীন বহুদিন পায় নি। এত সহজে যে তাদের আশা সফল হবে তা' সেও আশা করে নি। এই মওকায় সে পুলিসের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ অন্ততঃ দু'মাসের খোরাকির ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। সৌভাগ্যক্রমে এদের সে চিনে নিতেও পেরেছিল। আনন্দের আতিশয্যে এগিয়ে এসে

রামদীন উত্তর করল, 'জরুর, হামি উনলোককো চিনছে। উলোক মুন্সীকো আদমি আছে হুজুর। ডাইনেসে যে আদমী চলছে না, উসকো নাম জঙলী আছে। শালা ভারী হুঁশিয়ার আদমী হুজুর। হামেশা একটা ছুরি-উরি কাছে রাখে। ক'ভি কভি উ সে মারিয়ে ভি দেয়।'

নরেনবাবু এইবারে সোজাসুজি রামদীনকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুই ওদের কি করে চিনলি?'

উত্তরে রামদীন একটু গর্বের হাসি হেসে বলল, 'হামি ভি সেয়ানা আছি হুজুর।'

নরেনবাবু রামদীনের কথায় ভয় পেলেন কি না তা বোঝা গেল না। তিনি জানতেন যে, পকেটমারেরা কখনও ছুরি-ছোরা ব্যবহার করে না। কিন্তু বোম্বারদের যেমন ফাইটার প্লেন ঘিরে নিয়ে চলে, তেমনি আত্মরক্ষার্থে এরা কখন কখন ছুরি মারনেওয়ালাদের মাইনে করে রেখে দেয়! নির্বিবাদী পিকপকেটওয়ালারা ধরা পড়লে এরা ছুরি হাতে এদের উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়। তবে পিকপকেট মহলে এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁর কাছে খুব বেশি নেই, এই যা।

তিনি চুপ করে সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রণবকে বললেন, 'কথাটা ভাববার বিষয়, প্রণব। সঙ্গে পিস্তল আন নি তো? জায়গাটা কিন্তু বড় খারাপ। একটু সাবধানে এগুতে হবে।'

প্রণব পিকপকেটদের আড্ডার আশু আবিষ্কারের সম্ভাবনায় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই বেরুবার আগে অতশত ভেবে দেখবার সে সময় পায় নি। তা ছাড়া এ সব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তার এখন একমাত্র চিন্তা কি করে তাড়াতাড়ি ওদের ধরে ফেলা যেতে পারে। তাই সে একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'কি আপনি বলেন স্যার, ও ছুরি-উরি সকলেই মারে। চলে আসুন স্যার, দেখি ওদের হিম্মত কত।'

ভাবের আতিশয্যে প্রণব এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে জানত না যে, ভীরুতার ন্যায় হটকারিতার জন্যেও পুলিসের লোকদের বিভাগীয় শাস্তি পেতে হয়। ঝুটমুট শুধু বীরত্ব দেখাবার জন্যে এদের নিজেদের বা অন্যদের অকারণে বিপদাপন্ন করবার কোনও অধিকার নেই। বুদ্ধি ও সাহসের প্রকৃত সংমিশ্রণকেই পুলিসকোডে বীরত্ব বলা হয়ে থাকে। নরেনবাবু তার জামাটা ধরে ফেলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অত ব্যস্ত হয়ো না খোকা! ব্যস্ত হলে কি কোন কাজ হয়? দাঁড়াও—'

ব্যস্ত হয়ো না বললেও মানুষের ব্যস্ততা চলে যায় না। বরং সময় সময় এতে তাদের ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। প্রণবের যেন আর তর সইছে না। আরও ব্যস্ত হয়ে উঠে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'তবে স্যার, সেপাইদেরও এখানে ডাকি।'

প্রণবের এই অবিমৃষ্যতাসূচক প্রস্তাবে এই আপদকালের মধ্যেও একজন অভিজ্ঞ জেনারেলের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নরেনবাবু একটু স্নেহের হাসি হেসে প্রণবকে ইশারায় চুপ করতে বললেন। পিছনে মোতায়েন সিপাহীদের এখুনি সেখানে ডেকে আনলে ফল যে বিপরীত হবে তা প্রণব ভেবে দেখে নি। প্রণবকে এত সব তখুনি বুঝিয়ে বলবার সময়ও নরেন-বাবুর ছিল না। তাই প্রণবের এই প্রস্তাবের উত্তরে নরেনবাবু সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'না, সিপাইরা যেখানে আছে সেখানেই থাক। আমরা বরং, হাঁ—দাঁড়াও ভেবে দেখি।'

এতক্ষণে প্রণব লক্ষ্য করল যে, সেই পকেটমার লোকদুটো আরও কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়েছে। আর একটুক্ষণ দেরি করলে হয়তো তারা আশে-পাশের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই লোক দুটোকে এখুনি অনুসরণ না করলে তাদের আর কোনও খোঁজ হয়তো পাওয়া যাবে না। প্রণব প্রমাদ গুনে আবার ব্যস্ত হয়ে নরেনবাবুকে বলল, 'কিন্তু ওরা যে চলে গেল স্যার।'

নরেনবাবুও যে এইরূপ একটা সম্ভাবনার বিষয় না ভেবেছিলেন তা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও ভেবেছিলেন যে, একবার পিছনে পুলিস আসছে বুঝলে তারা এমন জোরে ছুট দেবে যে তখন আর তাদের ধরে ফেলার কোনও উপায় থাকবে না। এইজন্য যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করাই এক্ষেত্রে পুলিসের উচিত হবে। তাই প্রণবকে একটু শান্ত করে নরেনবাবু উত্তর করলেন, 'কতদূর আর ওরা যাবে! যাক না একটু এগিয়ে। আমরা একটু পিছিয়েই থাকতে চাই। ওদের আমরা এখুনি ধরছি না। দূর থেকে ওদের আড্ডাটা দেখে নেব। দেখা যাক না কোথায় ওরা ঢোকে। এখন আস্তে আস্তে ওদের পিছন পিছন চল।'

নরেনবাবু ও প্রণব সদলে লোক দুটোর চলনের উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে পথ চলছিল। পুলিস যে তাদের পিছু নিয়েছে লোক দুটো তা একেবারেই জানতে পারে নি। নিঃশঙ্ক চিত্তে কতকটা পথ চলে এসে

তারা পথের ধারের একটা আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিল। প্রণব ও নরেনবাবুর দল এত পিছনে আসছিল যে, তাদের দেখতে পেলেও লোক দুটোর বোধহয় কোনও সন্দেহ হয় নি। তারা আরও বার-কতক এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে আস্তাবলের ডান পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ল। গলির মধ্যে তাদের বিলীন হতে দেখে নরেনবাবু বলে উঠলেন, 'এইবার একটু পা চালিয়ে। ওরা সরে না পড়ে আবার।'

কথা ক'টা বলে নরেনবাবু চলনের গতি একটু বাড়িয়ে দিলেন। অন্যান্য সকলেও সেইভাবে তাঁকে অনুসরণ করল। এদের বহু পিছনে আসছিল উর্দিপরা লাল পাগড়ির দল। অত দূর থেকে তাদের ভালো করে দেখাও যায় না। শুধু মধ্যে মধ্যে তাদের ভারি বুটের মচ্ মচ্ শব্দ শোনা যায় মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে তাতে কোনও ক্ষতির কারণ ছিল না।

একটা বছর-বারো বয়সের ছেলে, আন-চান তার ভাব, চতুর্দিকে তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। আস্তাবলের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে সে বিড়ি খাচ্ছিল। নরেনবাবুকে সদলে জোর জোর পা ফেলে সেইদিকে আসতে দেখে সে একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর একবার নরেনবাবুর সেই দলটার দিকে চেয়ে দেখে সে চোঁচোঁ ছুট দিল। প্রথম থেকেই নরেনবাবুর একে সন্দেহ হয়েছিল। এখন তাকে ছুটতে দেখে নরেনবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'প্রণব ভাই! শীগগির ওকে ধরে ফেল। এখনি সব মাটি করে দেবে।'

প্রণবও ছেলেটাকে আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিল। তাদের দূরত্বও খুব বেশি ছিল না। নরেনবাবুর ইঙ্গিতমাত্রেই প্রণব প্রাণপণ ছুটে গলিটার ভিতর ঢোকবার আগেই ছেলেটাকে ধরে ফেলল। ধরাপড়া মাত্র ছেলেটা তার দুটো আঙুল মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বোধহয় শিষ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রণব তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে, তার মুখটা তখুনি সজোরে চেপে ধরল। তারপর সে ছেলেটাকে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এই বদমাইস! চুপসে রহো। বদমাসি করোগে তো—একদম তুমকো মার ডালেগা।'

ছেলেটা আর কোনও শব্দ না করে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে রামদীন ইন্‌ফরমার ও জমাদার রাম সিংকে নিয়ে নরেনবাবু সেই গলির মুখটাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে দেখে

তিনি বললেন, 'এ্যা, সাবাস! তুম বহুত পাহারা দেতা। আচ্ছা তুমকো ভি থোড়াই ছোড়েগা।'

ছেলেটিকে দেখে জমাদার রাম সিংও কিছু বলতে চাইল, কিন্তু রাম সিং নরেনবাবুকে যা বলবে তা নরেনবাবুর ভালো করেই জানা আছে। দ্রুতগতিতে কাজ করবার সময় কোনও ভালোমন্দ আলোচনা করাও চলে না। এদিকে এই ছেলেটাকে আর একটুক্ষণের জন্যেও এখানে রাখা নিরাপদ নয়। ইশারায় সংবাদ পাঠাবার একাধিক উপায় এদের জানা আছে। তাই রাম সিং জমাদারকে তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে নরেনবাবু বললেন, 'কেয়া তুমলোক ইঁহিপর খাঁড়া হোকে দেখতা হ্যায়। লে যাও, জলদি ইস্‌কো হিঁয়াসে লে যাও। একঠো সিপাই সে ইস্‌কো আভি থানামে ভেজ দেও। যাও, জল্‌দি—'

নরেনবাবুর কথায় জমাদার রাম সিং আর দ্বিরুক্তি না করে ছেলেটাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে মার্কাস স্কোয়ারের দিকে চলে গেল। ছেলেটাকে ঘটনাস্থল থেকে ত্বরিত গতিতে বিদায় দিয়ে নরেনবাবু রাম-দীনকে বললেন, 'দেখ, তুই এই সামনের বাড়ির রকটায় বসে থাক। আমার হুইসিল শুনলে তুই ছুটে গিয়ে স্কোয়ার থেকে উর্দিপরা সিপাইদের ডেকে আনবি, বুঝলি?

রামদীন ইন্‌ফরমার এর আগেও বহুবার এই রকম পুলিসী অভিযানে যোগ দিয়েছে। এই সব রেইডের রীতিনীতি ভালরূপেই তার জানা ছিল। এর আগে কতবার সাদা পোশাকপরা পুলিসের দল আক্রান্ত হলে সে অলক্ষ্যে কেটে পড়ে রাস্তা বা থানা থেকে উর্দিপরা পুলিসকে ডেকে এনে তাদের জীবন রক্ষা করেছে। এই বিষয়ে প্রভুভক্ত 'ডাল কুত্তা' কুকুরের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে। নরেনবাবুর উপদেশ মত রামদীন এগিয়ে এসে সেই রোয়াকটার উপর তার চাদরখানা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'যো আপকো হুকুম, হুজুর। সব কুছ আপকো হুকুম মোতাবেক হোবে। লেকেন হাপনারা একটু হুঁশিয়ারিসে যাবেন।'

রামদীনের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নরেনবাবু তাঁর হুইসলটা বুক পকেট হতে বার করে মুখের মধ্যে পুরে ডান হাত দিয়ে পকেটের রিভলবারটা চেপে ধরে, প্রণবকে ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে, সাবধানে পা টিপে টিপে আস্তাবলের ডান ধারের সেই গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

বাঁ-ধারের সেই খালি আস্তাবল ও ডান ধারের একটা বন্ধ গুদাম-বাড়ির মাঝখান দিয়ে স্যাৎসেতে অন্ধকার গলির পথ, গলির পথটা দোতলা মাঠকোঠার সামনে এসে থেমে গিয়েছিল। নরেনবাবু ও প্রণব সাবধানে পা ফেলে ফেলে, গলির শেষ পর্যন্ত চলে এল, কিন্তু কাউকেই সেখানে তারা দেখতে পেল না।

সামনেই সেই দোতলা মাঠকোঠা। নীচে কোন দরজা বা জানালা নেই। উপরের ঘরগুলো ঘিরে একটা কাঠের বারান্দা, আর সেই বারান্দার একটা কোণ থেকে কাঠের একটা নড়বড়ে সিঁড়ি নীচের রাস্তা পর্যন্ত নেমে এসেছে। জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ কোথাও নেই। ভিতরে কোনও লোকজন আছে বলেই মনে হয় না। শুধু দু'একটা ইঁদুর, ছুঁচো ও কোলাব্যাঙ তাদের সাড়া পেয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে। চারদিককার অবস্থা দেখে প্রণব ও নরেনবাবু একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে নরেনবাবু একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'এস, পা টিপে টিপে ওই সিঁড়িটায় উঠে পড়ি। যেন একটুও শব্দ না হয়।'

চারদিকে এই থমথমে ভাব দেখে এমনিই মানুষের মনে আতঙ্ক আসে। এর উপর জেনে শুনে তারা মাত্র দুজনে একটা গুণ্ডাঅধ্যুষিত মাঠকোঠার উপরে উঠছে। তবে সঙ্গে তাদের একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে—এইটুকু যা ভরসা। এখন এদের দ্বারা হঠাৎ পর্যুদস্ত হবার আগে সময়মত এটা ব্যবহার করতে পারলে হয়। একটা অজানা ভয়ে প্রণবের আপাদমস্তক থেকে থেকে যে শিরশির করে না উঠছিল তা নয়। জোর করে মনে সাহস ফিরিয়ে এনে নরেনবাবুর পিছন পিছন আসতে আসতে প্রণব বলল, 'না স্যার, শব্দ হবে না। আমার পায়ে রবারের জুতো আছে।'

আস্তে আস্তে দুজনায় বারান্দার উপরে উঠে এল। উপরদিকে বারান্দাটার কোল ঘেঁষে সারি সারি ঘরগুলো খালি বলেই মনে হল। নরেনবাবু ও প্রণব ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ প্রণব নরেনবাবুকে ইশারা করে দূরের একটা ঘরের দিকে চেয়ে দেখতে বলল। বারান্দার শেষের দিকের একটা ঘর থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ঘরটার দিকে চেয়ে দেখে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'আমার মনে হয় দরজার কাছে কেউ তামাক খাচ্ছে, ওটা ওদের হুঁকো-কলকের ধোঁয়া-টোঁয়া হবে।

যে পুলিস বিভাগে প্রণব সবে মাত্র প্রবেশ করেছে সেই পুলিস বিভাগ থেকে নরেনবাবু বিদায় নেবার উপক্রম করছেন। প্রণবের চেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই বেশি ছিল। এ'দের এইরকম বহু গোপন ডেরায় ইতিপূর্বে তিনি বহুবার হানা দিয়েছেন। এইখানে কি আছে না আছে তা তাঁর না জানা থাকবার কথা নয়। প্রণবের এই কথায় নরেনবাবু একটু মাথা নেড়ে উত্তর করলেন, 'হুম্, ওইটেই হচ্ছে ওদের আড্ডাঘব। ওটা তামাকের ধোঁয়া নয়! বেটারা ওখানে নিশ্চয় গাঁজা কি চণ্ডু খাচ্ছে।'

'এখানে আমরা তো মাত্র দুটো মানুষ।' খুব নীচু গলায় প্রণব নরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ঐ আড্ডা-ঘরের মধ্যে কতগুলো লোক আছে তা তো স্যার এতদূর থেকে বুঝবার উপায় নেই। দলে ওরা খুব ভারি থাকলে আমরা কি আর ওদের সঙ্গে পেরে উঠব? তার চেয়ে চুপি চুপি ফিবে গিয়ে সিপাইদের এখানে ডেকে আনলে হয় না?'

নরেনবাবু প্রণবকে উত্তর দিককার সেই বারান্দা থেকে টেনে এনে, দুজনায় সেই মাঠকোঠার পুর্বদিকের বাবান্দাটায় পিছিয়ে এলেন। তারপর সেই কাঠের বারান্দা ধরে আরও কিছুটা দুব এগিয়ে এসে তিনি প্রণবকে বললেন, 'পাগল! চোরাই মাল ওদের কাছে না থাকলে ওদের এখন ঘা' না দেওয়াই ভালো। ওখানে শুধু কয়েকটা মানুষ থাকলে তো ওদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা খাড়া করা যাবে না। আমাদের লুকিয়ে দেখে নিতে হবে যে এখন ওখানে চোরাই মালের ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে কি-না। মাঠকোটার দক্ষিণের বারান্দাটা ওই ঘরগুলোব পিছন দিক দিয়ে চলে গেছে বলে মনে হয়, বরং চল ওই বারান্দার উপব দিয়ে ওদের ওই আড্ডাঘবের পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। এখুনি আমাদের ওদের সামনে যাওয়া ঠিক নয়।'

এ রকম অবস্থায় প্রণব পুর্বে কখনও পড়ে নি। এখানকার এই সব ব্যাপার দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে কোন প্রত্যুত্তব না করে এইবার নরেনবাবুর পিছন পিছন, সাবধানে পা ফেলে ফেলে দক্ষিণ দিককার বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়াল।

প্রণবকে এইভাবে দাঁড়াতে দেখে নরেনবাবু ঠাট্টার ছলে বললেন, 'দাঁড়ালে হবে না, চলে এস। এ তোমার পেগুরানীর বাড়ি নয়।'

এত বিপদের মধ্যে পড়েও সেখানে দাঁড়িয়ে প্রণব হেসে ফেলে উত্তর করল, 'না স্যার, তা নয়।'

নড়বড়ে পুরানো ভাঙা বারান্দা। থেকে থেকে সেগুলো কেঁপে ওঠে। জায়গায় জায়গায় কয়েকখানা করে কাঠের রেলিং খসে পড়েছে। কিন্তু এইভাবে এগুনো ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তারা দেয়ালগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে শুরু করল। এমনি ভাবে তারা আড্ডাঘরের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটার সেইদিকে একটাও জানালা বা দরজা নেই। ছাঁচি বেড়ার দেওয়ালে মাটি ধরান। এখানে-ওখানে দু-একটা করে ছোট ছোট ফুটো রয়ে গেছে। দেয়ালের নীচের দিককার ফুটোর মধ্যে চোখ রেখে নরেনবাবু উবু হয়ে বারান্দাটায় বসে পড়ে প্রণবকে বললেন, 'তুমিও এবার এখানে বসে পড়ো হে, আস্তে আস্তে।'

নরেনবাবুর নির্দেশমত প্রণবও ঐ রকম আর একটি ফুটোর মধ্যে চোখ রেখে বসে পড়ে নিবিষ্ট মনে ভিতরকার ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। আড্ডা-ঘরে আড্ডা তখন পুরোদমেই চলছে। ভিতরকার ব্যাপার চোখে পড়বামাত্র প্রণব আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। সে অস্ফুটস্বরে নরেনবাবুকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'ও স্যা—র!'

নরেনবাবু এতক্ষণে নিঃসাড়ে দেওয়ালের ফুটোর মধ্যে চোখ রেখে বসে-ছিলেন। এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে ভিতরের লোকজনের কাজকর্ম ভাল করেই দেখা যাচ্ছে। এমন কি তাদের কথাবার্তা পর্যন্ত বাইরে থেকে স্পষ্টভাবে শোনা যায়। হঠাৎ এই সময় প্রণবকে বেসামাল হয়ে উঠতে দেখে ডানহাতে প্রণবের পিঠটা একটু টিপে দিয়ে নরেনবাবু বললেন, 'চুপ! কথা—না!'

কোণের সেই আড্ডাঘরে এইদিন পুরোদস্তুর আড্ডা বসেছে। মেঝের উপর সারি সারি বাইশ-তেইশটা ছেঁড়া মাদুর। দু-একটা পুরানো ট্রাঙ্ক ও একটা লোহার সিন্দুক ছাড়া ঘরের ভিতর আর কোনও আসবাবপত্র নেই। দেওয়ালে কয়েকটা কাঠের ব্র্যাকেট আঁটা। আর সেই ব্র্যাকেটে গোটা পাঁচ-সাত গরম কোট, শাল ও ফ্লানেলের সার্ট ঝোলানো রয়েছে। প্রয়োজন-মত জামাগুলো পরে পিকপকেটরা তাদের সর্দারের নির্দেশমত কাজে বের হয়। কোণের লোহার সিন্দুকের উপর এক বাক্স রেজার ব্লেড ও খানকতক ছুরি সাজানো রয়েছে।

ছেঁড়া মাদুরগুলোর উপর প্রায় জন কুড়ি-পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশীয় লোক, তাদের বিভিন্ন বেশ-ভূষার মধ্যে আত্মগোপন করে হল্লা করছে। কেউ আপন মনে ছোট ছোট হুঁকার বড় বড় নলে মুখ রেখে চোখ বুঁজে চণ্ডু

খাচ্ছে। ঘরের শেষের দিকে একটা ছেঁড়া তুলো-বার-করা গদির উপর বসে পকেটমারদের সর্দার মুন্সীলাল টাকা গুনছিল,—দু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি বারো। টাকা ও নোট আলাদা আলাদা থোক দিতে দিতে সর্দারজী এইবার হেঁকে উঠলেন, 'এই ঢেলিরাম! কেতো টাকা পেলি, সেই সোনেকো ঘড়ি বেচে?'

কথোপকথনের গুনগুন শব্দ ও চণ্ডু খাওয়ার ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ সর্দারজীর এক হাঁকে বন্ধ হয়ে গেল। নরেনবাবু দেওয়ালের ওপার থেকে মুন্সীজীর হাবভাব দেখে বুঝলেন যে, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এরাও কারো থেকে কম যায় না। এই একটা লোকের দাপটে এতগুলো বেপরোয়া মানুষ যেন কেঁচো হয়ে রয়েছে। একটা আকস্মিক নিস্তব্ধতার মধ্যে চণ্ডুর পাইপটা নামিয়ে রেখে ঢেলিরাম উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সর্দারজীর কাছে এগিয়ে এসে উত্তর করল, 'সে ঘড়ি তো দেড়শো রূপিয়াকো হবে, লেকেন ছটুলাল পঞ্চাশের বেশী একদম দিলে না।'

পুরানো চোরেদের খাউ বা বামাল-গ্রাহকরা যে এমনি করেই এদের রুজিরোজগারের উপর অন্যায় ভাবে ভাগ বসায় তা সর্দারজীর ভাল করেই জানা ছিল। তবে অতো দামী একটা ঘড়ির জন্যে যে সে একটা নামমাত্র মূল্য দেবে তা সে আশা করে নি। তবে এজন্য তার এই সাকরেদের কোনও দোষ নেই। এর জন্য যেটুকু দোষ তা ঐ খাউ-এরই ছিল। তবু এই দামের বহর শুনে মুন্সী সর্দার একটু চুপ করে কি ভেবে বিরক্তির সাথে বলে উঠল, 'তু কুছ কামকো আছে না। আচ্ছা, যো মিলা ওহি লে আও।'

সর্দারের এই মৃদু ভৎর্সনা ঢেলিরামের কাছে আপ্পাইতের সামিল ছিল। সর্দারের কথামত ঢেলিরাম টাকা কয়টা সর্দারের হাতে খুশী মনে তুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে পিছিয়ে দাঁড়াল। সর্দার বাকি টাকা কয়টার একটা থোক সাজিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আভি একেক আদমি আও।'

সর্দারের কথায় হুড়মুড় করে প্রায় দশ-বারোজন সামনে এগিয়ে এল। সর্দারের পাশে গোল টুপী মাথায় একজন হিন্দুস্থানী হিসাব লিখছিল। সে তাদের ধমক দিয়ে বলল, 'এক সাথমে নেহি। পয়লা আও বংশীলাল, উসকো পাছু হোসেন।'

খাজাঞ্চির কথায় তখনকার মত সকলেই যে যার জায়গায় বসে পড়ল। তারপর এক একজন করে এগিয়ে গিয়ে আড্ডাখানার খাতায় তাদের নাম

লিখিয়ে, তাদের প্রাপ্য টাকা বুঝে নিতে লাগল। তখনও এদের অনেকের টাকা পেতে বাকী, ভাগ-বাঁটোয়ারা কাজ শেষ হয় নি। এমন সময় দলের অন্যতম সদস্য হাফিজ রুক্ষ মেজাজে ঘরে ঢুকল। ধুলো-মাখা উস্কখুস্ক তার মাথার চুল। সর্বশরীর তার থর থর করে কাঁপছে। সে চিৎকার করে মুন্সী সর্দারকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'বিলকুল ঝুটা সর্দার, বিলকুল ঝুটা।'

ইতিহাস বলে যে, পুরাকালীন হিন্দুরাজারা তাদের প্রজাদের সন্তানের তুল্য মনে করতেন, তেমনি এই পিকপকেট সর্দার মুন্সীরামও তার এই সব চেলা-চামুণ্ডাদের নিজের সন্তানের মতই দেখে থাকে। এদের কেউ ধরা পড়লে তার হয়ে মামলা লড়া কিংবা তাদের কারো জেল হলে তার পোষ্যদের ভরণপোষণ করা তার ছিল অন্যতম কর্তব্য। এই কয়দিন ছেদি ও করিম একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাওয়ায় তাদের জন্য সর্দারের চিন্তার শেষ ছিল না। তাই হাফিজকে দেখে সর্দার ব্যস্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া খবর উনলোককো, ভাই। ওকিল বাবুসে কুছ পাত্তা মিলা? উ লোক কাঁহা পাকড় গিয়া?'

করিম ও ছেদির জন্যে সর্দারের এই উতলা ভাব দেখে হাফিজের রাগ দশগুণ বেড়ে গেল। এমন দয়ালু সর্দারের সঙ্গেও তারা কি না বেইমানি করতে পারল! সর্দারের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে রক্তচক্ষু হাফিজ উত্তর করল, 'কাঁহা নেহি উলোক পাকড় গিয়া। ওকিলবাবু কোর্টসে খবর লিয়ে বলিয়ে দিলে। উ-লোক রূপিয়া লেকে সেরেফ ভাগ গয়া।'

ছেদি ও করিম যে এ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে তা সর্দার একবার ভাবতেও পারে নি। তার দলের সেরা সেয়ানা ছিল তারা। এমন ভাবে একদিন তাদের হারাতে হবে সর্দার কোনোদিন তা ভাবতেও পারে নি। এরূপ দুটো পাকা সেয়ানা তৈরি করতে সর্দারের পুরো দশ বছর লেগেছে। সর্দার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেয়া! তুম সাচ বোলতা?'

সর্দারের ন্যায় হাফিজের নিজেরও ছেদি ও করিমের উপর একদিন অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে নিজে যা যাচাই করে দেখে এসেছে তা সে অবিশ্বাস করে কি করে? রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাফিজ আরও একটু এগিয়ে এসে উত্তর করল, 'আলবাৎ ইবাত সাচ। মেরা গোয়েন্দাকো ভি খবর একই আছে।'

ঘরশুদ্ধ লোক হাফিজের কথা কয়টা অবাক্ হয়ে শুনল। উত্তেজনায় ও

রাগে তাদের দেহগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্দারের সামনে তারা কেউই কোনো কথা বলল না। আদেশের অপেক্ষায় শুধু সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে হাত মুঠো করে বসে রইল। হাফিজের কথায় সর্দারের লাল চোখের শিরাগুলো ফুলে উঠল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সর্দার ঘরের চারদিকটা একবার সরোষ-নয়নে দেখে নিল, তারপর সে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ক্যা হাফিজ, তুম সেকেগা ?'

দলের প্রতি এইরূপ এক নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি হয়ে থাকে মৃত্যুদণ্ড। সর্দার যে তাদের প্রতি এইরকম দণ্ডই দেবেন তা হাফিজের জানা ছিল। এ ছাড়া হাফিজের এও জানা ছিল যে তাদের এই দণ্ড দেওয়ার ভার সর্দার তার উপরই দেবেন। এজন্য হাফিজ এদিন প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। সর্দারের হুকুম পেয়ে হাফিজ তার ফতুয়ার তলা থেকে একটা দোধারা ধারাল ছোরা টেনে বার করে সেটা উপরে তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জান কবুল, বিলকুল।'

দলের অন্যান্য লোকেরা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। হাফিজের হাতে ছুরি দেখে তারাও এইবার ক্ষেপে উঠল। যে-যার পকেট থেকে এক একটা ছুরি বার করে লাফিয়ে উঠে বলতে শুরু করে দিলে, 'খুন করেঙ্গা, জানসে মারেঙ্গা।'

ঘরের কোণে একটা কাঠের মুগুর ছিল। একজন আবার মুগুরটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যেই ঘোরাতে আরম্ভ করে দিলে। সেদিন সে তাড়ি একটু বেশি খেয়েছিল। তাড়ির ঝোঁকটা তখনও তার যায় নি। মুগুরটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলে উঠল, 'আরে শালা ছেদিয়া, দাদঘানি তেরিয়া—'

চারদিকে একটা গোলমাল, চেঁচামেচি। কেউ আর কারও কথা শুনতে পায় না। এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্দারের রায় দেওয়ার কাজ তখনও শেষ হয় নি। সর্দার সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'চুপ রহো সব। চিল্লাও মাৎ। হাফিজ ভাইয়ো—'

ক্রোধে উন্মত্ত হাফিজ ছুরিখানা মুঠিবদ্ধ করে সর্দারের আসনের নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। সর্দারের ডাক শুনে এক লাফে এগিয়ে এসে হাফিজ উত্তরে বলল, 'হুকুম, সর্দার হুকুম। হাম সব কুছকো বাস্তে তৈয়ার হ্যায়।'

এইভাবে প্রিয় শিষ্য ছেদি ও করিমকে মৃত্যুদণ্ড দিতে স্বভাব-নিষ্ঠুর মুন্সী

সর্দারেরও চোখ থেকে এক ফোঁটা জল অলক্ষ্যে তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। নিজের হাতে গড়া জিনিস তাকে নিজেই আজ ভেঙে দিতে হচ্ছে। এ দুঃখ তার যে কোথাও রাখবার আর জায়গা নেই। হাফিজের কথায় সর্দার একটু ভেবে নিল ও তারপর দাঁত দিয়ে তার ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরে সে বলল, 'হাঁ, একদম জানসে খতম করো।'

হাফিজ মাথা নীচু করে সর্দারকে অভিবাদন জানাল ও তারপর ছোরা হাতে ঠিকরে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

হাফিজকে বেরুতে দেখে দলের আর সকলেও তার পিছু পিছু বেরিয়ে আসছিল। স্বভাবতঃই উত্তেজনার ভাব তখনও তাদের কাটে নি। তাদের এইভাবে উতলা হতে দেখে সর্দার ছুটে এসে তাদের আটকে দিলে ও তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেই বন্ধ দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই, খবরদার। চুপসে বৈঠ রহো—।'

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির ন্যায় এই অপরাধদলেরও কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার প্রয়োজন আছে। গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র—প্রতিটি তন্ত্রের মাধ্যমে সকলকেই সেই একজন মাত্র লোকেরই হুকুমমত জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। তাই সর্দারের ধমক খেয়ে এদের প্রায় সকলেই পিছিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এদের কেউ কেউ আবার একটু পরে এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'হামি লোকভি উস্‌কো সাথ যাবে।'

যে আনুগত্য মুন্সী সর্দার এতদিন বিনা আয়াসে পেয়ে এসেছে সেই নিরাবিল আনুগত্যের মধ্যে এই প্রথম বিপত্তি দেখা গিয়েছে। তাই এখানকার আর বাকি সাকরেদদের মধ্যে বোধ হয় সর্দারের আদেশ পালন করবার জন্য আজ এত হুড়োহুড়ি দেখা যায়। এদের সকলেই এখন তাদের সর্দারকে বুঝাতে চায় যে, ছেদি ও করিমের মত তারা কেউই বেইমান নয়। তাদের দিক হতে তার আদেশ পালনের এই আগ্রহাতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সর্দার বন্ধ দরজার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর করল, 'উ নেহি সেকবে তব তু লোক তো মেরি বাস্তে মজুত হ্যায়ই।'

দেওয়ালের সেই ফুটো দুটো দিয়ে নরেনবাবু ও প্রণব ভিতরকার দৃশ্য দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। হাফিজকে বেরিয়ে যেতে দেখে তাদের চমক ভেঙ্গে গেল। বেশীক্ষণ সেখানে বসে থাকাও তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এই সুযোগে বেরিয়ে পড়াই তারা সমীচীন মনে করল।

তারা আর দেরি না করে হাফিজের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। হাফিজ একরকম ছুটেই সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল। পিছন দিকে ফিরে দেখবার তার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন তার আজ না থাকবারই কথা। যে অপরের মাথা নিতে চলেছে নিজের মাথার তোয়াক্কা সে থোড়াই করে। সাবধানতা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হলেও প্রণব ও নরেনবাবুর পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল। নরেনবাবু ও প্রণব তাই হাফিজ ও নিজেদের মধ্যে দূরত্বটুকু বজায় রেখে তার পিছন পিছন রাস্তার উপর বেরিয়ে এল। হঠাৎ নরেনবাবু ও প্রণবকে বেরিয়ে আসতে দেখে রামদীন ধড়মড় করে উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া হুজুর সাব! কেয়া খবর আছে? আভি তো একঠো নিকাল গেল, হামি সে দেখিয়ে নিলাম।'

এইরূপ এক হঠাৎ-ঘটা নাটকীয় ঘটনাতে নরেনবাবুর মত একজন পাকা পুলিস অফিসারও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনি এই দু'কূলের কোন্ কূল বজায় রাখবেন! এখন তিনি এই পিকপকেটদের এই বিরাট গ্যাঙ্গটাকে পাকড়াও করবেন, না একটা খুনের অপরাধ নিরোধ করবার জন্যে অন্য এক স্থানে রওনা হয়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি যথাকর্তব্য ভেবে নিয়ে নরেনবাবু ইশারায় রামদীনকে চুপ করতে বলে, দূর থেকে তাকে হাফিজকে দেখিয়ে দিয়ে নীচুস্বরে বললেন, 'যাও আভি উস্‌কো পাছু পাছু। উ আদমী কাঁহা যাতা ঠিকসে দেখো। সেকেগা তো পঞ্চাশ রূপেয়া বখশিস্ মিলেগা, সমঝে?'

১২

করিম ও ছেদির ব্যবহার আমিনাকে খুব বেশী রকমেরই একটা আঘাত দিয়েছিল। দুঃখ কষ্ট ভোলবার একমাত্র ঔষধ বোধহয় সুরা। তাই দিন-দুই ধরে আমিনা শুধু মদ খেয়েই চলেছে। মদ ছাড়া আর কিছুই এই দু'দিন সে খায় নি। শোবার ঘরের মেঝের তলায় দিশী মদের যে কয়টা বোতল পোঁতা ছিল, তার সব ক'টাই উঠিয়ে নিয়ে সেগুলো প্রায় সে শেষ করে এনেছে।

দাওয়ার ওপর বসে তখনও সে একটা বোতল উপুড় করে তার ভেতরকার তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে একটি পাত্রে ঢেলে নিচ্ছিল, এমন সময় বাড়িওয়ালী লছমী সর্দারণী ছুটে এসে বোতলটা আমিনার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'আরে তু কিরে! তুহর ভাবনা কি? উস্‌সে বহুৎ আচ্ছা আদমি তুহোর মিলবে। এত্‌নামে তু ঘাবড়াস কেন? এই দেখ্‌ না, কেত্‌না খুপসুরত আদমি হাফিজ মিয়া হ্যায়। উ তো তুহোরাস্তে হামেসা হামকো দিক কোরে। বোলতো উসকো হামি ডাকিয়ে লি।'

দু-তিনটে বোতল উজাড় করলেও আমিনার বিশেষ নেশা হয় নি। একে এগুলো পুরানো দেশী মদ। মদের বোতল কয়টা অনেকদিন ধরেই মাটির নাচে পোতা ছিল। এজন্য তাদের কার্যকরা শক্তি যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তবু তা আমিনাকে কিছুমাত্র অভিভূত করতে পারে না। মদ কেন, সাপের বিষেও বোধহয় সেদিন তার কোন ক্ষতি হত না।

আমিনা বেইমানিকে চিরদিনই ঘৃণা করে এসেছে! ছেদি ও করিম তার সঙ্গে বেইমানি করলেও সে কারো সঙ্গে রাগের মাথায়ও বেইমানি করতে চায় না। যদি করিমকে ছেড়েই দিতে হয় তো তাকে বলে কয়েই সে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ লছমনিয়ার কাছ হতে এই অন্যায় প্রস্তাব শুনে রাগ করতে পারল না; ধীরভাবে লছমনিয়ার এই উপদেশগুলো গলাধঃকরণ করে আমিনা সহজভাবে উত্তর করল, 'কোন্ আদমি? হাফিজ? তুমকো বোল দিয়া নেই যে, উসকো নাম মেরি পাশ মাৎ লেও।'

হাফিজের লক্ষ্য অনেকদিন ধরেই এই আমিনার ওপর ছিল। তাদের মধ্যে একটা সম্প্রীতিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে এসে গোল বাধাল ছেদি। কোথা থেকে এসে জুটে গিয়ে সে আমিনাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে বন্ধু করিমের হাতে তুলে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়। সেই থেকে হাফিজের সঙ্গে ছেদি ও করিমের একটা দারুণ মন কষাকষি চলেছে। তারা একই দলের মধ্যে থেকে একই সর্দারের অধীনে এক সঙ্গে কাজ করলেও কাজের বাইরে তাদের সম্পর্কটা খুব প্রীতিকর ছিল না। হাফিজ লছমীর সাহায্যে আমিনাকে করিমের কাছ থেকে ভাগিয়ে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে হাফিজ এতদিন পর্যন্ত কৃতকার্য হয় নি।

লছমী সেদিনও সকালে পল্টুয়ার মারফৎ হাফিজের কাছ থেকে নগদ দশ টাকা গোপনে উৎকোচ নিয়েছে, আমিনার মন হাফিজের দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। এদের এই বজ্জাতির বিষয়টা কিন্তু আমিনার অগোচর ছিল না। আমিনা পল্টুয়ার স্ত্রীর কাছ থেকে খবরটা আগেই পেয়েছিল। সে আঁচলের খুঁট থেকে একটা দশ টাকার নোট লছমীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই লে টেকা সে হামি ভি দিচ্ছে। আভি বোল্ করিমকো খবর-উবর কুছ মিলি ?

আমিনার এই কথায় লছমী চট করে একটু ভেবে নিয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ কেয়া বাৎ, পল্টু তুহকে বোল যাওত নি ?'

আমিনা লছমীর এই কথায় একটু আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। তাই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে তাকে বলল, 'নেহি। উতো একদম্ ইঁহি পর আয়ে নেহি। বলিয়ে, বলিয়ে উসকো কুছ খবর মিলি ?'

শেষের কথা কয়টি আমিনা লছমীকে খুব অনুযোগের সঙ্গেই বলল। আমিনা যে করিমকে কত ভালোবাসে লছমীর তা জানা ছিল। করিমের জন্য আমিনার এই ব্যাকুলতা লছমীকে একটু সন্ত্রস্ত করে তুলল। সে আমিনার কথার কোন উত্তর নিজে না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেয়া বাৎ দেখো। আরে ও পল্টুয়া, পল্টুয়া,—আ—তেনিআও ভাই ইধার।'

পাশের লাগোয়া বাড়িটাতে পল্টুরা থাকে। ইদানীং সে টাকার লোভে লছমীর সমব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে লছমীর ন্যায় সেও কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে বসেছে। সে লছমীর হাঁকডাকে, উঠানের ছাঁচি বেড়ার তলা দিয়ে দেহটাকে গলিয়ে নিয়ে আমিনাদের বাড়ির ভেতর এসে পড়ে উত্তর করল, 'আরে ও মৌউসি, কেয়া খবর, ডাকত কেন ?'

আমিনা যে কি ধরনের মেয়ে তা লছমীর ভালোরূপেই জানা ছিল। এই সঙ্গে তার এও জানা ছিল যে, আমিনা তাকে আদপেই বিশ্বাস করে না। মাত্র এই একটা কারণে তাকে পল্টুকে হাত করে তার সম্ভাব্য উপার্জনের কিছুটা তাকে ভাগ দিতে হয়েছে। তাই আমিনাকে যা বলবার তা সে পল্টুয়াকে দিয়েই বলাতে চায়। এই ব্যাপারে আগে-ভাগে যা কিছু গড়াপেটা তা সেরে রাখা হয়েছে। পল্টুয়াকে একেবারে তাদের বাড়ির ভিতর এসে দাঁড়াতে দেখে লছমী বলে উঠল, 'আমিনাকে সে সবকুছ বোল, করিম তুকো কি বল্‌ল, উ সব বাত তু উনকো আভি বোল !'

করিমের সঙ্গে পল্টুয়া চামেলির বাড়ি গিয়ে দেখা করায়, চামেলির সামনেই করিম আমিনার উদ্দেশ্যে যা বলেছে, তা বিশদভাবেই পল্টুরাম প্রায় মুখস্থর মতই গড় গড় করে বলে গেল। আমিনা ধীরভাবে তার সেই সব কথা শুনল। তারপর একটু চুপ করে কি ভেবে নিয়ে গুম হয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। আমিনাকে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখে লছমী ইশারায় পল্টুয়াকে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর তার বলা হল না। চমকে উঠে তারা চেয়ে দেখল, কোথা থেকে খোলা ছুরি হাতে রুদ্রমূর্তিতে স্বয়ং হাফিজই তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দিয়েই হাফিজ হেঁকে উঠল, 'তুলোক হিঁয়া কেয়া করতা, অ্যাঁ? করিম কাঁহা, ইঁহা আয়ে?'

এখানে যে করিম বা ছেদি নেই বা থাকতে পারে না, তা হাফিজ আগে থেকেই জানত। তবু যদি এসে থাকে এই মনে করে জায়গাটা সে একবার দেখে যেতেই এসেছে। তা ছাড়া আমিনার সঙ্গে দেখা করে করিমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাকে বিশেষ করে জানিযে যাবারও তার ইচ্ছা ছিল।

অনেকক্ষণ হাঁকাহাঁকির পরেও আমিনাকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে, ছুরিখানা জামার হাতায় লুকিয়ে ফেলে, হাফিজ লছমীকে জিজ্ঞেস করল, কেয়া রে, উসকো ভি সাথে লিয়ে গেছে নাকি?'

হাফিজের কথার কোন উত্তর না দিয়ে লছমী তাকে কলতলার দিকে টেনে এনে চুপিচুপি অনেক কথাই শুনিয়ে দিল। লছমীর সেই সব বাহাদুরির কথা শুনে হাফিজ বলে উঠল, 'আরে, এ তু কহৎ কি, তার সে পাখি পাইলে গেলো, আ? সাবাস—।'

লছমী চুপিচুপি কথা বললেও হাফিজ জোরে জোরেই তার উত্তর দিচ্ছিল। আমিনার ঘর থেকে তাদের সব কথাই আমিনা শুনেছে। হাফিজের সেখানে আগমন তার কাছে অগোচর ছিল না। হঠাৎ আমিনাকে রুক্ষবেশে দাওয়ার উপর এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। চোখ দুটো তার ঠিক জবাফুলের মতনই টকটকে লাল। মাথার চুলগুলো চোখের উপর এসে পড়েছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই।

আমিনাকে দাওয়ার ওপর এসে দাঁড়াতে দেখে হাফিজ গম্ভীরভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুহোর করিমা কোথা? উসকো সাথ মিলনে চাহি। সর্দারজীকো হুকুম, কাঁহা উ?'

মাটির ওপর লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা সাবধানে তুলে নিতে নিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে আমিনা উত্তর করল, 'উন্‌কো বাত হামি কি জানে। উ হামার কোহি নেহি আছে।'

হাফিজ কি উদ্দেশ্যে করিমের খোঁজ করছে তা আমিনা সহজেই বুঝেছিল। হাফিজের কথায় আমিনার চোখে জল এল। আমিনার মনের এই ভাব হাফিজের চোখ এড়ায় নি। আফিজ দাওয়ার ওপর উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে আমিনার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'এত্‌নামে তু ভাই দুখ না করিস। উ শালে বিলকুল বেইমান আছে।'

হাফিজের কথায় আমিনা কোন উত্তর করল না। আমিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে তার হয়ে উত্তর করল পণ্টুয়া। এক ঢিলে দুই পাখি মারবার এমন সুযোগ ছাড়বার পাত্রই সে নয়। এই সুযোগে হাফিজকে তার একটু খুশি করাও হবে ও সেই সঙ্গে করিমের উপর আমিনার মন বিষিয়ে দেওয়াও যাবে। সুযোগ বুঝে পণ্টুয়া আপন মনে বলে উঠল, 'জরুর উ শালে বেইমান আছে। হামাকে কিনা স্রেফ বলিয়ে দিলে, আমিনাকে উ নেহি মাঙতে।'

হঠাৎ আমিনার কি মনে হল সেই জানে। ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। সে কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। শেষে নাচার হয়ে হাফিজেরই বুকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

হাফিজ এ জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে এতে একটু অবাক্ হয়েই গিয়েছিল। পরে কি ভেবে সে আমিনাকে বুকের মধ্যে টেনে দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। আমিনা কিন্তু এতে এইদিন কোন বাধা দিল না। কিন্তু নিজেকে তার বুকের মধ্যে এলিয়েও দিল না। শুধু সেই-ভাবেই সেখানে সে পড়ে রইল। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ সময় অতি-বাহিত হয়ে গেল। মুখ থেকে কোনো কথা বার হয় না। হঠাৎ আমিনা গা ঝাড়া দিয়ে হাফিজের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাফিজের দিকে চেয়ে বলল, 'হাফিজ!'

গদগদ কণ্ঠে হাফিজ আমিনার ডাকে উত্তর করল, 'আমিনা! আমি—।'

একটু চুপ করে থেকে আমিনা হাফিজকে বলল, 'একঠো কাম করনে স্কেকেগা?'

হাফিজ আমিনার জন্যে অনন্ত দোজাকে যেতেও প্রস্তুত ছিল। এমন করে সে তাকে হাতের মুঠোতে পেয়ে যাবে তা সে কোনোদিন আশা করে নি। এতক্ষণ সে যেন স্বর্গের মন্দাকিনী হতে সুধা পান করছিল। হাফিজের আশঙ্কা ছিল যে, সে তার কাছে করিমের জীবন ভিক্ষা চেয়ে তাকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু আমিনা এরূপ কোনো অনুরোধের ধার-কাছ দিয়েও গেল না। ভাগ্যের এর চেয়ে সুন্দর নিদর্শন সে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে নি। আমিনার এই অনুরোধ শুনে হাফিজ তার স্বভাবসুলভ কর্কশ গলায় হেঁকে উঠে বলল, 'কাহে নেহি স্তেকেগা বিবিজান। তুহোর আস্তে হাম জান ভি দেঙ্গা।'

নারীর ওপর নরের অবিচার অত্যাচার নারী কখনও ভোলে না, তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে তা গোপন করে রাখে মাত্র। এই গোপন করার ক্ষমতাকে ভুল করে লোকে ক্ষমা বলে। নারীর অদম্য ভালবাসা, পুরুষের প্রতি নারীর ঐরূপ সহজ ক্ষমার বিশেষ সহায়ক হয়, কিন্তু এই গোপন বিতৃষ্ণা নারীর কোন অসাবধান বা দুর্বল মুহূর্তে তার নিভৃত অন্তর থেকে যখন ঝড়ের মত বের হয়ে আসে, নারী হয় তখন প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাক্ষসী। তা ছাড়া আমিনা ছিল বস্তির ঠিক মুক্ত বিহঙ্গমেরই মত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আমিনা হাফিজের কাঁধ দুটো দুই হাতে জোর করে চেপে ধরে, তাকে বার দুই ঝাঁকানি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'মাঙ্গতে করিমকো শির, করিমকো খুন, স্তেকেগা?'

হাফিজের যে উত্তেজনাটুকু এতক্ষণে নিবে আসছিল, তা এইবার আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমিনা যা চায়, সেও আজ তাই চায়। এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? সে তার ছুরিখানা ডানহাতের মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'জরুর হাম স্তেকেগা। হামিভি এহি মাঙ্গতা। লেকেন উ কাঁহাপর বাতাও।'

করিম ও ছেদি যে এখন কোথায় তা জানবার জন্যে এই কয়দিন আমিনা প্রাণপাত করেছে। কিন্তু কেউই তাদের কোনও সংবাদ তাকে এনে দিতে পারে নি। কিন্তু হাফিজ যে তাদের লছমী ও পল্টুর সাহায্যে খুঁজে বার করবে তাতে আর তার সন্দেহ ছিল না। হাফিজের উপর মুন্সী সর্দারের আদেশের সংবাদ সে ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। এখন কি উদ্দেশ্যে আমিনা হাফিজের সঙ্গে ওদের ওখানে যেতে চায় তা সেই

জানে। হাফিজের কথায় আমিনা পল্টুয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'তু তো সে চামেলিকো কুঠি দেখিয়ে আসছিস। আভি চোল তুম ইনলোকোকো সাথ।'

ব্যাপার যে গুরুতর রকমের একটা কিছু হতে চলেছে, তা পল্টুরা এদের এই সব কথা শুনে সহজেই বুঝে নিতে পারল। খামকা খুন-খারাপীর মধ্যে পল্টুয়া আর নিজেকে জড়াতে চায় না। এইজন্য সে একটু ইতস্ততঃ করছিল। তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে হাফিজ ধমক দিয়ে বলল, 'জানকা পরোয়া করিস তো আভি চোল হামি লোককো সাথ। নেহি তো তুহোর জান্ হামি পহেলাহি লিবে।'

বেগতিক দেখে পল্টুয়া আমিনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বভাব-ভীরু পল্টুয়ার মুখ হতে আর একটা কথাও বার হল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমিনা তার হাত ধরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'তুহর ইসমে ডর কি আছে, হামিভি তোর সাথে চলছে—আও—ও।'

পল্টুয়া বোধ হয় এরকম বিপদে জীবনে কোনোদিন পড়ে নি। এখন হাফিজের মত একজন নির্দয় গুণ্ডার হাত হতে রেহাই পাওয়াও দুষ্কর। এইরকম একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে তাকেও না ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হয়। এদিকে তাকে রামে মরলেও মেরেছে, আবার রাবণে মারলেও তাকে মরতে হবে। এখন তার একমাত্র ভরসা এই যে আমিনা তার সঙ্গে যাচ্ছে। মুশকিল আসানের শেষ চেষ্টা স্বরূপ সে লছমীর খোঁজ করে জানল যে সে ততক্ষণে সেখান থেকে বেমালুম সরে পড়েছে। অগত্যা নাচার হয়ে পল্টুয়া এদের উদ্দেশ করে উত্তর করল, 'লেকেন উলোককো ঘরমে হামি নেহি ঘুষবে। বাহারসে হামি উনলোককো দেখিয়ে দিবে।'

ইন্‌ফরমার রামদীন এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পর্দার পাশের ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি দিতে দিতে এদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছিল। হাফিজকে অনুসরণ করে কখন যে সে এদের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা এদের মধ্যে কেউই টের পায় নি। পল্টুয়াকে সঙ্গে করে হাফিজ আমিনাকে নিয়ে বাইরে আসতে দেখে সে একটু পাশে সরে দাঁড়াল। তারপর সে নরেনবাবু ও প্রণবকে এই সব দারুণ সংবাদ দেবার জন্যে মার্কাস স্কোয়ারের দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটে চলল।

১৩

তখনকার কুখ্যাত মার্কাস স্কোয়ারের উত্তর ধার। পূর্বে সেখানে বিখ্যাত গুণ্ডা সর্দার রহিমের বাড়ি ছিল। পুলিসের হুল্লোড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গুণ্ডারা অনেক আগেই স্থানটি ত্যাগ করেছে। গুণ্ডার দল বিলীন হলেও তাদের তিন পুরুষের বাসভূমি ভাঙা মাঠকোঠাগুলো তখনও পর্যন্ত খালিই পড়েছিল। মাঝে মাঝে ছিঁচকে চোররা এসে সেখানে আশ্রয় নিত। কিন্তু সম্প্রতি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের লোকেরা বস্তিটা ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে।

সেই আধ-ভাঙা মাঠকোঠার আঙিনায়, জন বারো তের সিপাই ও একজন মোটা গোছের জমাদার, অফিসারদের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। হঠাৎ প্রণব ও নরেনবাবুকে সেই দিকে আসতে দেখে জমাদার হেঁকে উঠল, 'সেলাম হুজুর।'

নরেনবাবু গম্ভীরভাবে সিপাইদের একটা রিটার্ন স্যালিউট দিয়ে প্রণবকে বললেন, 'একটা সাদা কাগজ দিতে পার?'

প্রণব মনে করেছিল যে নরেনবাবু দূরে মোতায়েন উর্দিপরা সিপাইদের ডেকে নিয়ে পুনরায় মুন্সী সর্দারের আড্ডাঘরে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা না করে তিনি একটুকরা কাগজের সন্ধান করতে থাকায় প্রণব একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এক টুকরো কাগজ প্রণবের পকেটে রাখা ছিল। প্রণব পকেট থেকে চট করে একটুকরো কাগজ বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কাগজ কি হবে, স্যার?'

মুন্সী সর্দারের দলের বহু লোক এইদিন তার সেই আড্ডাঘরে জড় হয়েছিল। তা ছাড়া তাদের দুজনার বেইমানিতে এরা রীতিমত গরম হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় বেশী লোকজন না নিয়ে ওদের আড্ডায় ঢুকলে অযথা একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে পারে। এইজন্য তিনি থানা হতে আরও একদল সিপাই আনিয়ে নেবার জন্য এক টুকরো কাগজ প্রণবের কাছে চেয়েছিলেন।

নরেনবাবু কাগজখানা প্রণবের হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন, 'থানায় একটা শ্লিপ লিখে পাঠাই, ইসুফ সাহেবকে; আরও জন কুড়ি সিপাই নিয়ে সে চলে আসুক। এদের আড্ডাঘরটা ভাল করে ঘেরাও করতে হবে। হাফিজের অপেক্ষায় ওরা আজ বেশীক্ষণ ওখানে থাকবে মনে হয়।'

নরেনবাবু তাড়াতাড়ি কাগজখানার ওপর গোটা কয়েক পেন্সিলের আঁচড় টেনে, সেখানা একজন সিপাইয়ের হাতে দিলেন। প্রথম হতেই ট্যাক্সি দুখানা সেইখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের তখনও ছেড়ে দেওয়া হয় নি। নরেনবাবুর নির্দেশমত সামনের ট্যাক্সিটাতে চেপে সিপাইটি থানার দিকে চলে গেল। থানা হতে আরও সিপাই আনবার ব্যবস্থা করে নরেনবাবু প্রণবকে বললেন, 'রামদীন যে এখনও ফিরল না দেখছি। শেষে পকেটমারটার সঙ্গে মিশে গেল না তো?'

ইন্‌ফরমাররা যে অনেক সময় এইরূপ বদমায়েসী না করেছে তা নয়। অনেক সময় পুলিসকে চোরের খবর আনব বলে তারা পুলিসের গতায়তের খবরই চোরকে দিয়ে এসেছে। নানা প্রকার মিথ্যা বলে এরা শুধু টাকাই আদায় করে নি, অনেক সময় নানা ভাবে পুলিসকে হয়রানি করে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গিয়েছে। তবুও এদের সাহায্য ক্ষেত্র-বিশেষে না নিলেও পুলিসের চলে না। তাই উত্তরে প্রণব একটু ভেবে নরেনবাবুকে বললে, 'তা বলা যায় না স্যাব। এরা তো সময় সময় দু'ধারেই কাটে। দে কাট্ বোথ ওয়েজ্!'

নরেনবাবু ও প্রণবের সন্দেহ অমূলক ছিল। রামদীন একটু উঁচু ধরনের ইন্‌ফরমার। সামান্য কিছু লাভের প্রত্যাশায় পুলিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অর্থ উপার্জনের চেয়ে পুলিসের বিশ্বাস উৎপাদনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ দেখা গেল রামদীন ছুটতে ছুটতে সেইদিকেই আসছে। রামদীন আমিনার বাড়ির দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে যা দেখেছিল বা শুনেছিল, তা বিশদভাবে বলে গেল। রামদীনের কথাগুলো শুনতে শুনতে নরেনবাবু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুখের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে নরেনবাবু বললেন, 'সর্বনাশ! শেষে একটা মার্ডার হবে নাকি! এ্যা?'

রামদীনের কাছ হতে হাফিজ ও করিম সম্পর্কীয় সংবাদটা শুনে প্রণবও নরেনবাবুর মত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জেনে শুনে একটা খুন হতে দিয়ে

পরে সে খুনের তদন্ত করার কোনও অর্থ হয় না। এইরূপ একটা ঘটনা ঘটতে দিলে পুলিসের সঙ্গে খুনে লোকদের কোনও নীতিগত প্রভেদ থাকে না। রামদীনের দেওয়া এই সব খবর শুনে প্রণব নরেনবাবুকে বলল, 'প্রিভেনশন্ ইজ বেটার দ্যান কিওর। চলুন স্যার, আমরাও এখুনি সেখানে গিয়ে পড়ি।'

এমন সময় রাস্তায় তিনখানা ট্যাক্সি দেখা গেল। থানার থার্ড অফিসার ইসুফ সাহেব জন-কুড়ি সিপাই সঙ্গে নিয়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনখানি ট্যাক্সিতে শুধু 'লালপাগড়ি'র দল ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে তাদের দেখা যায় বড় বড় রেগুলেশন স্টিক। এত শীঘ্র ইসুফ সাহেব তৈরি সিপাইয়ের দল নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারবেন, তা নরেনবাবু আশা করেন নি। তিনি এদের দেখে খুশি হয়ে প্রণবের কথার উত্তর করলেন, 'তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি এক মত, প্রণব! এখুনি সেখানে গিয়ে এই খুনটা আমরা প্রতিরোধ করব। কিন্তু এদের এখানকার এই আড্ডা-ঘরটায় তো একবার হানা দিয়ে যেতে হবে। এখন এসো এখানকার রেইড্‌টা আগে সেরে যাই।'

ট্যাক্সি তিনখানা সশব্দে ছুটে এসে একসঙ্গে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি তিনখানা শব্দ করে উঠল ক্যাঁ-ক্যাঁচ্। নরেনবাবু আর দেরি না করে চাপা গলায় প্রণবকে বললেন, 'চলে এস, কুইক।'

অফিসারদের তাঁর আদেশ জানিয়ে দিয়েই নরেনবাবু ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। প্রণবও আর দ্বিরুক্তি না করে নরেনবাবুর অনুসরণ করল। প্রণব ও নরেনবাবুকে ছুটতে দেখে থানার থার্ড অফিসার ইসুফ সাহেব ও তাঁর সঙ্গের সিপাইরা হুড়মুড় করে ট্যাক্সি তিনখানা থেকে নেমে পড়ে, লাঠি হাতে প্রণব ও নরেনবাবুর পিছন পিছন ছুটতে শুরু করে দিল। কেউ কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন মনে করল না। পুলিসের দল আড্ডাঘরের সামনে পৌঁছবামাত্র নরেনবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রণব, তুমি তোমার সিপাইদের নিয়ে ওপরে উঠে যাও। ইসুফ, তুমি তোমার দল নিয়ে নীচে দিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করে ফেল, বুঝলে? আর একটুও তোমরা দেরি কর না, কুইক্।'

নরেনবাবুর নির্দেশমত নিমেষে পুলিসবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের একদল নীচের রাস্তা দিয়ে বাড়িটার চার পাশ ঘেরাও করে ফেলল ও তাদের অপর দল তরতর করে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে দিল।

অনেকগুলি লোকের পায়ের চাপে কাঠের ভাঙা সিঁড়িটা মড়মড় করে উঠল। সশব্দ বুটের ও নাগরা জুতোর আঘাতে দোতলার কাঠের বারান্দাটা থরথর করে কেঁপে উঠছিল।

পুলিসের আগমন পিকপকেটদের কাছে বেশীক্ষণ অগোচর থাকে নি। নাগরা জুতোর শব্দে আড্ডাঘর থেকে খোদ সর্দার বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখল, পুলিসের বড় একটা দল সার বেঁধে, তাদের এই মাঠকোঠার বারান্দার ওপর দিয়ে তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

পুলিস নজরে পড়বামাত্র সর্দার চট করে পিছিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে বলল, 'খবরদার ভাইলোক, পুলিস আগিয়া।'

পুলিসের নাম শুনে, ছুরি, কাঁচি, লাঠি—যার কাছে যা ছিল, তাই নিয়ে সকলেই শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠল। কেউ কেউ সর্দারের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া সর্দার, লড় যায়?'

পিকপকেট দলের মুন্সী সর্দারের এই ব্যবসা হালের নয়। গুরুপরম্পরায় এটা তাদের দু'পুরুষের হতে চলল। সে নিজেই প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে সর্দারের পদে উন্নীত হয়েছে। এইরূপ পুলিসের হামলা এর আগে প্রায় বিশ-ত্রিশ বার তাকে সামলাতে হয়েছে। সাকরেদদের এই অবিবেচনাপ্রসূত প্রস্তাবের উত্তরে মুন্সী সর্দার গম্ভীরভাবে বলল, 'ক্যা হোগা লড়কে দু'ঘণ্টাকো বাস্তে। পুলিসসে তুমলোক লড়নে থোড়াই সেকেগা। উলোক বহুত আদমি লেকে আসেছে। উনলোককো সাথ পিস্তল ভি জরুর হোবে।'

সর্দারের এই উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। এমনি হয়তো তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা হবে না। জোর করে যদি পুলিস তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকেও দেয় তাহলেও প্রমাণের অভাবে আদালত থেকে তারা খালাস পাবে। কিন্তু এখন অযথা পুলিসের সঙ্গে লড়ালড়ি করতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হবে তা থেকে তারা রেহাই পাবে না। সর্দারের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে এদের মধ্য হতে একজন বলে উঠল, 'তব হাম লোক ভাগ যায়।'

এই পুলিসী হামলার রীতিনীতি সম্বন্ধে মুন্সী সর্দারের ভালো করেই জানা ছিল। তাদের পালাবার পথগুলো আগে ভাগে বন্ধ না করে পুলিসের দল নিশ্চয়ই উপরে আসে নি। বাড়িটা যে ইতিপূর্বেই পুলিস ঘিরে রেখেছে তাতে মুন্সী সর্দারের একটুও সন্দেহ ছিল না। তার সাকরেদদের এইরকম আজে-বাজে প্রশ্নে একটু ম্লান হাসি হেসে মাথা নেড়ে সর্দার উত্তর করল, 'কেইসেন তুলোক ভাগেগা? কোঠিতো উনলোক ঘির লিয়া।'

সর্দারের কথায় সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কারুর মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বের হল না। এদের সর্দার কিন্তু এই ব্যাপারে একটুও ঘাবড়ায় নি। এই অবস্থায় পড়লে কি কি করতে হবে তা তার পূর্ব হতে ভাবা ছিল। এখন তাতে রূপ দিতে যা বাকি আছে। একটু পরে সর্দার মৃদু হেসে বলে উঠল, 'কুছ ডরো ভাই মাৎ। পুলিস পুছেগা ত বোল্ দেও, হামিলোক ইঁহিপর পঞ্চায়েতি করতা। বৈঠ যাও সব।'

সর্দারের কথায় সকলে গোল হয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। মুন্সী সর্দার তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকি ঘরের কোণ থেকে তুলে এনে সেটা তাদের মাঝখানে রেখে দিল। তারপর সে উপরের তাক থেকে সিঁদুর-মাথানো গণেশ মূর্তিটা নামিয়ে এনে সেটা এই জলচৌকির উপর সাজিয়ে রেখে তার খাজাঞ্চির দিকে চেয়ে ইশারা করল।

সর্দারের ইশারা পেয়ে গোল-টুপি-পরা খাজাঞ্চি সাহেব মেঝের উপরকার বাকি টাকাগুলো তার জেবের ভিতর ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একখানা গজল ধরে বসল—

হামেরি গুরু ভরসাহি হে—
হামি তুহর গীত গাহ
তুহ চরণ পরে-এ—

বাইরের বারান্দার ওপর আগুয়ান সিপাইদের জুতোর শব্দ শুনতে শুনতে সর্দারজী একটু ভেবে নিল। তারপর চট করে একখানা চাদর মেঝের ওপর বিছিয়ে ফেলে, কোণের সিন্দুকটা থেকে গোটা পঞ্চাশেক ব্যাগ, কিছু কাগজ-পত্র, কয়েকটা ছোট ফটো, চিঠির টুকরো বের করে চাদরটার ওপর ফেলে দিল। জিনিসগুলো অপ্রয়োজনীয় হলেও বুদ্ধির দোষে তারা তখনও সেগুলো নষ্ট করে নি। সর্দারের উদ্দেশ্যটা দলের অন্যান্য লোকেরাও সহজেই বুঝে নিতে পারল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পকেট থেকে ছোট বড় ছুরি

কাঁচি, রেজার ব্লেড প্রভৃতি টপ টপ বের করে চাদরটার ওপর ঝপ ঝপ করে ফেলে দিল। সর্দার তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো চাদরটা দিয়ে বেঁধে ফেলে সেই চাদরের পুঁটলিটা বারান্দার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলল। এরপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে সাকরেদদের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠল, 'ঠিক হ্যায় ভাই, বহুৎ বহুৎ আচ্ছা। বোলো, হা-মেরি গুরু ভরসা, হা-হায়। বোলো একসঙ্গমে হা—।'

এইদিন মুন্সীমিয়ার এই পিকপকেট দলের ভাগ্যই বোধহয় ছিল খারাপ। এত সব সুবন্দোবস্ত করেও তাদের এই চালাকি ধোপে টিকল না। তাদের ভাগ্যদোষে নীচে রাস্তার ওপর, যেখানটায় নরেনবাবু দাঁড়িয়েছিলেন তার কিছু দূরে পুঁটলিটা এসে পড়েছিল। পুঁটলিটা নীচে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরেনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'প্রণব! পুলিস এসেছে তা ওরা জেনে গেছে। ভালো করে ওদের ওপর নজর রেখো। ওদের কেউ যেন না পালাতে পারে।'

প্রণব ইতিমধ্যে এই মাঠকোঠা হতে বেরুবার প্রতিটি অলিগলির মোড়ে একজন করে সিপাই মোতায়েন করে রেখেছে। তা ছাড়া রাস্তার ওপরও এখানে ওখানে সিপাই রেখে সারা বস্তিটাই সে ঘিরে ফেলেছে। এর উপর মাঠকোঠার বারান্দাটা ঘিরেও বহু সিপাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এরা যে সেখান হতে পালাতে পারবে না, সেই সম্বন্ধে প্রণব নিশ্চিতই ছিল। তবে সুযোগ পেলে প্রামাণ্য দ্রব্যের কিছু কিছু তারা নষ্ট করে দিলেও দিতে পারে। তাই নরেনবাবুর এই সাবধান বাণী তাঁর কানে যাওয়া মাত্র প্রণব সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গের সব ক'জন সিপাই নিয়ে হুড়মুড় করে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে জানাল, 'সব এখানে ঠিক আছে স্যার।'

পকেটমাররা মনে করেছিল যে প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুলিস যে পাকা খবর পেয়ে সেখানে এসেছিল, তা তারা জানত না। তাদের ধারণা ছিল—সদুত্তর দিতে পারলে, আর তাদের কাছে আপত্তি-জনক কিছু পাওয়া না গেলে পুলিস এমনিই সেখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু পুলিস বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে তাদের দেহ তল্লাসী নিতে দেখে, তারা আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই ব্যবহারে অবাক্ হয়ে সর্দারজী একবার জিজ্ঞাসা করল, 'ইসমে বাত কেয়া বাবু সাহেব, হামিলোক কিয়া কেয়া?'

'উ বাত পাছু মালুম হো যায়গা', তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রণব গম্ভীর-ভাবে বলল, 'লেকিন আভি নড়েগা ত পিস্তলসে শির উড়ায় দেগা। জানকো পরোয়া করো ত চুপসে বৈঠো।'

'এ কেয়া বাত্। কেয়া বোলে—এ-তো বড়ি জুলুমকো বাত্ হ্যায়।' বেশ একটু বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে মুন্সী সর্দার বলে উঠল, 'হিঁয়া তো হামি লোককো পঞ্চায়েত বৈঠা থা। উসকো বাদ হামলোক তেনি ঈশ্বরকো নাম লেতি। ইসমে হাম লোককো কসুর ক্যা হ্যায়?'

১৪

সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চামেলিরানী একটা সাপ্তাহিকের পাতা উলটে যাচ্ছিল—বোধহয় তার নিজের একখানি প্রতিকৃতির খোঁজে। খুব ঘটা করেই সম্পাদক মহাশয় তার লীলায়িত দেহখানি একটি হাফটোন রঙিন ছবির মধ্যে জাহির ক'রে দিয়েছে। ছবিখানি দেখতে দেখতে চামেলিরানী আপন মনেই হেসে ফেলল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার গম্ভীর হয়ে উঠল কি ভেবে—তা সেই জানে। ছবিখানার মধ্যে যেন তার গৌরবের চেয়ে লজ্জাই বেশী ফুটে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে উঠল। চামেলির মা দরজার কাছে চামেলিকে কি-একটা কথা বলবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। চামেলিকে বই বন্ধ করে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে সে বলল, 'সীতারাম আবার এসেছিল।'

সীতারাম একজন নামজাদা দালাল। বড়লোক ও রাজা মহারাজাদের সঙ্গে তার কারবার। ও-অঞ্চলে রূপসী মেয়েদের বড়লোক শিকার সেই জুটিয়ে আনে। তাকে বিরূপ করা যে কত ক্ষতিকর—তা অনভিজ্ঞা চামেলি না বুঝলেও চামেলির মা তা ভাল করেই বুঝত। চামেলির অত তলিয়ে বোঝবার প্রয়োজনও ছিল না। ভবিষ্যতের চিন্তা তখনও তাকে ত্যক্ত করে নি। চামেলি রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠে সোফার উপর বসে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'মা—আ। ফের তুমি—'

চামেলী রুদ্ধ অভিমানে তার মা'কে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘরের কোণের টেলিফোনটা বেজে উঠল, ক্রীং ক্রীং ক্রীং। অন্য সময় হলে চামেলী নিজেই টেলিফোনটা ধরত, কিন্তু সেদিন সে উঠল না, শুধু টেলিফোনটার দিকে চেয়ে তার বাজনা শুনতে শুনতে সেইখানেই বসে রইল। অগত্যা চামেলীর মা'কেই এগিয়ে যেতে হল। টেলিফোনের রিসিভারটি তুলে নিয়ে চামেলীর মা কথা বলতে শুরু করল—হ্যালো, কে? বল বাবা, নাম বল—আমার কাছে লজ্জা কি? আমি চামেলীর মা—রতীশবাবু?'

রতীশবাবুর নাম কানে যাবা মাত্র চামেলীর যা-কিছু রাগ বা অভিমান ঠিক কর্পূরের মতন উবে গেল। মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় ফুটে উঠল তার মুখে হাসি! এই রতীশবাবু ছিল চামেলীদের সিনেমা কোম্পানির একজন অন্যতম অভিনেতা। যে ছবিতে চামেলী নায়িকা হয়েছে সেই ছবিটার রতীশবাবু হচ্ছে নায়ক। তা ছাড়া ধনীর দুলাল রতীশবাবুর অদূর ভবিষ্যতে নিজেরই একটা ছবির ডাইরেকটার ও প্রোপ্রাইটার হবার কথা। সিনেমা জগতে উন্নতি করতে হলে এর মতন লোককে একটু খুশি করাও দরকার। রতীশবাবুর নাম শুনে সে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা মা'র হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এই—পাজি ছেলে কোথাকার, খুব কথার ঠিক থাকে তো, আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, হাঁ।'

রিসিভারটা ফোনের ওপর রেখে চঞ্চল গতিতে মুখ ফিরিয়ে মা'কে কি বলতে গিয়ে চামেলী দেখতে পেল পূর্বকথিত ছোকরাবাবু—নরেনবাবুর সুযোগ্য ভাগিনেয় অসিত কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অসিতকে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝোঁকটা কোনরকমে সামলে নিয়ে চামেলী জিজ্ঞেস করল, 'কিগো খোকা, তুমি হঠাৎ আজকে?'

অসিত জানত চামেলীর সেদিন সুটিং-এ যাবার দিন। অন্ততঃ চামেলী এতদিন তাকে এই কথাই বুঝিয়ে এসেছে। একটা দারুণ সন্দেহ নিয়ে অসিত সেদিন এসেছিল চামেলীর বাড়ি। চামেলীর দিকে একবার অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে ফোন করছিলে?'

দ্বিধাহীনভাবে চামেলী উত্তর করল' 'দাদাকে,—দা—দা। দাদা।'

টেলিফোনের ওপারের লোকটিকে চামেলীর একজন কল্পিত দাদা বলেই

অসিতের সন্দেহ হচ্ছিল। উত্তরে সে এই দাদাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে চামেলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইল, কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বার হবার আগেই চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল. 'ওরে চামি, বিনু এসেছে।'

বিনুর আগমনের কথা শুনে চামেলীর মুখটা কাগজের মত ফাকাসে হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল, সে শুধু বিব্রত নয়, সেই সাথে সে সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী অসিতের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর সে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বিন্‌দা, এই—এই বিন্‌দা—।'

চামেলী বিনদার নামে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অসিতকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার সে অবসর দিল না। অসিত একরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এত দাদার উৎপাত সেখানে সে পূর্বে কখনও দেখে নি। সে হতভম্ব হয়ে সেখানে চুপ করে বসে রইল।

দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল, তার সেই বিব্রত ভাব তখনও কাটে নি, সারা মুখে তার একটা অস্বস্তির ছাপ। জোর করে মুখে হাসি এনে চামেলী বলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে রয়েছ, না?'

গম্ভীরভাবে অসিত চামেলীকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কে, এখন এলেন?'

বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিল চামেলী। প্রথমটায় অদিনে অসিতের আগমন তাকে অতিমাত্রায় বিব্রত করে তুললেও শেষের দিকে অভিনয় চাতুর্যে তার মনের সহজ ভাব সে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। মুখের ওপর একটা সারল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে চামেলী অসিতের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে বলল, 'তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি? ভয় নেই, ও দাদা, পিসতুত ভাই।'

এত সাবধানতা সত্ত্বেও চামেলীর সেই বাক্যজাল অসিতের মনের সন্দেহ দূর করতে পারে নি। সন্দিগ্ধ মনে অসিত জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিলে না?'

দরজার পাশে দাঁড় করানো একটা রিমলেস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিতে নিতে চামেলী উত্তর করল, 'বাঃ রে! লজ্জা করে না বুঝি?'

অসিত আরও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে উত্তরে চামেলীকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে চামেলী অনুযোগ করে বলল, 'রাগ করো না লক্ষ্মীটি ভাই। তুমি একটুখানি অপেক্ষা করো।

আমি এখুনি ও-ঘর থেকে আসছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে, সত্যি—' কথা ক'টা বলেই চামেলী একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসিত এইদিন একটা শেষবেশ দেখবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। চামেলীর কথার এই জাল ও চমকপ্রদ ভঙ্গি আজ তাকে আর মুগ্ধ করতে পারল না। কুড়ি মিনিটের ওপর অসিত চামেলীর জন্য অপেক্ষা করল; তারপর তিনখানা দশটাকার নোট পাশের টেবিলের ওপর একটা পেপার ওয়েটের তলায় রেখে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

আধঘণ্টা পরে তার তথাকথিত ভ্রাতাটিকে নীচের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসে চামেলী দেখল যে অসিতের বেবি অস্টিনখানা বাড়ির সামনে আর দাঁড়িয়ে নেই। সে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দু'ধারে গাড়িখানার জন্য খোঁজ করল কিন্তু কোথাও সেখানা সে দেখতে পেল না। তাড়াতাড়ি তার নূতন অতিথিটিকে মিষ্টিমুখে বিদায় দিয়ে সে উপরে উঠে এল। কিন্তু এখন তাকে কে বলে দেবে যে অসিত গেল কোথায়? ঘরে বারান্দায় কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। টেবিলের ওপর চাপা-দেওয়া নোট ক'খানা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা চামেলীর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল। যে-লজ্জা সে এতদিন ধরে অসিতের কাছে গোপন করে আসছিল, তা এমন করে প্রকাশ হয়ে পড়বে সে স্বপ্নেও আশা করে নি। সে পিছনের কৌচখানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল, 'কি করলাম আমি। ও মা আঃ—'

চামেলীর খোঁজে হঠাৎ ঘরে ঢুকে চামেলীর মা দেখতে পেল, চামেলী সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নটীর মা হলেও চামেলীর মা নারী, তাই চামেলীর কান্নার কারণ বুঝতে তার বিলম্ব হয় নি। সস্নেহে চামেলীর মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলল, 'ছিঃ, এমনি করে কি কাঁদে। হ্যাঁ, এই যাঃ, ভালো কথা বলতে তোকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অসিত যাবার সময় বলে গেল, তোকে কাল বাড়ি থাকতে—বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

চামেলীকে ভোলাবার জন্য চামেলীর মা মিথ্যাই বলল, কিন্তু চামেলীর তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় নি। সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একটু থাকতে বলতে পার নি বুঝি?'

এমন সময় বাইরে থেকে চামেলীদের চাকর ভিখু হেঁকে উঠল, 'ও মা, সীতারামবাবু এসেছেন, দিঘাপতির রাজাবাবুকে নিয়ে।'

বাইরে রাস্তার ওপরে খান-দুই মোটরের ধক ধক শব্দ শোনা গেল। মোটরের শব্দের দিকে কান খাড়া করে চামেলীর মা বলল, 'ঐ যাঃ, রাজা-বাবুরা এসে গেছে! তোকে বলতে একেবারে ভুলে গেছি মা। আমি কিন্তু আগেই ওনাদের কথা দিয়ে ফেলেছি, যাঃ!'

চামেলীর মা যে এমন ভাবে আবার তাকে উত্যক্ত করতে সাহস করবে তা চামেলী বোধ হয় ভাবতেও পারে নি। চামেলী এইবার ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মা-আ! যা খুশী করগে—আমি কিছুতেই খোট্টাগুলোর সামনে বেরুব না। তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলুম না?'

এদিকে মহাধনী রাজকুমারেরা অভ্যর্থিত হয়ে উপরে এসে গিয়েছে। চামেলীর মুখ-নিঃসৃত অপমানকর কথা ক'টা তাদের কানে গেলে তো কেলেঙ্কারীর একশেষ। এইভাবে তাদের অপবাদ রটে গেলে কোনও ধনী-মানী মানুষই আর তাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবে না। চামেলীর মা প্রমাদ গুনে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চামেলীর মুখটা চেপে ধরে, অনুচ্চ স্বরে তাকে অনুযোগ করে বলল, 'আমায় অপমান করাস নি চামি, আমি তোকে পেটে ধরেছি—'

উত্তরে চামেলী বলতে চাইল, 'না ধরলেই ছিল ভাল,' কিন্তু তা আর তার বলা হল না। অবাক্ হয়ে সে চেয়ে দেখল, মা'র চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। মা'র চোখের জল চামেলীকে একটু নরম করে দিয়েছিল। একটু ভেবে নিয়ে সে উত্তর করল, 'সুদ্দু দুটো গান গেয়েই চলে আসব কিন্তু—'

চামেলীর মা আগেই সীতারামের মারফত বেশ কিছু টাকা আগন্তুক অবাঙ্গালীদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এখন কোনও ক্রমেই তাদের আর এখান থেকে ফিরানো চলে না। চামেলীর কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে চামেলীর মা বলল, 'আচ্ছা মা, তাই করো, গোটা দুই-তিন হিন্দী গজল, কেমন? দিঘাপতির কুমার আর তার ম্যানেজার এসেছেন মা। শুধু গোটা দুই গান শুনবেন তাঁরা, লক্ষ্মী মা আমার!'

চামেলীর ঘরের পাশের ঘরখানা সাজসজ্জায় চামেলীর মত একজন উচ্চ-শ্রেণীর রূপজীবিনীর ঘর বলে মনেই হয় না। ঘরের মেঝের সবটাই প্রায় একটা সাবেকী ধরনের পুরু গদি দিয়ে ঢাকা। সমস্ত গদিটা খানকতক ধবধবে সাদা চাদর দিয়ে মোড়া। গদির চারপাশ ঘিরে বালিশের রাশ। মাঝখানকার জায়গাটুকু ঘিরে জনকয়েক হিন্দুস্থানী লোক হুল্লোড় লাগিয়েছে।

বিছানার ঠিক মাঝখানটায় বসেছিল আমাদের করিম। পরনে তার দিঘাপতির কুমার বাহাদুরের বেশ। পাশেই জরির গোল টুপি-পরা ছেদিলাল ওরফে ছেদি। গড়গড়ার নলে, চালের সঙ্গে একটা টান দিয়ে করিম বলল, 'কেয়া! বিবিজান আতে?'

বিছানার এক পাশে বসে দালাল সীতারাম তবলার কাটি বাঁধছিল। তবলার কানার ওপর হাতুড়ির আর একটা ঠোক্কর দিয়ে সে উত্তর করল, 'আতে সাব, আতে।'

সীতারামের কথা শেষ হতে না হতেই চামেলীকে গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। পরনে তার নীল রঙের একখানা শাড়ি। হাতে সবুজ রঙের পাতলা একটা রুমাল। দুই হাত তুলে একটা কুর্নিস করে চামেলী অতিথিদের অভিবাদন জানাল, 'আদাব।'

চামেলীর সেই বিচিত্র বেশ, কথা বলার অভিনব ভঙ্গি ছেদি ও করিম দুজনকেই সমানভাবেই অভিভূত করেছিল। করিম বিহ্বল হয়ে চামেলীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বা'র হয় না। ছেদির মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে মাত্র একটি কথা বার হয়ে এল, 'ছেলাম।'

ছেদি ও করিমের বেশভূষা এইদিন এমন চটকদার হয়ে উঠেছে যে তাদের এইদিন কোনও সাধারণ মানুষ বলে চেনাও সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে বেশ কয়েক হাজার টাকাও তারা হাতে পেয়েছে। এই টাকার দৌলতে তাদের প্রত্যেকের আঙ্গুলে ক'টা করে বড়ো উজ্জ্বল হীরার আংটি জ্বল জ্বল করে উঠেছে। এদের দিকে এক লহমা একটু চেয়ে দেখে মুখ নীচু করে প্রত্যুত্তরে চামেলীও বলল, 'সেলাম।' তারপর গদির শেষের দিকটায় করিম ও ছেদির কাছ থেকে বেশ একটু দূরে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, হারমোনিয়মটা সে কোলের কাছে টেনে নিল। কোনরকমে একটা গান শেষ করে সে চলে যেতে চায়। মনটা তার এমনিই ভাল ছিল না, তা ছাড়া সেই পয়সাওয়ালা অসভ্য লোক দুটির সঙ্গ বরদাস্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। এখন তাড়াতাড়ি এই লোকদুটির সামনে থেকে উঠে যেতে পারলে হয়। চামেলী ত্বরিত গতিতে হারমোনিয়মের দু-তিনটা চাবি খুলে দিয়ে সীতারামবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যা সার! হিন্দী গজল?' তারপর আর কাউকে কোন কথা না বলে

হারমোনিয়মের পর্দায় দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালনে ঘা দিতে দিতে মৃদুল কণ্ঠে সে গেয়ে উঠল—

চমকে তারে মেরে পিয়ারে
দীন দুনিয়া, হামেরি, হা'রে—
মেরে,—মেরে পিয়ারে-এ—

চামেলী ছিল একজন নামকরা গায়িকা। পর্দায় পর্দায় চড়ে তার সুমিষ্ট সুর আসরের সকলকে আশাতীতভাবে মুগ্ধ করে তুলল। করিম ও ছেদি আত্মহারা হয়ে তাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপনপরী চামেলী-রানীর গান শুনছিল। হঠাৎ ছেদির কি মনে হল তা সেই জানে, তাড়াতাড়ি সে সীতারামবাবুর কোলের কাছ থেকে তবলা দুটো টেনে নিয়ে তার ওপর দু-চারটা একরকম বেসুরোভাবে চাঁটি বসিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ হায়। ঠিক হায় বিবিসাহেব।'

এত দুঃখেও চামেলী না হেসে থাকতে পারল না। সে হারমোনিয়মের সব ক'টা রীড হাত দিয়ে এক স'ঙ্গ চেপে ধরে অর্ধপথেই তার গান থামিয়ে, মৃদুল কটাক্ষে ছেদির দিকে চেয়ে বলল, 'মাপ কিজিয়ে বাবুসাব। ছাত পিটায়ে মাত্।'

এইভাবে রসভঙ্গ করায় ঘরের সকলেই ছেদির উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের সেই বিরক্তির প্রকাশ পেল হাসির মধ্যে। গানের আসরের সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

করিমের কিন্তু প্রকৃতি ছিল ভিন্নরূপ। প্রথমটায় অন্য সকলের মতো হেসে উঠলেও তার সেই বিরক্তি এমনিভাবে হাসির মধ্যে তলিয়ে দিতে সে পারে না। হাসির পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠে ছেদির মাথায় একটা চাঁটি কষিয়ে চামেলীর দিকে তাকে ঠেলে ধরে বলল, 'যা শালে, মাপি মাঙ লে, যা—।'

ছেদি লজ্জিত হয়ে চামেলীরানীর কাছ হতে মাপ চাইতেই যাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে থেকে একটা বেয়াড়া রকমের গোলমাল ও চিৎকার শোনা গেল।

আমিনা হাফিজকে নিয়ে ততক্ষণে দোতলার বারান্দার ওপর এসে পড়েছে। হঠাৎ তাদের সেখানে আসতে দেখে চামেলীর মা চিৎকার করে উঠল, 'তোরা আবার কারা রে বাবা! ও বাবা, হাতে আবার ছুরি যে! ওরে, ও চামি! ডাকাত, ডাকাত—'

বাইরের গোলমালে সকলেই সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে করিম ও ছেদি লক্ষ্য করল, হাফিজের পিছন পিছন রুক্ষবেশে আমিনা ঘরে ঢুকছে। হাফিজের হাতে একটা দো-ধারা বড় ছুরি। ছোরা-হাতে হাফিজকে এগিয়ে আসতে দেখে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে ছেদি ও করিমের বাকী থাকে নি। করিম তাড়াতাড়ি একটা বড় তাকিয়া বিছানার উপর থেকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ইয়া আল্লা! খবরদার!'

হাফিজ এক লাফে করিমের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, বাম হাতে তাকিয়াটা করিমের বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে, ডান হাতে ছুরিখানা তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এবে শালা জান কবুল, বিলকুল।'

করিম ও হাফিজের ঠিক পিছনেই আমিনা দাঁড়িয়েছিল। পাথরের হিমশীতল মূর্তির মতই নিস্পন্দ তার চেহারা। তাকে সেখানে দেখে ডান হাতে হাফিজের ছুরিখানা ঠেকাতে ঠেকাতে করিম চেঁচিয়ে উঠল, 'আ—মি—না—আ—।'

আমিনা এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে করিমের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। করিমের মুখে তার নাম শুনে সে আর ঠিক থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে হাফিজের হাতখানা চেপে ধরে সে কেঁদে হাফিজকে বলল, 'এই! কেয়া করতা তুম্? এই—ছোড় দেও, দে-ও-ও—ছোড়।'

আমিনার কাছ থেকে এরূপ বিপরীত ব্যবহার হাফিজ আশা করে নি। একবার তার এ-ও মনে হল যে, করিমের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বুঝে তাকে তার হাত হতে রক্ষা করবার জন্যই বোধ হয় সে অভিনয় করে তার সঙ্গে এসেছে। সে এইবার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমিনাকে বলল, 'কেয়া, বহুত দরদ দেখাতা—আ—আঁ,—'

উত্তরে চামেলী এগিয়ে এসে আকুল হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'জানসে মাত মারো-ও, এই—ছোড় দেও ইন্‌কো।,

'হাঁ ছোড়তা –' বলে হাফিজ চামেলীকে ধাক্কা দিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে বাম হাতে করিমের গলাটা চেপে ধরে, ডান হাতে ছুরিখানা তার বুক লক্ষ্য করে তুলে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'হা-হা-ঈ-ঈ।'

হাফিজের গায়ে জোর ছিল করিমের চেয়ে অনেক বেশী। তা ছাড়া কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ায় করিমের শ্বাস একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছল। দেওয়ালের গায়ে পিঠের ভার রেখে হাফিজের উঁচিয়ে ধরা ছুরিখানার দিকে চেয়ে নিশ্চেষ্টভাবেই সে পড়ে রইল।

আমিনা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাফিজের তীক্ষ্ণ ছুরি করিমের বুকে বিঁধবার আগেই আমিনা ছুটে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চমকে উঠে হাফিজ চেয়ে দেখল তার দো-ধারা ছুরিখানা আমিনার পিঠে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতন ছুরিখানা তুলে নিয়ে হাফিজ চিৎকার করে উঠল, 'হারে শয়তান! হা-হা-হা-আঃ!'

ছুরিখানা উঠিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি-দেওয়া রক্তের ধারা নীচের গদি ও দু-পাশের দেওয়াল ও তাকিয়াগুলোর উপর ছড়িয়ে দিয়ে আমিনার নিস্পন্দ দেহ মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমিনার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র একটি কথা বেরিয়ে এল, 'করিইম-আ', তারপর ঠোঁট দুটো তার আর একবার নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

হাফিজ আমিনার সেই অর্ধমৃত দেহখানার দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখল। কিন্তু ততক্ষণে সে রক্তপিপাসু পিশাচে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সে এখন নিজেই নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। ইচ্ছে করলেও এখন আর সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। তার এই ক্ষুরধার ছুরি একবার রক্তপান করেছে, দ্বিতীয় বার তার রক্ত পান করবার বাধা কোথায়? সে শিকারী পশুর ন্যায় আর একটা হুঙ্কার দিয়ে করিমের উপর লাফিয়ে পড়ল। বাম হাতে তার কণ্ঠনালী আর একবার চেপে ধরে, ডান হাতে ছুরিখানা উঁচিয়ে ধরে হাফিজ চেঁচিয়ে উঠল, 'এবে শালা তই-য়ার?'

আমিনার রক্তাক্ত নিশ্চল দেহটা তখনও বিছানার উপর পড়ে, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আমিনার শুশ্রূষার কথা কারোর মনেই আসে নি। আমিনার দিকে করিম একবার চোখ মেলে চাইল। তারপর হাফিজের চোখের উপর চোখ রেখে উত্তর করল, 'হাঁ, হামি তৈয়ার।'

গু-গুড়ু-ম-গুম্—। ঠিক এই সময় দরজার কাছ থেকে একটা পিস্তলের গুলি এসে ছুরিসুদ্ধ হাফিজের হাতখানা দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিল। সকলে আশ্বস্ত হয়ে চেয়ে দেখল, পুলিস! প্রণব ও নরেনবাবুর পিছন-পিছন পিল-পিল করে পুলিসের দল ঘরে ঢুকছে। নরেনবাবুর হাতে একটা পিস্তল, পিস্তলের মুখে অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে ঘরের অন্যান্য লোকের ন্যায় ছেদিও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য একজন পিকপকেট সে, খুন-খারাপিকে সে বরাবরই ভয় করে। এখন সেখানে পুলিস দেখে তার জ্ঞান ফিরে এল। তাড়া-

তাড়ি পাশের জানলার গরাদ ছুটো কায়দার সঙ্গে ফাঁক করে মাথা গলিয়ে সে রাস্তার দিক্‌কার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ছেদির এই পালানোর চেষ্টা প্রণবের চোখ এড়ায় নি। প্রণব সেইদিকে সেপাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'একঠো ভাগত-আ। পাকড়ো—এই-ই—।'

সকলের সঙ্গে প্রণবও বারান্দার উপর নিমেষের মধ্যে ছুটে এল। কিন্তু ছেদি ততক্ষণ উপর থেকে লাফ দিয়ে নীচের রাস্তায় নেমে পড়েছে। প্রণব 'ধর ধর' করে নীচে নেমে এল, কিন্তু ছেদিকে আর পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ণমনে উপরে উঠে এসে প্রণব নরেনবাবুকে বলতে যাচ্ছে, 'স্যার, পাওয়া গেল না', হঠাৎ সে চেয়ে দেখল আমিনার কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তার সমস্ত দেহখানা চাপ চাপ রক্তে ভরা। অস্ফুটস্বরে প্রণব বলে উঠল, 'স্যার, এই যে খুন—।'

করিম ও হাফিজকে বিছানার একটা চাদর দিয়ে একসঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে নরেনবাবু ডান হাতে আমিনার হাতের নাড়ীটা একবার পরখ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিনা তখনও বেঁচে ছিল। ৩২০ নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে নরেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ্যাম্বুলেন্স—টেলিফোন—'

কোণের দিকে দাঁড়িয়ে চামেলী তখনও ঠক ঠক করে কাঁপছিল। তার দিকে চেয়ে প্রণব জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে ফোন আছে?'

দীঘাপতিয়ার রাজাবাবুরা যে এমন ভাবে ক্ষণিকের মধ্যে খুনে গুণ্ডাতে রূপান্তরিত হবে তা বাড়ির আর সকলের মত চামেলীও ভাবে নি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চামেলী তাকে জানালে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।'

এতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘরের মধ্যে কে আছে বা না আছে তা নরেনবাবুর চেয়ে দেখবারও সময় নেই। চামেলীর গলার স্বর তার কানে যাওয়া মাত্র তিনি বুঝেছিলেন যে, ইনি হচ্ছেন এই বাড়ির আসল মালিক। নরেনবাবু এই পাড়ার মেয়েদের তাদের বাড়িতে গুণ্ডাদের স্থান না দেবার জন্যে অনেকবার সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের যে কি করে চিনে নেওয়া যাবে সে সম্বন্ধে তাদের কোনও উপদেশ দিয়ে যেতে পারেন নি। তবু তিনি আশা করতেন এরা যেন এই সব বদ-লোককে তাদের বাড়িতে আর স্থান না দেয়। নরেনবাবু তাই চামেলীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে ভেংচে উঠে বললেন, 'আঁচে, আঁচে তো দেখিয়ে দাও। তোমাকেও ছাড়া হবে না। বুঝলে?'

চামেলী একবার নরেনবাবু ও একবার প্রণবের দিকে চেয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করল, ও পরে তার সকাতর দৃষ্টিটুকু প্রণবের দিকে ফিরিয়ে এনে বলল, 'পাশের ঘরে আছে, আসুন। টেলিফোনটা পাশের ঘরে আছে।'

প্রণব ও চামেলী দুজনায় ধীরে ধীরে পাশের ঘরে টেলিফোনটার কাছে এসে দাঁড়াল। এই লাইনে চামেলী বেশীদিন না এলেও এরই মধ্যে সে ভালোমন্দ মানুষ চিনতে শিখেছে। নরেনবাবু ও প্রণবের মধ্যে যে কত তফাৎ তা সে এক লহমাতেই বুঝে নিতে পেরেছে। একটু এগিয়ে এসে টেলিফোনটা প্রণবকে দেখিয়ে দিয়ে চামেলী জিজ্ঞেস করল, 'দেখুন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব' ?

প্রণব চেয়ে দেখল, চামেলীর চোখে জল। চামেলীকে দেখে প্রণবের মায়াই হল। প্রগতির মতই সে ফুটফুটে, হঠাৎ স্বরূপ বোঝা যায় না, তবু সে চামেলী, প্রগতি নয়। ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে সহানুভূতির স্বরেই প্রণব বলল, 'বলুন—। কি কথা?'

ভয়ে ভাবনায় চামেলী কাঁদতে শুরু করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে সে প্রণবকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কোন দোষ আছে?'

চামেলীকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখে প্রণব তার দিকে একবার চেয়ে দেখল তারপর ফোনে কথা বলতে বলতে প্রণব চামেলীকে অভয় দিয়ে জানাল, 'না না, আপনার এতে দোষ কি? এই মামলায় আপনি শুধু সাক্ষী হবেন।'

প্রণবের শান্ত মুখচ্ছবির দিকে চামেলী একবার চেয়ে দেখল। তার মনে হল না যে প্রণব একজন পুলিস অফিসার, তাকে তার একজন অকৃত্রিম বন্ধু বলেই মনে হল। সে তার হৃদয়ের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রণবকে জানাতে চাইল, কিন্তু তার সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে সে এই সময় সাহস পাচ্ছিল না। হঠাৎ এইবার তার মনে পড়ল পাশের ঘরে পড়ে-থাকা রক্তাপ্লুতা আমিনার কথা। অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে মুখ ঢেকে পিছনের সোফাটার উপর বসে পড়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে করতে প্রণব চামেলীর দিকে আবার একবার চাইল। তাকে যে একটু সান্ত্বনা দিতে তার ইচ্ছে না হচ্ছিল, তা নয়। প্রণব একবার চামেলীর দিকে চেয়েও দেখল, কিন্তু তাকে কাঁদতে দেখেও সে কোনও কথা বলল না। তার সঙ্গে কথা বলবার তার বোধ হয় সময়ও ছিল না।

১৫

সারা থানাটা সেদিন সকাল থেকেই সরগরম। থানার সব ক'জন অফিসারই সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে ক'রমকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছেন। সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করিমের কাছ থেকে চোরাই নোট ক'টার খবর কি করে কৌশলে জেনে নিতে পারা যায়। এই বিষয়ে এখানকার কারও উদ্যমের শেষ নেই। পর পর সব ক'জন অফিসারই করিমকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুলল, কিন্তু এত সত্ত্বেও তাদের কারও কোন চেষ্টা ফলপ্রদ হল না। শেষ চেষ্টা করছিলেন থানার বড়বাবু নরেনবাবু নিজে। করিমের কাছ হতে কোনও সদুত্তর না পেয়ে, শেষ বরাবর বিরক্ত হয়ে, নরেনবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'না বাপু, এ কিছু বলে না। দেখ, যদি তুমি পার।'

প্রণব তখন সবেমাত্র সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। দিনভোর সে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে বেড়িয়েছে। এর উপর রাত্রে তার ঘুম হয় নি। রাত্রির শেষের দিকটায় মাত্র একটু গড়িয়ে নিয়ে সবেমাত্র সে নীচে নেমেছে। চোখ দুটো একটু রগড়ে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে করিমের কাছে বসে পড়ে প্রণব বলল, 'এই, ছেদি ধরা পড়েছে তা জানিস্? সে তো সবই বলে দিয়েছে। তুই বা তাহলে বলছিস না কেন?'

প্রণবের এই সব কথা অবশ্য সর্বৈব মিথ্যা ছিল। কথার মারপ্যাঁচে করিমকে সাময়িকভাবে ভড়কে দিয়ে তার কাছ থেকে সত্য কথাটা বার করে নেবার জন্য প্রণব এরূপ একটা মিথ্যার অবতারণা করেছিল, কিন্তু প্রণবের এই সব চালাকিতে বিশেষ কোনও ফলই হল না। প্রণবের এ মিথ্যা চালবাজিতে করিম একেবারেই ভোলে নি। বরং প্রণবের এই ধাপ্পায় ক্ষেপে গিয়ে করিম চেঁচিয়ে উঠল, 'লেকেন হামি ছেদি নেহি আছে।'

কোণের টেলিফোনটা ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল। টেলিফোনের কম্পমান হ্যাণ্ডেলটির দিকে চেয়ে নাচার হয়ে প্রণব হাল ছাড়ল। থানার রাইটারবাবু এদের কাছেই বসেছিলেন। এই থানার নিম্নতম অফিসার ছিলেন তিনি। আর কেউ এই ফোন না ধরলে বুঝে নিতে হবে যে, তাঁকেই তাঁরা সেই ফোন ধরতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই অগত্যা তিনিই ছুটে গিয়ে ফোন ধরলেন। থানার বড়বাবু নরেনবাবু এতক্ষণ করিমের কাছ হতে কথা বার করবার ব্যাপারে প্রণবের শেষ প্রচেষ্টা নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিলেন। প্রণবের এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল বুঝে নরেনবাবু বিরক্ত হয়ে চেচিয়ে উঠলেন, 'যাও, লে যাও হিঁয়াসে করিমমিয়াকো। আভি ইস্‌কো হাজতমে বন্ধ কর দেও।'

পাহারাদারের উপর করিমকে হাজতে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে নরেনবাবু উঠে পড়েছিলেন। কিন্তু কোয়ার্টারে উঠে যাবার জন্য একবার দাঁড়িয়ে পড়েও কি ভেবে তিনি আবার তাঁর চেয়ারের উপরটায় বসে পড়লেন। তাঁর অন্তরাত্মা যেন তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়ান মশাই। এই টেলিফোনে কে, কি জরুরী কথা বলল তা জেনে যান। তা না হলে আবার হয়তো এজন্য আপনাকে এখুনিই দোতালার কোয়ার্টার থেকে নীচের অফিসে নেমে আসতে হবে।' তাঁর চেয়ারের উপর বসে জিজ্ঞাসু নেত্রে নরেনবাবু মুন্সী-বাবুর দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কোণের রাইটারবাবু ব্যস্ত হয়ে নরেনবাবুকে জানিয়ে দিল, 'স্যার, টেলিফোন্— । হাসপাতাল থেকে করছে।'

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমিনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যে-কোনও মুহূর্তে সেখান হতে একটা দুঃসংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা এঁরা সকলেই করছিলেন। ভ্রূ কুঁচকে নরেনবাবু মুন্সীবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসপাতাল থেকে? কি বলে আবার?'

আমিনা সম্বন্ধে থানার অফিসারদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। পুলিস কেসের রুগীর আশু মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলে হাসপাতালের লোকেরা কানুনমতো তা পুলিসকে জানাতে বাধ্য। ফোনের ওপারের লোকটার কথা শুনতে শুনতে রাইটারবাবু ধমকে উঠছিলেন। তাঁর কথাগুলো উত্তেজনার বশে জড়িয়ে গেল; আমতা আমতা করে জড়িত কণ্ঠে রাইটারবাবু উত্তর করলেন, 'ওরা বলছে, আমিনার জ্ঞান ফিরে এলেও তার অবস্থা সঙ্কটজনক। বোধ হয় ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই শেষ হবে।'

আমিনা মারা গেলে এখুনি তাঁদের একটা হত্যার মামলা দায়ের করতে হবে। এই সব মার্ডার কেসের তদন্তে যথেষ্ট খাটাখাটুনি করতে হয়। সুষ্ঠু-ভাবে এ সব মামলা তদন্ত. করে আদালতের বিচারের পর আসামীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাতে না পারলে পুলিসের বিশেষ বদনাম। অথচ এই সব কাজ আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে করে যাওয়া একটা সহজ কাজ নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে কথাটা শুনে নরেনবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাই একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'তাইত হে প্রণব! এরা যে এখন আমাদের একটা মার্ডার কেসের ঝামেলায় ফেলে দিলে। আচ্ছা, তুমি তাহলে চট করে ওখানে চলে যাও। আমিও একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে শীগগির যাচ্ছি। ডাইং ডিক্লারেশন একটা নিতে তো হবে।'

নরেনবাবু ও প্রণব একসঙ্গেই উঠে পড়েছিল, হঠাৎ করিম ছুটে এসে নরেনবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বসে পড়ে বলল, 'হুজুর, হামি সব বাতায়ে দেবে, লেকেন—'।

করিমের এই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে নরেনবাবু বলে উঠছিলেন, 'ছোড় দেও', কিন্তু তার মুখে 'বাতায়ে দেবে' কথাটা শুনে তিনি চুপ করে গেলেন।

প্রণব অবাক্ হয়ে জানতে চাইল, 'কেয়া বাতায়ে দেবে?'

মাথা নীচু করে করিম জানাল, 'রূপেয়া-উপেয়া সব কুছ।'

বিস্মিত হয়ে প্রণব তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া বোলতা? সাচ?'

উত্তরে করিম কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হল না। অবাক্ হয়ে নরেনবাবু ও প্রণব চেয়ে দেখল, করিমের চোখ দিয়ে টস টস করে জল মাটির উপর পড়ছে। হাতের চেটোয় চোখের জল মুছে অনুযোগ করে করিম বলল, 'লেকেন হামকো তেনি—একবার তেনি—'

নরেনবাবু এতখানি একেবারেই আশা করেন নি। তাঁর মন আশু সাফল্যের আশায় নেচে উঠল! তিনি ব্যস্ত হয়ে করিমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তেনি কেয়া? বোলো?'

করিম এতক্ষণ তার মনের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিল। তার মনের আগড় এইবার একেবারে ভেঙে পড়ল। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে করিম নরেনবাবুকে জানাল, 'হামি হাসপাতালমে আমিনাকো তেনি দেখবে।'

করিমের এই উদ্বেগের মধ্যে কতটা সারবত্তা আছে সেই সম্বন্ধে নরেনবাবু

নিবিষ্ট মনে একটু ভেবে দেখলেন। তারপর তিনি করিমের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, 'হাঁ হাঁ, জরুর তুম আমিনাকে দেখবে। লেকেন নোটকো পাত্তা পয়লা দিবে তব তো।'

করিমেরও যে নরেনবাবুর প্রতিশ্রুতির উপর দুই-একবার সন্দেহ না আসছিল তা নয়। কিন্তু অতো-সতো ভেবে দেখার তার সময় বা ইচ্ছা ছিল না। একান্তরূপে অসহায় করিমের মনে হচ্ছিল এই ব্যাপারে বিশ্বাস করে মরাও ভালো। নরেনবাবুর এই কথায় গম্ভীরভাবে করিম আরও একবার ভেবে নিল। তারপর ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে বলল, 'আচ্ছা সাব! আপলোক আভি চলিয়ে হামার সাথ।'

আশে-পাশের সিপাই জমাদাররা এতক্ষণ বিস্মিত হয়ে করিমের কথা শুনছিল। হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই নিঃশব্দে একজন জমাদার ও জনকতক সিপাই তৈরি হয়ে এল। কারোর মুখে কোন কথা নেই। ততক্ষণে একটা ট্যাক্সিও থানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সিপাইদের মধ্যে কেউ ডেকে এনে থাকবে। নিঃশব্দে সকলে করিমকে নিয়ে ট্যাক্সিখানার উপর উঠে ঠেসাঠেসি হয়ে বসে পড়ল। এর পর প্রণবের নির্দেশমত ট্যাক্সি গন্তব্য স্থানের দিকে ছুটে চলল।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই করিমের নির্দেশমত ডাইনে বামে, বামে ডাইনে ঘুরে ট্যাক্সিখানা এসে দাঁড়াল একটা কয়লার গুদামের সামনে। গুদামের মালিকের সঙ্গে করিমের কি সম্পর্ক তা করিমই জানে। অন্যান্য সকলের সঙ্গে কয়লা-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে নরেনবাবু চারদিক একবার চেয়ে নিয়ে বললেন—'কাঁহারে, রূপিয়া কাঁহা? তুম ঝুট বাত বোলা নেহী তো! এ্যাঁ?'

করিম এইদিন পুলিসকে এতটুকুও ঝুট বাত বলে নি। এই ক'দিন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে সে আরও অনেক টাকা উপায় করেছে। এই ক'দিন তারা সেই সব টাকাতেই নবাবীপনা করে এসেছে। প্রগতিরানীর পিতার নিকট হতে চুরি করে আনা অর্থে তখনও পর্যন্ত সে হাত দেয় নি। প্রসিদ্ধ মহাজন ঝাব্বরমলবাবুর গদী হতে ওদের চুরি-করা দশখানা হাজার টাকা নোটের আটখানা একশো টাকার নোটে রূপান্তরিত করে সেগুলো সে এই কয়লার দোকানের মালিকের সম্মতিক্রমে তার দোকানের শক্ত মাটির নীচে একটা টিনের কৌটোর মধ্যে করে পুঁতে রেখেছিল। এই দশ হাজার টাকার বাকী দুখানা 'হাজার টাকার নোট' 'হাজার টাকার নোটের ভাঙানি'র

কমিশন বাবদ কেটে নিয়ে ঝাব্বরমলবাবু নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। প্রণবের সেই অবিশ্বাসপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে একটু বিরক্ত হয়ে করিম বলল, 'এইসেন সবচিজ মিলবে। ডাইনাসে থোড়া কয়লা হটায়ে, তব ত?'

করিমের কথায় সিপাইএর দল বেরিয়ে পড়ে এধার ওধার থেকে জন-কয়েক রিকশাওলা, ঝাঁকা-মুটে পাকড়াও করে নিয়ে এল, চার আনা করে পয়সা মজুরির বন্দোবস্ত করে। আর তার সঙ্গে তারা নিয়ে এল কয়লার গুদামের মালিককে। গুদামের মালিক পুলিস আসবার আগে সামনের পানওলার দোকানে বিড়ি কিনছিল। এই ব্যাপারে তার মনে স্বভাবতঃই পাপ ছিল। পুলিসকে করিমের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে সে সবেই পড়ছিল। কিন্তু সে রাম সিং জমাদারের নজর এড়াতে পারে নি। গুদামের এই মালিক ছিল একজন আধা-বাঙালী লোক, নাম তার কিষণচাঁদ। কিষণচাঁদ হঠাৎ সাধু সেজে বলে উঠল, 'আরে! এ কেয়া বাৎ? হামরা দুকানমে ই কেয়া? ই আদমী কুন হ্যায়?'

শেষের কথাটা কিষাণচাঁদ করিমকে উদ্দেশ করেই বলল। একটু সলজ্জ হাসি হেসে করিম উত্তর করল, 'হামাকে হাপনি চিনছেন না?'

করিমের দিক হতে যে কোনও দিন বিপদ আসবে তা সে ভাবতেও পারে নি। রুদ্ধ আক্রোশে বিড় বিড় করে কিষণচাঁদ উত্তর করলে 'বেইমান!'

তার এই কথা শুনে করিম মাথা নীচু করল, কিন্তু তার এই কথার কোনও উত্তর করল না।

নরেনবাবুর নির্দেশমত মজুররা কোদাল গাঁইতি যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে কয়লার ঢিবিগুলো সরাতে আরম্ভ করল। প্রণব নিজেও একখানি কোদাল নিয়ে এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজে নেমে গেল। প্রণবকে কাজে নামতে দেখে সিপাই জমাদাররা তার অনুসরণ করল। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাশ রাশ কয়লা সরিয়ে ঘরের মেঝেটি তারা সাফ করে ফেলল।

শ্রমিকদের গাঁইতির ও কোদালের পুনঃ পুনঃ আঘাতে কয়লা হতে থেকে থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। সিপাই জমাদাররা মায় প্রণব পর্যন্ত এই ভাড়া-করে-আনা শ্রমিকদের মত শ্রমিক হয়ে উঠেছে। তাদের সকলেরই আশা কোন শুভ মুহূর্তে তাদের কোনও একজনের কোদালের ঘায়ে মাটির মধ্যে পোঁতা টিনের বাক্সোটা টাং করে বেজে উঠবে! অধীর আগ্রহে তাদের

সকলেরই বুক থেকে থেকে দুরুদুরু করে উঠছে। তাদের হাত পা গা মাথা পর্যন্ত কয়লার গুঁড়োয় আরও কালো হয়ে উঠল। কিন্তু করিমের বিবৃতি অনুযায়ী টাকাভরা টিনের বাক্সোটা আর ব্যার হতে চায় না। কয়লার রাশ সরান শেষ হলে নরেনবাবু সন্দিগ্ধভাবে করিমের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেয়া, বাতাও আভি? কাঁহা রুপেয়া?'

নরেনবাবুকে এই ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে প্রত্যুত্তরে করিম বলল, 'সব কুছ হাম বাতাতা, লেকেন খোদাকো কসম, আপকো জবানী ঠিক রাখিয়ে।'

প্রত্যুত্তরে নরেনবাবু আশ্বাস দিয়ে করিমকে বললেন, 'হাম বেইমান নেহি, পয়লা বাতাও তো।'

নরেন বাবুদের তখন পর্যন্ত করিম পুরাপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। সে ভাবছিল যে শেষে তার ভাগ্যে পেঁজপয়জার দুই না জোটে। নরেনবাবুর কথায় করিম দোনামনা হয়ে চুপ করে একটু ভাবল; তারপর এগিয়ে গিয়ে মেঝের একটা নরম জায়গায় বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'হাঁ, খুঁড়িয়ে হিঁয়া। ইঁহিপর গাড়া হায়।'

করিমের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাবল তুলে নিয়ে প্রণব নিজেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করল। বেশী দূর তার আর খুঁড়তে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই শাবলে চাড়া খেয়ে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স উপরে উঠে এল। আনন্দের আতিশয্যে প্রণব বাক্সটা খুলে ফেলছিল। নরেনবাবু বাধা দিয়ে তাকে বললেন, 'দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না।'

সারা মহল্লাটা দোকানটার আশেপাশে ভেঙ্গে পড়েছিল। অন্ততঃ পাঁচশো লোক ব্যাপার দেখার জন্য দোকানটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নরেনবাবু তাদের মধ্যে দুজনকে বেছে নিয়ে তাদের সাক্ষী করে বাক্সটা খুলে ফেললেন। বাক্সটার মধ্যে থাকে থাকে সুতোয় বাঁধা আটখানা হাজার টাকার নোটের ভাঙানি 'আশিখানা একশো টাকার নোট' ছিল। এই প্রত্যেকটি একশো টাকার নোটের উপর তারিখ সহ ঝাব্বরমলের দোকানের রবার স্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া রয়েছে।

এই নোটগুলির উপর ঝাব্বরমলবাবুর গদীর স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে নরেনবাবুর আর বুঝতে বাকী থাকে নি যে, এরা অন্ততঃ আটখানা চোরাই হাজার টাকার নোট এই বামালগ্রাহক ঝাব্বরমল মাড়োয়ারীর দোকান থেকেই ভাঙিয়ে এনেছে। এই ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের এই সব কীর্তিকলাপ

সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই নরেনবাবু খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন প্রয়োজনীয় প্রমাণের অভাবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। নরেনবাবু প্রগতির পিতা ধীরাজবাবুর পকেটমারার তারিখটার সঙ্গে এই সব নোটের উপরকার স্ট্যাম্পের তারিখ মিলিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারা যাচ্ছে বুঝে এইদিন তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। নোটগুলো গুনতে গুনতে নরেনবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সাবাস প্রণব! ভাল কেস হবে হে।'

সাফল্যের আনন্দে প্রণবের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু উত্তর দিল করিম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'হুঁ, উ কেস-উস তো হোবে। লেকেন হামকো হাসপাতালমে তেনি লে চলিয়ে। আমিনাকো হামকো তেনি দেখলায়ে। আপকো বাত তো আপ রাখিয়ে।'

পুলিসের কাছে আসামীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বা না করা অবান্তর বিষয়। মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে কথা বার করা তাদের কাছে 'ট্যাকটিক্‌স্‌' বা চালাকির নামান্তর মাত্র। পুলিস মহলে এই ব্যাপারে কথার খেলাপ করে কেউ নিন্দনীয় হয় নি। বরং এর দ্বারা তারা সংশ্লিষ্ট মহলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। করিমের কথায় মৃদু হেসে নরেনবাবু একটু ভেবে নিলেন। তারপর একটু থেমে তিনি করিমকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'জরুর হাম বাত রাখেগা। লেকেন আউর দো' হাজার রুপেয়া? কাঁহা উ? বোলো?'

উত্তরে বিরক্ত হয়ে করিম চেঁচিয়ে পুলিসকে গালাগালি দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি ভেবে সে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে উত্তর করল, 'কেয়া বোলে! আচ্ছা, আও হামারা সাথ। উভি হাম নিকাল দেবে। লেকেন জলদি জলদি আইয়ে, নেহি তো—'

নরেনবাবুর মনে হয়েছিল করিম বুঝি তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। তা' না হলে 'নেহি তো' সে বলবে কেন? নরেনবাবু এজন্য মনে মনে রুষ্ট হলেও সেই ভাব তখুনি তিনি বাইরে প্রকাশ করতে চাইলেন না। করিমের সাহায্যে এখনও অনেক কাজ উদ্ধার করা বাকী আছে। মনের এই ভাব গোপন করে শান্তভাবে করিমকে নরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'নেহি তো, নেহি তো কেয়া?'

নরেনবাবুর এই কথায় করিম হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এত বড়

দুর্দান্ত অপরাধী কথায় কথায় অমন করে কাঁদবে তা কেউ আশা করে নি। সকলে অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। করিম কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উত্তর করল, 'নেহি তো মেরি সাথ আমিনাকে আউর—আউর দেখা না হোবে।

তাতানো লোহা গরম থাকতে থাকতেই তা সোজা করে ফেলা ভাল। পুরোনো চোরদের স্বভাব নরেনবাবুর বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। কখন যে এদের কার কি মতিগতি হয় তা কেউই বলতে পারে না। যে-কোনও মুহূর্তে করিমের পক্ষে তার স্বীকৃতি-মূলক বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্ভব ছিল। তাই তিনি আর দেরি না করে ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চলিয়ে তব, জলদি চলিয়ে।'

নোট ক'খানা প্রণবের হাতে জিম্মা করে দিয়ে নরেনবাবু সদলে ট্যাক্সির উপর উঠে বসলেন। প্রণব ড্রাইভারের পাশে বসে করিমকে জিজ্ঞেস করে করে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিতে লাগল। দেখতে দেখতে ট্যাক্সিখানি ঝাব্বরমলবাবুর গদী-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। নরেনবাবু ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বললেন, 'এস তাড়াতাড়ি।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পুলিসের দল দরজায় ভিড় করে দাঁড়াল। নরেনবাবু চিৎকার করে সকলকে বললেন, 'কোহিকো নিকালনে মাৎ দেও।'

গদী-ঘরের মাঝ-বরাবর একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে খুদ ঝাব্বরমলবাবু গড়গড়া টানছিলেন। আর তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিলাতি স্যুট-পরা সেখ মোজেজ চুপি চুপি কথা বলছিল। একটা জব্বর খবর নিয়ে সেখ মোজেজ সেদিন সেখানে এসেছে। হঠাৎ পুলিস দেখে একটা সিগারেট ধরাবার অছিলায় সে সোজা হয়ে বসল। জমাদার রাম সিং সেখ মোজেজকে আগে হতেই চিনত। সে ছুটে সেখ মোজেজকে জাপটে ধরে বলে উঠল, 'কেয়া সাব, হিঁয়াপর কেয়া মৎলবমে?'

ঝাব্বরমলবাবুর দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে মোজেজ জমাদারকে বাধা দিতে দিতে বলল, 'হোয়াই, হোয়াট ইউ মীন? হুজ ইউ?'

ব্যাপার দেখে ঝাব্বরমলবাবু একটু এগিয়ে এসে পুলিসকে বললেন, 'এ কেয়া করতা? উ সায়েব হ্যায়। ভারি কারবারি আদমি। এই—'

রাম সিং-এর ব্যবহারে নরেনবাবু ও প্রণব দুজনেই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপার দেখে প্রণব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নরেনবাবু একটু এগিয়ে এসে জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া জমাদার? ই কোন্ হ্যায়?'

জমাদার রাম সিং পিকপকেট সর্দার সেখ মোজেজকে ভালো করেই চিনতে পেরেছিল। তা না হলে এত সহজে একজন সাহেব-সুবোর গায়ে হাত দিতে সে কখনই সাহস করত না। পুরানো জমাদার রাম সিং-এর ভালো করেই জানা ছিল যে রাজার জাত সাহেবদের সঙ্গে এই লোকটার কোন সম্পর্কই নেই। নরেনবাবুর এই প্রশ্নে একজন সমজদার ঝানু পুলিস কর্মচারীর মত মুখভঙ্গি করে জমাদার রাম সিং বলল, 'আরে, এ এক পুরানো বদমাস! কমসে-কম ন-দশ দফে জেল খাট চুকা! পকেটমারকা এক বড়িয়া সর্দার হ্যায়! সাহেব বানকে সাহেব লোককো পকেট মারতা!'

এতক্ষণে ঝাব্বরমলবাবু ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এদেরই কেউ পুলিসকে পথ দেখিয়ে সেখানে এনেছে। তা না হলে বড়ো বড়ো অফিসারদের সঙ্গে তার খাতির আছে জেনেও তার এখানে এমনভাবে হামলা করতে তারা নিশ্চয়ই সাহস করত না। বেগতিক দেখে ঝাব্বরমলবাবু এইবার তাঁর সুর বদলালেন। বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে তিনি এইবার পুলিসকে বললেন, 'কেয়া বোলে! ই কারবারি আদমি নেহি, চোর আছে! আরে বাপ রে বাপ, মেরা লাখো রূপেয়াকে কারবার ইঁহি পর হোতা! বহুত বাঁচ গিয়া—ভাই, আঁ—বাপ—'

এর পর প্রণব ও নরেনবাবুর কারো আর সন্দেহ রইল না যে মোজেজ কে? হঠাৎ প্রণবের অন্য একটা বড়ো পিকপকেটের মামলার কথা মনে পড়ে গেল। এই মামলার ফরিয়াদী ব্যারিস্টার হগ সাহেব তাঁর পকেট কাটা যাওয়ার অব্যবহিত পরে মোজেজেরই চেহারার অনুরূপ সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তিকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছিলেন। তাঁর সেইদিনের সেই বিবৃতিটির কথা মনে পড়ে যাওয়া মাত্র প্রণব উত্তর করল, 'আর একটা কেসও তাহলে ডিটেক্ট হল স্যার। হগ সাহেবের পকেটটা এইই মেরে থাকবে। মিছিমিছি আমরা সোরেপেকে সন্দেহ করছিলাম।'

মোজেজের বদলে এম্ সোরেপেকে সন্দেহ করে পুলিস যে খুব বেশী

অন্যায় করেছিল তা'ও নয়। বরং পুলিস এই সন্দেহের ক্ষেত্রে তাদের টারগেটের বা লক্ষ্যবস্তুর প্রায় কাছাকাছিই এসেছিল। এর কারণ এই যে, এই সোরেপে পকেটমার ছিল তার গুরুদেব মোজেজেরই একজন সুযোগ্য সাকরেদ। মোজেজের বদলে এই সোরেপকে ধরতে পারলেও পুলিসের পক্ষে তার কাছ হতে কথা বার করে খুদ মোজেজকে ধরে ফেলা অসম্ভব হত না। কিন্তু এখন পুলিস এই অতি সাবধানী পকেটমার সর্দার মোজেজকে অতর্কিতে ধরে ফেলতে পারায় এই প্রশ্ন এখানে ওঠে না।' প্রণবের এই প্রশ্নে নরেনবাবু সাফল্যের হাসি হেসে উত্তর করলেন, 'সাফল্য যখন আসে তখন তা এই রকম করেই আসে। এখন এস, এদের ঘরটা চটপট তল্লাস করে ফেলি।'

ঘর তল্লাসের কথা শুনে ঝাব্বরমলবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হামার ঘর—কাহে, হাম কেয়া কিয়া?'

উত্তরে নরেনবাবু ঝাঁঝালো স্বরে ঝাব্বরমলবাবুকে বললেন, 'উ বাৎ পাছু মালুম হোগা। আগাড়ি আপকো বাকস-উকস তো খুলিয়ে।'

ঝাব্বরমলবাবুর ম্যানেজার-সাব বিট্‌ঠলভাই এতক্ষণ অদূরে হতভম্ব হয়ে বসে সব ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। পুলিসকে রুখবার প্রতিটি সম্ভাব্য উপায় ব্যর্থ হতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে এর পর 'চাঁদিকো জুতিয়া' দিয়ে পুলিসকে ঠেকানো ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু এদের সকলেই যে এক ধরনের জীব নয় তা অভিজ্ঞতা হতে তাঁর জানা ছিল। ঠিকভাবে মানুষ না চিনে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে বিপদও আছে। এই ব্যাপারে এদের কাছে সরাসরি কথা না পেড়ে এদের মতিগতি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কথার মারপ্যাঁচে জেনে নেওয়া দরকার। এখন কি ভাবে এদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে মনে মনে একটা মহড়া দিয়ে নিয়ে এইবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'বৈঠে বাবু, বৈঠে। পান-উন মাঙায়ে? তল্লাসী তো হোবেই, আপলোক সরকারি আদমী আছে, গবরমেণ্টের লোক। হামিলোক কব্বি নেহি আপ্‌লোককো রোথবে। লেকিন—'

এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের সাবেকী কায়দায় ভুলবার পাত্র অন্ততঃ প্রণব ও নরেনবাবু ছিলেন না। নরেনবাবু এদের কারোরই কথার কোন উত্তর না করে নিজেই তল্লাসী শুরু করে দিলেন। সিন্দুক খোলার

সঙ্গে সঙ্গেই হাজার টাকার দুখানি নম্বরী চোরাই নোট বার হয়ে পড়ল। তখনও নোট দুখানি ঝাব্বরমলবাবু বাইরে চালান করেন নি। কিছুদিন দেখে নোট দুখানা ঝাব্বরমলবাবুর ব্যাঙ্কে পাঠানর ইচ্ছা ছিল। নোট দুখানা বার হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাব্বরমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাখো লাখো রূপেয়া হাম লেন-দেন করতা। এইসান কেতনা নোট হামেসা হামার পাশ আতাভি যাতাভি —হামরা রোকড়, খাতা-উতাভি দেখিয়ে, সব উসমে লিখ চুকা হ্যায়, মেরি খাতা-উতা সব বিলকুল ঠিক হ্যায়। হামকো ঝুটমুট বেইজ্জতি মাৎ করিয়ে।'

ঝাব্বরমলবাবুর এই সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে নরেনবাবু দোকানের খাতা ক'টা উঠিয়ে নিলেন, ও তারপর ঝাব্বরমলবাবুকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিলেন।

একজন সিপাই সঙ্গে সঙ্গে ঝাব্বরমলবাবুকে পাকড়াও করলে। ঝাব্বরমলবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'বিট্‌ঠলভাই, ওকিলবাবুকো জলদি খবর ভেজো। ওকিলবাবু—টেলিফোন—'

বেশী কথা আর বলবার সুযোগ না দিয়ে সিপাইরা ঝাব্বরমলবাবুকে বাইরে নিয়ে গেলে করিম অনুযোগের স্বরে প্রণবকে বলল, 'হাম তো সাব, হামারা বাত পুরিসে রাখ চুকা হ্যায়, সব কুছ আপলোককো তো হাম বলিয়েভি দিলাম। আভি—তেনি, হাসপাতালমে হামাকে নিয়ে চলেন। আমিনাকে হামি তেনি দেখিয়ে আসবে।'

পুলিসে ঢুকলেও নরেনবাবুর মত প্রণব তার স্বাভাবিক অনুভূতি তখনও হারায় নি। তাই করিমের এই অনুরোধের কথা প্রণব নরেনবাবুকে জানিয়ে বলল, 'স্যার, এ হাসপাতালে যেতে চায়।'

দিনভর ছুটাছুটি করে নরেনবাবুর মেজাজটা তিতিবিরক্ত হয়েছিল। তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'না না। এদের বেশী আদর দিও না। চোর-ডাকাতের আবার প্রেম? নাও—'

নরেনবাবুর কথায় প্রণব কোন উত্তর দিল না, উত্তর দিল মোজেজ। করিম যে কিসের লোভে এইভাবে তাদের সঙ্গে বেইমানি করলে সেই সম্বন্ধে মোজেজ ইতিমধ্যেই একটা ধারণা করে নিতে পেরেছিল। এই জন্য রাগের চেয়ে করিমের প্রতি সহানুভূতিই আসছিল তার বেশী। সে এই বার ভেঙচে উঠে উত্তর করল, 'না, চোর-উর প্রেম করবে কেন? যেতো প্রেম কোরবে তুশালা সব ভদ্দোর লোক।'

এই রকম একটা ব্যবহার প্রণব বা নরেনবাবুর কাছে করিম যে পেতে পারে, তা সে একেবারেই আশা করে নি। সে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তার হাতের লোহার হাতকড়াটা যুক্ত করে বার দুই সজোরে নিজেরই কপালে ঠুকে দিলে। হাতকড়ার আঘাতে কপালের খানিকটা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে লাগল। সিপাইরা ছুটে এসে করিমের হাত দুটো চেপে ধরল। প্রণব চমকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ। রক্ত—স্যার।'

পুরানো চোরদের এইরকম বহু চিত্তবিক্ষোভ নরেনবাবু এর আগেও দেখেছেন। এই সময় এরা সামান্য কারণে রেগে উঠে হাতকড়া মাথায় ঠুকে বা হাজত-ঘরের লোহার দরজায় আছড়ে পড়ে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। এর পর তারা তাদের স্বকৃত আঘাত উর্ধ্বতন পুলিস অফিসার ও হাকিমদের দেখিয়ে তাদের কাছে মিথ্যে করে মারের নালিশ জানিয়েছে। ওপরওয়ালাদের বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে দিতে তাঁকে কতবার নাজেহাল হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এজন্য কোনও দিন তাঁকে এতটুকু কেউ ভয় পেতে দেখে নি। করিমের এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে নরেনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, রেখে দাও। রক্ত বেরুল তো বয়ে গেল। পাঠিয়ে দাও একে হাসপাতালে। মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে যাও। কারমাইকেলে আমিনা আছে। সেখানে গেলে ও গোলমাল করতে পারে।'

তিন-চারজন সিপাই মিলে জোর করে ধরে করিমকে মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে চলল। বাকী আসামীর দল নিয়ে নরেনবাবু চলে গেলেন থানায়। এর পর নরেনবাবুর নির্দেশ মত প্রণব গেল কারমাইকেল হাসপাতালে,—যে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের বেডে শুয়ে আহত আমিনা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

হাসপাতালের মধ্যেকার একটা বড় হল। মাঝখান দিয়ে যাওয়া-আসার একটা সরু পথ। দুই পাশে বেডের সারি। কোণের একটা বেডে মুমূর্ষু রোগী আমিনা শুয়ে আছে। বুকে তার প্রকাণ্ড একটা ব্যাণ্ডেজ। অতিশয় রক্তক্ষরণে হৃৎপিণ্ডের শক্তি তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ডাক্তাররা মরণের বিভীষিকা শেষ পর্যন্ত অপর রোগীদের চক্ষুর অন্তরাল করে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে একটা লাল পর্দা দিয়ে আমিনার বেডটা কিছুক্ষণ আগে ঘিরে দিয়ে গেছে।

হাসপাতালের ভিজিটিং টাইমে যেমন হয়, রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের মৃদুগুঞ্জনে সমস্ত হলঘরটি মুখরিত হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন-বিহীন আমিনারও একজন ভিজিটার এসেছিল। এই ভিজিটারটি আর কেউ না, আমাদেরই ছেদি ওরফে ছেদিলাল।

একরাশ ফল নিয়ে সে আমিনাকে দেখতে এসেছে। একটা ইনজেকশনের পর আমিনার জ্ঞান ভালভাবেই ফিরে এসেছিল—নির্বাপিত-প্রায় প্রদীপ শেষ বরাবর যেমন দাউ দাউ করে একবার শেষ জ্বলা জ্বলে উঠে। ছেদির দেওয়া ডালিমের রসটুকু গলাধঃকরণ করতে করতে আমিনা বললে, 'হাঁ রে, করিমাকো জামিন-উমিনকো কুছ বন্দোবস্ত কৈল?'

আমিনার এই কাতরোক্তিতে ছেদির চোখ দিয়ে জল এসে গেল। করিম যে আমিনার কতখানি প্রিয় ছিল তা আর কেউ না বুঝুক, ছেদিলাল বুঝত। এ ছাড়া করিমের কথাও তার বারে বারে মনে পড়ছিল। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলটুকু মুছে নিয়ে ছেদি উত্তর করল, 'ওকিলবাবুকো পাশ গৈল তো! লেকেন বেগার রূপেয়ামে ও রাজী না হৈল। হামার পাশ ত—'

ছেদির কথায় আমিনা অতিকষ্টে হাত উঠিয়ে, হাতের চারগাছি সোনার চুড়ি খুলে ফেলে সেগুলি ছেদির হাতে তুলে দিল, তারপর একটু ভেবে নিয়ে ক্ষীণস্বরে সে উত্তর করল, 'মেরা ঘরকো পুরব কোণমে কুছু রূপেয়াকো একঠো টিনা গাড়া আছে। ও-ভি উঠিয়ে লিস্।'

কম্পিত স্বরে ছেদি আমিনার কথার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ পিঠের উপর একটা কঠিন হাতের স্পর্শে সে চমকে পিছন ফিরে দেখল, পুলিস। লাল পর্দার পাশ দিয়ে কখন সংগোপনে এসে প্রণব ও জমাদার রাম সিং তাকে ধরে ফেলেছে। দূর থেকেই তারা ছেদিকে চিনতে পেরেছিল। ছেদি ধীরভাবেই তাদের হাতে ধরা দিল। বাধা দেবার বা পালাবার কোন চেষ্টাই সে করল না। তাই দেখে আশ্বস্ত হয়ে প্রণব জমাদারকে নিম্নস্বরে আদেশ করল, 'হাম বহুত খুশ হুয়া। আভি জলদি লে যাও ইসকো বাহারমে। ই হাসপাতাল হায়। দেখো, গোলমাল উলমাল কুছ না হোয়।'

পিছন দিকে তাকাতে তাকাতে বিষণ্ণ ক্ষুণ্ণ মনে ছেদি জমাদারের সঙ্গে বেরিয়ে এল। জমাদার হিড়-হিড় করে টানতে টানতে তাকে বার করে

নিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে একবারমাত্র সে বলল, 'আমিনা—আ'। অনেকখানি দরদ, অনেকখানি ব্যাকুলতা তার সেই কথার মধ্যে ছিল, কিন্তু তার কথার স্বর মুমূর্ষু আমিনার কাছ পর্যন্ত আর পৌঁছল না।

হঠাৎ ছেদিকে পুলিস ধরে নিতে দেখে আমিনা খুব অশ্চর্য হয় নি। তবে নিঃসম্বলের শেষ সম্বল তার একমাত্র অধ্বৃত বন্ধু ছেদি, তার জন্যই বিপদ বরণ করে নিল, তারই সামনে,—দেখে সে খুবই ব্যথা পেয়েছিল। উত্তেজনার বশে সে একবার জোর করে উঠবার চেষ্টা করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সেলাইকরা শিরা নতুন করে ছিঁড়ে গেল। আর্তনাদ করে আমিনা বিছানার উপর নেতিয়ে পড়ল।

অদূরে একটা টেবিলের পাশে একজন নার্স বসেছিল। আমিনার অবস্থা লক্ষ্য করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাক্তার—ডাক্তার! ডা—'

একজন ছোকরা ডাক্তার দূরে রোগী দেখছিলেন। তিনি ছুটে এসে তাড়াতাড়ি সূচীযন্ত্রের সাহায্যে রোগীর দেহে আরও খানিকটা উত্তেজক ওষুধ প্রদান করলেন, কিন্তু এবার তাতে বিশেষ কোনও ফল দেখা গেল না।

প্রণব এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে আমিনার অবস্থা লক্ষ্য করছিল। সে এইবার ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এখন এই পেসেণ্টের স্টেটমেণ্ট, জবানবন্দী নেওয়া কি সম্ভব হবে?'

এইরকম একটা সময় সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা ডাক্তারদের মানা সত্ত্বেও রোগীকে 'শেষ দেখা' দেখে যাবার জন্য তার আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। এ ক'দিন এখানকার ডাক্তাররা সহায়-সম্বলহীনা মুমূর্ষু আমিনার পাশে কোনও আত্মীয়-স্বজনকেই দেখে নি। তবে এটা যে একটা পুলিস কেসের রোগী তা এই নয়া ডাক্তারবাবুর জানা ছিল। তাই সাদাসিদে পোশাক-পরা প্রণবকে সেখানে দেখে তাঁর পুলিসের লোক বলেই সন্দেহ হচ্ছিল। আপন কর্তব্য-কার্য সমাধা করতে করতে প্রণবের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি পুলিস থেকে আসছেন বুঝি? এর শেষ বিবৃতি নেওয়া সম্ভব হতে পারে, দাঁড়ান না, ইনজেকশনটা দিয়ে নি। এর জ্ঞান ফিরে আসতে পারে, তবে খুব বেশীক্ষণ এ বাঁচবে না। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা কি কেস মশাই?'

ডাক্তার বারবার সূচীর সাহায্যে আমিনার পাঁজর এফোঁড় ওফোঁড় করলেন। কিন্তু এতে আমিনার জ্ঞান আর ফিরে এল না। তার মুখ

দিয়ে থেকে থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই আমিনার মুদ্রিত চোখ দুটো উন্মুক্ত হয়ে গেল।

হাসপাতালের মিনারের কার্নিশ থেকে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমিনার প্রাণবায়ু দেহমুক্ত হল।

আমিনার নিশ্চল স্থির দেহখানির দিকে একবার চেয়ে দেখে ডাক্তার-বেডের উপরকার টিকিটের উপর লিখলেন—সীন্ ডেড্।

বেয়ারা চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়ে গেল।

প্রণবের আর আমিনার স্টেটমেণ্ট নেওয়া হল না। সে ধীর গতিতে স্খলিত পদে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ গেটের কাছে প্রগতির পিতা ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে নরেনবাবুকে আসতে দেখে প্রণব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নরেনবাবুর সঙ্গে থানায় দেখা হওয়ায় সুখবরটা ধীরাজবাবু আগেই পেয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে হাসপাতালেই প্রণবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি ছুটে এসেছেন।

প্রণবকে এতো শীঘ্র সাদা কাগজ হাতে হাসপাতাল হতে বেরিয়ে আসতে দেখে নরেনবাবু বুঝেছিলেন যে সেখানে একটা কোনও অঘটন ঘটে গিয়েছে। তা' না হলে তাঁর নির্দেশমত সেখানে হাকিমের জন্য অপেক্ষা না করে প্রণব হাসপাতালের বাইরে বেরিয়েই বা আসবে কেন? তাই প্রণবকে সেখানে দেখে ব্যস্ত হয়ে নরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, ব্যাপার কি? মেয়েটা মারা গেল নাকি?'

আমিনার কাছ হতে করিমের বিরুদ্ধে তার মৃত্যুকালীন একটা জবানবন্দী হাকিমকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারলে এই খুনের মামলা প্রমাণ করার ব্যাপারে সুবিধা ছিল বিস্তর। এখন হাতের নাগালের ভিতর এসেও এতো বড় একটা প্রমাণ চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেলে পুলিস অফিসারদের পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। প্রণব কিন্তু চোখের সামনে অমর প্রেমের অতো বড় একটা বলিদান ইতিপূর্বে কখনও ঘটতে দেখে নি। এজন্য সে একই সঙ্গে দুঃখ, ক্ষোভ ও লজ্জা বারে বারে অনুভব করছিল। তার থেকে থেকে মনে হচ্ছিল যে একবার করিমকে আমিনার কাছে নিয়ে এলে এমন একটা অমূল্য জীবন হেলায় হারিয়ে যেত না। এজন্য নিজেদেরই খুনী মনে করতে করতে ক্ষুণ্ণমনে প্রণব উত্তর করল, 'আমিনা স্টেটমেণ্ট করতে পারল না। এইমাত্র সে মারা গেল।'

প্রণবের মত এত সূক্ষ্ম অনুভূতি নরেনবাবুর কোনও দিনই ছিল না। তদন্তাধীন মামলার ব্যাপারে সাফল্য ও অসাফল্যের বিষয় ছাড়া অন্য কোনও কিছু চিন্তা করার তাঁর কখনও প্রয়োজন হয় নি। কর্তব্যকর্মের কোনও ফাঁকে ভাবপ্রবণতার স্থান আছে বলে তিনি কোন দিনই বিশ্বাস করেন নি। প্রণবের মুখে আমিনার মারা যাওয়ার সংবাদ শুনে নরেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এঁ্যা, তাহলে মারা গেল! মার্ডার কেস!'

আমিনার এই অপমৃত্যু প্রণব ও নরেনবাবুর মধ্যে আলোড়ন আনলেও তাদের সঙ্গে করে আনা হাকিমবাহাদুরের উপর তার কোনও প্রতিক্রিয়াই বর্তাতে পারে নি। এত সহজে তাঁর খাটুনি কমে যাওয়াতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাকিমবাহাদুর প্রণবকে বললেন, 'এঁ্যা, পেসেণ্ট আপনাদের মারা গেল! তাহলে আর কি হবে? আমি তাহলে মশাই আসি।'

উত্তরে প্রণব তাঁকে বলতে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ স্যার, আসুন,' হঠাৎ ধীরাজবাবু তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'বেঁচে থাক বাবা!' আনন্দের আতিশয্যে তিনি বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রণব বিব্রত হয়ে তাঁকে দুই হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে উত্তর করল, 'আরে করেন কি! ক—।'

এমন ভাবে যে তাঁর চুরি-যাওয়া অতগুলো টাকা এতদিন পরে পুরোপুরি ফিরে পাওয়া যাবে তা আর পাঁচজনের মত ধীরাজবাবুও কখনও চিন্তা করেন নি। এই বিষয়ে তিনি পুলিসের কৃতিত্বের চেয়ে প্রগতির মতো ভালো মেয়ের ভাগ্যকেই দায়ী বলে মনে করতেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথা বাদ দিলেও কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতা বলেও একটা জিনিস আছে। তাই প্রত্যুত্তরে গদগদ হয়ে ধীরাজবাবু প্রণবের হাতখানা চেপে ধরে বললেন, 'অনেকদিন আমাদের ওখানে তুমি যাও নি বাবা। আজকে কিন্তু তোমাকে আমাদের ওখানে একবার যেতে হবে। তোমার কথা প্রগতি রোজই বলে। গিন্নির ও মুখে সদাসর্বদা তোমার কথা লেগেই আছে।'

প্রণবের সেদিন কিছুই ভাল লাগছিল না। কিসের একটা ব্যথায় তার মনটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। বহুক্ষণ সে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কারুর কথার কোনও উত্তর দিতে তার আর ইচ্ছা করে না। প্রগতিদের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যে তার যেতে ইচ্ছে করে না তা নয়, কিন্তু মিছা-মিছি সেখানে গিয়ে হবেই বা কি?

১৬

উঠন্ত রৌদ্র তার সবটুকু তীব্রতা নিয়ে প্রগতিদের বাড়িটা সমুজ্জ্বল করে তুলছিল। সময় তখন প্রায় দশটা হবে। নিমন্ত্রিত প্রণব ধীরে ধীরে এসে প্রগতিদের বাড়ির দরজায় ঘা দিল। খোলা জানালার পথে আগেই প্রগতি প্রণবকে রাস্তার উপর আসতে দেখেছিল। সে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। প্রণব একবার অপ্রতিভদৃষ্টিতে প্রগতির দিকে চেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, আপনি ভাল আছেন?'

আনন্দের আতিশয্যে প্রগতি বোধ হয় এই দিন নিজের অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। ঝোঁকের মাথায় সে এমন এক বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা করল, আমাদের বর্তমান ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় যার আর কোনও ক্ষমা নেই। প্রণবের এই কুশল-প্রশ্নের উত্তরে প্রগতি ছুটে এসে প্রণবের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'খুউব, বেশ! এত দেরি করে? খাবার কখন তৈরি হয়ে গেছে! বাঃ—।'

প্রগতির মা রান্নাঘর থেকেই প্রণবের গলা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি সেখানে বসে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে পেগু! প্রণব এসেছে? ডাক ডাক—'

মায়ের ডাকের উত্তরে প্রগতি কিছুমাত্র অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'হাঁ মা, প্রণবদা। আসু-উ—ন।'

একরকম টানতে টানতেই প্রগতি প্রণবকে খাবার ঘরে এনে হাজির করল। প্রগতির মা প্রণবের জন্য একটা জায়গা করে খাবার সাজাচ্ছিলেন। এতক্ষণে তাঁর স্বামীর চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে দানা বেঁধেছে। তিনি স্নেহভরা বুকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণবকে বললেন, 'এস বাবা! তোমায় কি বলে আশীর্বাদ করব ভেবে পাচ্ছি না। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ বাবা!'

কৃতজ্ঞতার বাণী শুনতে শুনতে প্রণব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মহড়া পুনরায় শুরু হবার আগেই তা সরাসরি বন্ধ করে কথা-বার্তার গতি অন্য পথে চালিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রণব বলে উঠল, 'কি যে বলেন আপনারা? কর্তব্য ছাড়া আমি আর কিছুই করি নি। যাক, এদিকে প্রগতির বিয়ের কথাবার্তার কি হল বলুন দিকি এখন? সেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পিতাঠাকুব এবার আর কোনও গোলমাল করেন নি তো?'

দুয়ারের পাশেই প্রগতির বাবা ধীরাজবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। এই সব অবান্তর কথাবার্তার প্রশ্রয় দিতে তিনি বোধ হয় আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। প্রগতি ও প্রণবের এইরূপ মেলামেশা কোনও দিনই সুনজরে দেখেন নি। এ ছাড়া এই টাকা ক'টা রিকভারী হওয়ার পর তিনি সেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রের পিতার সঙ্গে প্রগতির বিয়ের ব্যাপারে নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেছেন। তাই তিনি এ সব কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে প্রণবকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'সে হবে এখন বাবা। এখন আসনে বসে পড় দেখি। এদিকে খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

প্রণব আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে সামনের আসনটার উপর বসে পড়ল। তারপর সে গরম গরম লুচিগুলো অন্যমনস্কভাবে হাত দিয়ে গুঁড়তে গুঁড়তে প্রগতির দিকে চেয়ে বলল, 'কি, খুশী হয়েছেন ত এইবার? চুরি যাওয়া টাকাকড়িগুলো তো পুরোপুরিই রিকভারী করে দিলাম।'

প্রগতি স্থির দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সে গম্ভীর হয়ে উত্তর করল, 'না, মোটেই আমি খুশী হই নি। আমাদের চেয়ে টাকা ক'টা চোরেদেরই বেশী দরকার ছিল বলে আমি মনে করি।'

প্রগতির মুখে এরূপ একটা উত্তর শুনে প্রণব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। লজ্জিত হয়ে এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে ও সেই সঙ্গে একটু অবাক্ হয়ে প্রণব প্রগতিকে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি! এ আবার কি বলছেন আপনি? এঁ্যা—'

'আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি। আজকার খবরের কাগজ আমি পড়েছি', একটু ম্লান হাসি হেসে প্রগতি উত্তর করল, 'আমিনার মৃত্যুর কারণও ত ঐ টাকাগুলোই। ওগুলো আমিনা ও করিমের কাছে থাকলে ওদের নিয়ে হয়তো একটা ভালো ফ্যামেলী গড়ে উঠতে পারত। আর সেই ফ্যামেলী থেকে ভবিষ্যতে বড় বড় অনেক্ মনীষী যে জন্মাত না, তাই বা কে বলতে পারে?'

প্রগতির কাছ থেকে এইরূপ একটা মতবাদ শুনে প্রণব অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে শুনেছিল যে প্রগতি এই বৎসর ইকনমিক্স নিয়ে সসম্মানে বি. এ. পাস করেছে। কিন্তু প্রগতি যে পোস্ট-কমিউনিস্টের মত কথা বলছে। বিস্মিত হয়ে প্রণব প্রগতিকে জিজ্ঞেস করল, 'এঁ্যা! এ আপনি বলেন কি? চুরি করে ফ্যামেলী গড়তে হবে?'

'একে আপনি চুরি বলছেন কেন?' বেশ একটু বিজ্ঞজনোচিত স্বরে প্রগতি উত্তর করল, 'ও হচ্ছে এক রকম ইকনমিকস্ ব্যালেন্স, ডিসট্রিবিউশন অব মনিই। সিভিক্সের তো এ একটা কমন কোশ্চেন। এই ডিসট্রি-বিউশনের বহু এজেন্সী আছে। চুরি-চামারী হচ্ছে এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পন্থা। মাঝখান থেকে আপনি ইনট্রুড্ না করলে শুধু একটা কেন, অতগুলো প্রাণ এমন করে নষ্ট হত না।'

প্রগতির কথার ঠিক ভাবার্থ প্রণব বুঝে উঠতে পারে নি। সে হতভম্ব হয়ে একবার প্রগতির দিকে আর একবার ধীরাজবাবুর দিকে চেয়ে দেখল। প্রগতি এ সব কি এলোমেলো কথা গুরুজনদের সামনে বলে চলেছে। প্রগতির মা'র মত প্রগতিরও হিস্টিরিয়া রোগ আছে নাকি? এমনি সাত-পাঁচ ভেবে প্রণব আর কোনও উত্তর দিল না। প্রণবকে চুপ করে থাকতে দেখে ধীরাজবাবু বললেন, 'ওর কথা ছেড়ে দাও বাবা। আই. এ. ও বি. এ.-তে সিভিক্স্ পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল থেকে খালি ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।'

মধ্যপথে ধীরাজবাবুকে থামিয়ে প্রগতির মা এইবার বলে উঠলেন, 'তুমি চুপ কর দিকি।' তার পর প্রণবের কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

প্রণব এর জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। সে সেখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে উত্তর করল, 'বলুন।'

প্রণব যে প্রগতিকে খুবই পছন্দ করেছে তাতে প্রগতির মত প্রগতির মা'রও কোনও সন্দেহ ছিল না। এতদিনে তাঁর মেয়ের মনও তাঁর বুঝতে বাকি থাকে নি। এ-ব্যাপারে এ ক'দিন বাড়িতে বেশ একটু অশান্তিও হচ্ছিল। একটু আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে এসে প্রণবকে পাখার বাতাস করতে করতে প্রগতির মা বললেন, 'তুমি ত বলেছিলে বাবা, আমাদের মেয়েটাকে তুমি নেবে। সে—'

হঠাৎ এরূপ ভাবে কথাটা প্রণবের কাছে সরাসরি পাড়া হবে তা প্রগতি বা ধীরাজবাবু কেউই আশা করেন নি। বিরক্ত ও লজ্জিত হয়ে প্রগতি বলে উঠল, 'মা! বলছি না আমি বিয়ে-টিয়ে করব না।'

প্রগতির মা তাঁকে না বলে এইরূপ একটা প্রস্তাব প্রণবের কাছে তাঁর সামনেই পেড়ে বসবেন তা ধীরাজবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর একবার মনে হল যে প্রচ্ছন্নভাবে হয়তো হিস্টিরিয়া রোগ হঠাৎ তাঁর মধ্যে এসে পড়েছে। এইজন্যই বোধ হয় তিনি তাঁর মনের সাধ লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। কিন্তু প্রণবের সামনে এখুনি তাঁকে এ জন্য র্ভৎসনা করা চলে না। তাই তিনি তখনকার মত এই জটিল পরিস্থিতিটা সামলে নেবার জন্যে এ-সব কথায় কান না দিয়ে স্ত্রীর কথার জের টেনে উত্তর দিলেন, 'সে ত তাহলে ভালই হত ; কিন্তু ওদের যে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। সেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। বড় ভাল ছেলে সে—প্রগতিকে নিজে পছন্দও করে গেছে। রোজ একবার করে এখানে হাজিরা দেয়। ছেলেমানুষ কি না। হে হে—'

ধীরাজবাবুর কথায় প্রগতির মা হাতের চাবিটা দুম করে মাটির উপর নামিয়ে রেখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ধীরাজবাবুর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। এই সুযোগে প্রগতি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল বিয়ে নিয়ে মতভেদ হওয়ায় মা, মেয়ে ও মেয়ের বাপের মধ্যে বেশ একটা বোঝাপড়া কয়দিন ধরে এখানে চলছে।

প্রকৃত বিষয়টা বুঝতে প্রণবের বিশেষ দেরি হয় নি। প্রগতি ধীরে ধীরে তার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে সে মাথা নীচু করে অনেক কিছুই ভেবে নিল। প্রগতিকে সে ভালবেসেছিল, তার লোভ যে না হল তাও নয়। কিন্তু সেই অন্যায় লোভ সে দমন করে ফেলল। প্রগতিকে ভালবাসে বলেই তাকে তার অপেক্ষা সৎপাত্রের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে এনে ফেলতে তার মন কিছুতেই সায় দেয় না। তার মনে হল তার প্রতি প্রগতির এই আকর্ষণ হয়তো কৃতজ্ঞতাপ্রসূত নিছক মোহ, ভালবাসা নয়। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা তার কাছে মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বলে মোটেই মনে হল না। এইবার ধীরে ধীরে জলভরা চোখ দুটো উপরে তুলে প্রণব বলল, 'তা ত হয় হয় না মা! সব টাকা রিকভারির সঙ্গে আমিও আমার প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়েছি। তা ছাড়া—না, তা হয় না। আমায় আপনারা মাপ করবেন।'

এর পর প্রণব আর কথাও বলতে পারল না। হঠাৎ সে চেয়ে দেখল, প্রগতি ফিরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছে। চোখাচোখি হতেই প্রগতি ব্যথা-ক্ষুণ্ণ মনে গম্ভীরভাবে পিতাকে জানাল, 'বাবা, ও-ঘরে মিস্টার মুখার্জী এসেছেন'।

'এঁ্যা, মুখার্জী ও-ঘরে এসে গিয়েছে? এঁ্যা'—কথা ক'টা বলে ধীরাজ-বাবু আর অপেক্ষা করলেন না। প্রগতির হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি প্রণবকে উদ্দেশ করে বলে গেলেন, 'প্রণববাবু! মিঃ মুখার্জী এইবার নতুন ডেপুটী হয়েছেন। আসবেন বাইরের ঘরে একবার, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন।'

শুধু ভদ্রতার খাতিরেই প্রগতি বাপের অবাধ্য হল না। একবার মাত্র কাতর নয়নে প্রণবের দিকে সে ফিরে দেখল। কিন্তু তার চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা বোধ হয় প্রণবের ছিল না। অগোছাল শাড়িখানা গুছিয়ে নিতে নিতে সে নিরুপায় হয়ে পিতার অনুসরণ করল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আহারান্তে প্রণব যখন বাইরের ঘরে এসে পৌছল, তখন প্রগতি, ধীরাজবাবু ও মিঃ মুখার্জী একত্রে চা খেতে শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ প্রণবকে দেখে ধীরাজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইনিই ইনসপেক্টর প্রণববাবু।'

প্রণবের সুখ্যাতি কয়দিন ধরে এই গাঙ্গুলী পরিবারের কাছে শুনতে শুনতে মুখার্জী সাহেব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে প্রগতির মুখে প্রণবের প্রশংসা তাঁর কাছে বিরক্তিকরই মনে হত। এদের এই সব বাড়াবাড়ির জন্য ঈর্ষান্বিতও তিনি একটু হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ প্রণবকে দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে উত্তর করলেন, 'কে, এই থানার বড় দারোগা?'

প্রণবের ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে এই অসভ্য লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় মারে। একবার তার এও মনে হল যে, সে বলে 'আমি দারোগা নই, আমি ইনসপেক্টর'। কিন্তু তাতেই বা তফাৎ হবে কি? এমনি আরও সাত-পাঁচ কি ভেবে সে চুপ করেই গেল। মিঃ মুখার্জীর কথার কোন উত্তরই সে দিল না।

কিন্তু তার সেই কথার উত্তর দিল প্রগতি। সে বেশ একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, 'দারোগা হতে পারেন, কিন্তু উনি আমাদের এখন বন্ধু। ভাগ্যাকাশের একটা তারকার হেরফেরের জন্যে হয়তো উনি হাকিম না হতে

পেরে দারোগা হয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে সমাজে দারোগার প্রয়োজন অন্য যে-কোনও অফিসারদের চেয়ে অনেক বেশী।'

ব্যাপার এতদূর গড়াবে প্রণব তা আশঙ্কা করে নি। সে এজন্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল, 'এ কি, আপনারা যে ঝগড়া আরম্ভ করলেন!'

প্রণবকে সান্ত্বনা দেবার আর প্রগতির কোনও ভাষা ছিল না। তাই শান্তভাবে প্রগতি প্রণবকে বলল, 'না না, ও কিছু না, আপনি বসুন।'

এর পর প্রণবের আর সেখানে একটুখানির জন্যও বসা চলে না। আর কিসের দাবি নিয়েই বা সে সেখানে বসবে! এ ছাড়া ঐ ছোকরা হাকিম বাহাদুরের শ্যেনদৃষ্টিও সে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে একটু এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে ম্লান হাসি হেসে বলল, 'না, থাক, তা আর হয় না। তা ছাড়া একটু কাজও আছে, যাই আমি।'

প্রগতি এবার আর প্রণবকে আগের মত বারণ করল না। তাকে আর কোন কথাই সে বলল না। শুধু স্থির দৃষ্টিতে সে প্রণবের দিকে চেয়ে বসে রইল। প্রণব চলে গেলে ধীরে ধীরে সে তার ব্যথিত দৃষ্টিটুকু চায়ের পেয়ালার উপর ফিরিয়ে আনল। সেই পেয়ালার চায়ের মধ্যে সে কার প্রতিবিম্বের সন্ধান করছিল তা সেই জানে!

একদিন প্রণব হয়তো প্রগতিকে ভুলে যাবে। কিন্তু প্রণবের স্মৃতি প্রগতির মনের মধ্যে একটা কাঁটার মত সারা জীবন বিঁধে থাকবে না তো! মিঃ মুখার্জী এইবার আশ্বস্ত হয়ে প্রগতির দিকে ফিরে দেখলেন যে প্রগতি কিসের একটা চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে বসে রয়েছে।